HINDUISM.

[illegible] Philosophic and Theosophic.

PART I.

BY

Sri Nath Ghosh, M.B.

LATE MEDICAL ADVISER TO H. H. THE MAHARAJA OF [illegible]

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম।

প্রথম ভাগ।

মানবজীবনের কূটপ্রশ্ন মীমাংসা।

কাহং মন্দমতিঃ কেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ
কিং তত্র পরমাণুঃ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ।

শ্রীধরস্বামী।

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ এম, বি,

পান্নাধিপতির ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার কর্ত্তৃক বিরচিত।

কলিকাতা;

সন ১৩১১ সাল।

[illegible] 1/4. [illegible]

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম নামক পুস্তকের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের অনেক স্থলে অনেক ভুল থাকে। কোথাও বা মুদ্রাঙ্কনের দোষ, কোথাও বা গ্রন্থকারের খামখিয়াল বশতঃ দোষ আসিয়া পড়ে। তজ্জন্য এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে স্থলে স্থলে ভুল আছে। প্রথম-ভাগের প্রথম দুই অধ্যায়ে ও দ্বিতীয় ভাগের স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কন ও লেখার কিছু কিছু ভ্রম পাইবেন। সহৃদয় পাঠকবর্গ নিজগুণে সে সকল ভ্রম উপেক্ষা করিয়া গ্রন্থের প্রকৃত ভাব ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইবেন। যে মহৎ ব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, আমাদেরই দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাতে কোন বিখ্যাত সুলেখকের পরামর্শ বা সাহায্য পাওয়া যায় নাই। তজ্জন্য যে সকল মহোদয় ও মহানুভব ব্যক্তিগণ এ পুস্তক সম্বন্ধে আমাদিগকে সুপরামর্শ দিবেন, তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

কোন্নগর
১লা জ্যৈষ্ঠ,
১৩১১ সাল।

গ্রন্থকার,
শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ এম, বি।

ROW RAJA KHOMAN SING JU DEB
deceased third Prince of Panna.

Oh Thou Ill-starred deceased Third Prince of

PANNA, ROW RAJA KHOMAN SING JU DEB BAHADOOR,

In 1901 when through the treachery of your own nephew, His Highness The Mohendra Maharaja Madhab Sing Bahadoor of Panna and through the machinations of his well-known concubine Hadrijan, your untimely and lamented death occurred from arsenic poisoning and the beneficent Government of India touched with compassion on your bereaved family and in vindication of the cause of justice took cognisance of the case and ultimately were graciously pleased to dethrone the reigning Chief, Madhab Sing, sentencing his Hindu Secretary Acchalal to capital punishment and to raise your minor son Jadabindra Sing to the *guddy* of Panna, the poor author of this book, who then in the service of His Highness, in obedience to the dictates of his own conscience, tried in his humble way to uphold the cause of virtue, honesty and truth, even at a tremendous risk of his life, had by an irony of fate to relinquish all his connection with that illustrious Royal Family, to which he had the honour to render an unstinted service and homage for a period of 17 long years. Now though that connection, once so dear and dignifying, has ceased most probably for ever, he can not wipe out from his mind the sweet recollections of your blessed companionship which you were then so pleased to grant him. It was through that blessed companionship that he was inspired with many noble and elevating thoughts about the principles of Hindoo Religion, which you with your deep knowledge and vast erudition in the countless treasures of the ancient *shasters* inculcated into his mind. In respectful acknowledgment of the debt immense of endless gratitude which you were thus pleased to lay him under, THIS BOOK is dedicated in your beloved name with a fervent prayer that your departed soul may rest in peace in heaven and your noble son may live long in the blissful enjoyment of such hard-fought and dear-bought Throne of Panna as its pride and glory, walking in the footsteps of his illustrious fore-fathers and glorifying the most noble and august family of the Great *Chatrasal.*

CALCUTTA,
Dated the 30th January, 1904.

By the Author.

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা		পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	...	১০	শতাব্দিতে	শতাব্দীতে*
২	...	২৭	সাভিলাষী	অভিলাষী*
৭	...	১০	অনুমাত্র	অণুমাত্র*
১০	...	১০	পুতিগন্ধে	পূতিগন্ধে
১২	...	১৬	উদজন	উদজান*
১২	...	১৭	অম্লজন	অম্লজান*
১৩	...	৬	অনুবীক্ষণ	অণুবীক্ষণ*
১৪	...	১৭	অসীম	সসীম
১৫	...	১১	মন্দিভূত	মন্দীভূত
১৬	...	১৭	সম্বন্ধ	সম্বদ্ধ
২৯	...	৭	আভ্যন্তরিণ	অভ্যন্তরীণ*
৩৫	...	২	শ্রূত	শ্রুত
৪০	...	১	অনুগুলি	অণুগুলি*
৪১	...	৫	পুনঃপুনঃ	পৌনপুন্য
৪৭	...	১	দুন্দভি	দুন্দুভি
৪৭	...	৬	করেন	করেন।
৫১	...	১৯	সহজ	সহজ;
৫৭	...	১২	বিচ্যুত	বিচ্যুত
৬০	...	১৫	প্রায়	পায়
৬৯	...	৭	পুরূষ	পুরুষ
৭০	...	২৫	জবীত্মাকে	জীবাত্মাকে

পৃষ্ঠা		পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭১	...	১৪	স্পন্দরহিত	স্পন্দনরহিত
৭১	...	২২	হন	হন ;
৭২	...	১১	অহংতত্বরে	অহংতত্বের
৭৬	...	১	ভৌতিক	ভৌতিক পদার্থ
৭৯	...	১০	হইল মাত্র	হইল মাত্র।
৮৯	...	৮	কতদুর	কতদূর
৯০	...	৮	স্ত্রীজাতিরা	স্ত্রীজাতির
৯৯	...	১৬	প্রতিষ্ঠীত	প্রতিষ্ঠিত ;
১০১	...	৬	প্রবল	প্রবণা
১০৮	...	১২	তাঁহারা	তাহারা
১৬৫	...	২৪	নিধন	নির্ধন
১৭৪	...	৯	অবস্থায়ই	অবস্থাই
১৮৩	...	১৩	হওয়াও	হওয়ায়
২২৩	...	৩	হই	হয়
২২৬	...	২৮	হইয়াছিল।	হইয়াছিল,

* চিহ্নিত শব্দগুলি আরও কয়েক স্থলে অশুদ্ধ আছে তাহাও শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গ্রন্থের ভূমিকা।

যৌবনের প্রারম্ভে সময়োচিত ইংরাজি-বিদ্যায় পারদর্শিতালাভের অভিলাষে আমি কয়েক বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থ উপস্থিত হই। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমেরগুণে সে সকল পরীক্ষা অবলীলাক্রমে সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আজ আবার স্বেচ্ছায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে পরীক্ষার্থ উপস্থিত। এ পরীক্ষা ততোধিক দুরূহ; ইহাতে আজীবনশিক্ষিত বিদ্যার পরীক্ষা গৃহীত হইবে; ইহাতে নানামতাবলম্বী পরীক্ষকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। প্রতিকূলবাদিগণ বিষাক্ত সমালোচনাবাণে ক্ষতবিক্ষত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না এবং অনুকূলবাদিগণও কার্পণ্য-দোষ বশতঃ হস্তদ্বয় সঙ্কুচিত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইবেন। এজন্য উপস্থিত পরীক্ষাক্ষেত্রে কিরূপ উত্তীর্ণ হইব, তাহা সম্পূর্ণ দৈবায়ত্ত।

আমি একজন নীচকুলোদ্ভব ও প্রকৃত অব্যবসায়ী। হিন্দুশাস্ত্রে আমার তাদৃশ অধিকার বা ব্যুৎপত্তি, কিছুমাত্র নাই। হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া সমাজস্থ শ্রেষ্ঠজাতিবর্গকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করা, আমার পক্ষে প্রকৃত বাতুলতা মাত্র। পুরাকালীন মহর্ষিগণ যোগবলে ও মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ অগাধ বুদ্ধি বলে যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পোষণ ও বর্দ্ধন করেন, সে ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বোদ্ঘাটন বা প্রকৃত রহস্যোদ্ভেদ করা মাদৃশ মূর্খ লোকের পক্ষে কেবল অর্ব্বাচীনতা মাত্র। কিন্তু সময়গুণে সকলকেই সকলই করিতে হয়। দেখ, যিনি নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনিও সংগ্রামক্ষেত্রে সশস্ত্রে বহির্গত হন। সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের এই অধঃপতনের দিনে, স্বধর্ম্মরক্ষার্থ যিনি অতীব মূর্খ ও নীচবংশোদ্ভূত, তাঁহাকেও লেখনী ধারণ করিতে হইল।

আজকাল আমরা বাল্যকাল হইতে শিক্ষাদোষে ধর্ম্মসম্বন্ধে কিরূপ বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়া থাকি, স্বধর্ম্মের মতামত লইয়া আমরা আজীবন কিরূপ ঘোর কালাগ্নিতে দগ্ধ হই, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানপরিপক্কতার সঙ্গে, অনেকের মনে জাতীয়

ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। এজন্য আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক পাঠকবর্গকে জাতীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই পুস্তক-খানির রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আজকাল ধর্ম্মসম্বন্ধে বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়। পাশ্চাত্য সমাজের সংস্রবে আমরা যেমন একদিকে আধিভৌতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি, সেইরূপ অপরদিকে আমাদের চিরন্তন আধ্যাত্মিকতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। মুসলমানদিগের অধিকার কালে পাঞ্জাবের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, আজকাল ইংরাজদিগের আমলে বঙ্গদেশের ভাগ্যে তাহাই ঘটিতেছে। পাঞ্জাব চিরদিনের জন্য ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; বঙ্গদেশ এখন ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। এখন কেহ কেহ অশেষ পাশ্চাত্যবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া নাস্তিক হন; কেহ বা একেশ্বরবাদী হইয়া স্বধর্ম্মকে পৌত্তলিকতাজ্ঞানে ঘৃণা করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকে কেবল নাপার্য্যমানে দেশাচার পালন করতঃ হিন্দু নামে পরিচিত হন। অনেকেই স্বীকার করেন, হিন্দুশাস্ত্রালোচনা ব্যতীত সমাজোদ্ধারের উপায়ান্তর নাই এবং তজ্জন্য রাশি রাশি ধর্ম্মপুস্তক বৎসরে বৎসরে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহাদেরই উপকারার্থে হিন্দুধর্ম্মের কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সারতত্ত্বোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

পুস্তকখানির নাম "বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম" রাখা হইল। আজকাল অনেকে বিজ্ঞানশব্দের অর্থে কেবল পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানই বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রকৃত জ্ঞান বা বিজ্ঞান দুই প্রকার, অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান। এখন যেমন পাশ্চাত্য সভ্যজগতে জড়বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব, অতি প্রাচীনকালে প্রাচ্যজগতে যোগেশ্বরপ্রকটিত, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সেইরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল। চিরদিন সকল দেশের মহাত্মাগণ এ বিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া যান। কলি-যুগবৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণ লোকের আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পাওয়াতে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান লোকসমাজে গোপন করা হয় এবং মানবধর্ম্মও সকলদেশে অবনত ভাব ধারণ করে। এখন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদ্যন্তরটী যোগেশ্বরপ্রকটিত, ব্রহ্মার অনন্তপুস্ত প্রাচীনকালের সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পূর্ণ। সেজন্য

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কথা কলিকলুষিত মানবমনে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, উহার অবতারণা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের কিঞ্চিৎ সারতত্ত্ব প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাওয়া গেল। পুরাকালে যে দর্শনশাস্ত্র সমাজে সম্যক অনুশীলিত হইত, সেই দর্শনশাস্ত্রের নানা কথার উত্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যান করিতে চেষ্টা পাওয়া গেল। আজকাল যে জড়বিজ্ঞান জ্ঞানজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, সেই জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে হিন্দুধর্ম্মের মতামত কিরূপ ব্যাখ্যান করা যাইতে পারে, সেবিষয়েও কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা গেল। এই জড়-বিজ্ঞান আজকাল সমাজে নাস্তিকতার অধিক প্রশ্রয় দেয়; তজ্জন্য ইহার দোষগুণ, জড়বাদিতা ও অসম্পূর্ণতা বিশদরূপে উল্লেখ করা গেল এবং অনেক-স্থলে ইহার মত প্রকাশ্যভাবে খণ্ডন করা গেল।

যাহা হউক, এখন হিন্দুধর্ম্ম অতি প্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান, পুরাকালের দর্শনশাস্ত্র, আজকালের তথা-কথিত উন্নত জড়বিজ্ঞান, এই ত্রিবিধ শাস্ত্রের কতদূর অনুমোদিত, উহাদের দ্বারা কতদূর প্রতিপাদিত ও সপ্রমাণিত, তাহাই এ পুস্তকে দেখান হইল: এজন্য পুস্তক খানির নাম "বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম" রাখা হইল।

পুস্তকখানি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে অধ্যাত্মবিজ্ঞান, দর্শন ও জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি, উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বা বিরোধ, ধর্ম্মের সহিত উহাদের সম্বন্ধ, প্রাকৃতিক ও বৈশেষিক ধর্ম্মের স্বরূপ ও মূলউদ্দেশ্য, সৃষ্টিরহস্য, মানবসৃষ্টি, জগতে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, ঈশ্বর, আত্মা, জীবনের উদ্দেশ্য, পরলোক নির্ব্বাণ ও মুক্তি, ঈশ্বরের অবতারগ্রহণ, ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্মশাস্ত্র, পাপপুণ্য ও সুখদুঃখের বিচার প্রভৃতি মানবজীবনের যাবতীয় কূটপ্রশ্ন যথাসাধ্য মীমাংসা করা হইল। দুরূহ বিষয় আলোচিত হওয়ায় প্রথমভাগ অনেক স্থলে নীরস; কিন্তু যতদূর সম্ভব ইহার ভাষা সরস ও প্রাঞ্জল করিতে বিশেষ চেষ্টা করা হইল। দ্বিতীয়ভাগে হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্মরূপটী বিশদরূপে দেখান হইল; তজ্জন্য ইহার কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ও নিষ্কাম ধর্ম্ম ইহার মূলবিশ্বাস ও ত্রিমূর্ত্তি, ইহার পূজাপদ্ধতি, সাকার ও নিরাকার উপাসনা, তেত্রিশ কোটী দেবতা, পুরাণ মাহাত্ম্য, শাস্ত্রোক্ত নয় অবতারের যথার্থ তাৎপর্য্য, রামাবতার কৃষ্ণাবতার, তীর্থভ্রমণ, দানধর্ম্মাদি, ইহার প্রকৃত ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত বিষয়

দ্বিতীয় ভাগে সরল ভাষায় সুশৃঙ্খলতার সহিত আলোচিত হইল। তৃতীয় ভাগে হিন্দুধর্ম্মের সামাজিকরূপটী বিশদরূপে দেখান হইল। উহার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, মহোৎসব, গৃহস্থসংস্কার ও যাবতীয় দেশাচার কতদূর সমাজের মঙ্গলদায়ক, কতদূর মানবমনের উন্নতি সাধক, কতদূর মানবজীবনের সুখবর্দ্ধক, তাহাই অসাধারণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক সপ্রমাণ করা হইল।

যোগেশ্বরপ্রকটিত প্রত্যেক মানবধর্ম্মের আভ্যন্তরটী সত্যে পূর্ণ হইলেও ভ্রমসঙ্কুল মানবমনবিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেই যে একেবারে অভ্রান্ত, তাহা কদাচ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রোল্লিখিত অসম্ভব ঘটনাবলী অনেকস্থলে রূপকে পূর্ণ; সেজন্য স্থলে স্থলে সেই সকল রূপক ভেদ করিয়া উহাদের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা গেল এবং সাধ্যমত শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান করা গেল।

সমগ্র পুস্তকখানি নবযুগের নব্যসম্প্রদায়ের জন্য নবপুরাণস্বরূপ। মানব-জীবন, মানবসমাজ ও মানবধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, তৎসমুদায়ই সংক্ষেপে এ পুস্তকে বর্ণিত। ইহাতে গালগল্প, উপকথা ও হাস্য-বিদ্রূপের কথা নাই; আছে কেবল দুর্লভ মানবজীবনের সারকথা ও সারতত্ত্ব। হিন্দুধর্ম্মের এই অধঃপতনের দিনে এবং এই নাটকপ্লাবিত-দেশে এ পুস্তকের যে কিছুমাত্র সমাদর হইবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না। এখন শিক্ষিত সমাজ পুস্তকপাঠে কিছুমাত্র উপকৃত হইলেই, সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। যাঁহারা জ্ঞানামৃত ও ধর্ম্মামৃতপানে যথার্থ সমুৎসুক, তাঁহারাই পুস্তকখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

পুস্তকের অনেকস্থলে নূতন নূতন ধর্ম্মমত দৃষ্ট হইবে, তাহা কোন সাধারণ পুস্তকে কেহ দেখিতে পাইবেন না। সেজন্য এ পুস্তকে যে সকল মতামত আলোচিত হইল, তাহা কদাচ সর্ব্ববাদিসম্মত হইবার নয় বা তদ্রূপ আশা করাও সঙ্গত নয়। কিন্তু যদি কেহ পুস্তক পাঠে জাতীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া উহাতে আন্তরিক শ্রদ্ধাবান হন এবং বন্ধুবান্ধবকে জাতিধর্ম্ম ও গোব্রাহ্মণ রক্ষা করিতে এবং উহাদের সম্যক উন্নতি সাধন করিতে প্রোৎসাহিত করেন, তাহা হইলে সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে নিবেদন, যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য ও সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অভিলাষী হন, যদি দুর্লভ মানবজীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া যথার্থ শ্রেয়োলাভে অভিলাষী হন, যদি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব সহজ ভাষায় শিক্ষা করিয়া নিজমনকে অনন্ত উন্নতির পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর করিতে অভিলাষী হন, যদি দেশের আচার ব্যবহার ও পূজাপদ্ধতি সমাজের কতদূর মঙ্গলদায়ক, মানবমনের কতদূর উন্নতিসাধক ও মানবজীবনের কতদূর সুখবর্দ্ধক, তাহা জানিতে অভিলাষী হন, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।

ইতি নিবেদন গ্রন্থকারস্য।

উপক্রমণিকা।

তুষারমণ্ডিত, অভ্রভেদী হিমগিরি হইতে ভারতমহাসাগরপ্রধৌত, সুদূরবর্ত্তী কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এই সুবিশাল ও সুবিস্তৃত ভারতভূমি আজ বিধিনির্ব্বন্ধে ও দৈবাধীনে ব্রীটিশসিংহের করতলস্থ। প্রাচীন কবি-গণের মনঃকল্পিত অখণ্ড সার্ব্বভৌমত্ব আজ অদৃষ্টবলে ইংরাজরাজ পূর্ণাংশে ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের সুশাসনগুণে সমগ্র ভারত আজ যেমন ধনধান্যে ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ, তেমনি সর্ব্বত্র অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব শান্তি বিরাজিত। যে ভারতে এতকাল হিন্দু ও মুসলমানদিগের আমলে রাজন্যবর্গ পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল, সে ভারতে আজ তাঁহাদের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপবলে মেষশাবক ও ব্যাঘ্রশাবক বন্ধুভাবে একত্র বিচরণ করে। তাঁহাদের সুশাসনে দেশীয় রাজন্যবর্গ এখন তাঁহাদেরই পদানত ও প্রসাদ-ভিখারী, উঁহাদের অস্তিত্ব এখন নামে পর্য্যবসিত।

অনেকের বিশ্বাস, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এখন আমরা সুসভ্য ইংরাজ জাতির পদানত। যে জাতি এখন জ্ঞানবলে, অস্ত্রবলে ও অর্থবলে ভূমণ্ডলে অগ্রগণ্য, যে জাতির সভ্যতাজ্যোতি দিগ্‌দিগন্ত বিকীর্ণ, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির

সহিত আমরা এখন ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, ইহাতে আমরা তাঁহাদের সাহায্যে উত্তরোত্তর আধিভৌতিক উন্নতিসাধন করিয়া সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হইব, ইহাই বিধাতার ভবিতব্যতা। এখন ইংরাজরাজ পরাধীনা ভারতমাতাকে সভ্যতার উচ্চপদবীতে উন্নীত করাইবেন, কি স্বার্থসিদ্ধির জন্য উহার বীর্য্য-শোণিত শোষণ করতঃ উহাকে ক্রমশঃ অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কালরাশিতে পরিণত করাইবেন, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকদিগের বিবেচ্য ?

ইংরাজবন্দুক ও ইংরাজবেয়নেট যেমন ভারতের বহির্জগৎ জয় করিয়াছে, সেইরূপ ইংরাজিবিদ্যা ও ইংরাজিবিজ্ঞান আজ ভারতের মনোজগৎ জয় করিতে উদ্যত। পাশববলে বলীয়ান মুসলমানজাতি তরবারিবলে পঞ্চ শতাব্দিতে যাহা সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় নাই, আজ ইংরাজরাজ নিজ মোহিনীবিদ্যাবলে অর্দ্ধশতাব্দিতে তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ। অসভ্য মুসলমান জাতি আমাদেরই নিকট সভ্যতা শিক্ষা করে। তাহারা আমাদের অঙ্কশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি সকলই গ্রহণ করিয়া জাতীয় উন্নতিসাধন করে। কিন্তু সুসভ্য ইংরাজজাতি পাশববলে ও বিজ্ঞান-বলে বলীয়ান। যেমন তাঁহাদিগের সংগ্রামনৈপুণ্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বত্র জয়ী করিয়াছে, সেইরূপ তাঁহাদের ক্রমোন্নত, খরজ্যোতিঃসম্পন্ন, আশুফলপ্রদ বিজ্ঞানও আমাদের ক্ষীণপ্রভ, রক্ষণশীল প্রাচ্যবিজ্ঞানকে ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ করিতেছে।

এখন ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্যবিদ্যার বহুবিস্তৃতি হওয়ায়, শতশত ইংরাজিবিদ্যালয় হইতে বৎসরে বৎসরে ইংরাজিশিক্ষিত, ইংরাজিভাবে আকণ্ঠপরিপূরিত নব্যসম্প্রদায়বর্গ দলে দলে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁহারা ইংরাজগুরুগণের সর্ব্বথা অনুচিকীর্ষু। যাহা কিছু ইংরাজিগন্ধবাষ্পে রঞ্জিত, তাহাই তাঁহাদের নয়নমণি। ইংরাজি আব্‌ভাব, ইংরাজি চালচলন, ইংরাজি পোষাকাদি সকলই তাঁহাদের সম্যক আদরণীয় ও অনুকরণীয়। অপরপক্ষে দেশীয় যাহা কিছু আছে, সকলই ক্রমশঃ তাঁহাদের চক্ষুঃশূল হইতেছে। পুরাতন সামাজিক আচার ব্যবহারগুলি এখন তাঁহারা সমূলে উৎপাটন করিতে সাভিলাষী ; এমন কি, তাঁহাদের অত্যাচারে সমাজের চিরাগত দেশাচারগুলি এখন বিনষ্টপ্রায়।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা অনুচিন্তন করিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আজ-কাল আমাদের জাতীয় জীবনে বিষম সময় সমুপস্থিত। এখন পুরাতন সমাজপদ্ধতি নূতন সমাজপদ্ধতির সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত। যে সকল আচারব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতে সামাজিক নির্ব্বাচনে হিন্দুসমাজে এতকাল প্রতিষ্ঠিত, উহাদের সহিত নবোত্থিত নব্যসম্প্রদায়ের নব আচার-ব্যবহারের ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত। এখন এ কালসমরে জয়শ্রী কোন্‌দিকে প্রসন্ন হইবেন, তাহা সুদূর ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। কিন্তু যে ভারতে অতি-পুরাকাল হইতে আবহমানকাল অতীতের উপর সমধিক শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রদর্শিত ও অনুশীলিত, যে ভারতে অনৈতিহাসিক সময়ের মহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ, বেদসংহিতা আদ্যধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানে চিরদিন পূজিত ও আদৃত, যে ভারতে সনাতন ধর্ম্ম চিরদিন পরিবর্ত্তিত হইয়াও প্রায় অপরিবর্ত্তিতভাবে চালিত, সে ভারতে নূতন পুরাতনকে একেবারে গ্রাস করিবে বা ধ্বংস করিবে, এমন আশা করা যায় না। যাহা হিন্দুজাতির চিরন্তন প্রকৃতির বিরুদ্ধ, তাহা সংঘটিত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। সেজন্য সাহঙ্কারে বলা উচিত, যে হিন্দুধর্ম্মের বা হিন্দুসমাজের সনাতন মূলপ্রকৃতি কদাচ নূতনসংযোগে বিলুপ্ত হইবে না; কিন্তু আবশ্যকমত উহার আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে মাত্র। এখন তাহাই আমাদের নয়নগোচর হয়।

যে দিন থানেশ্বরের মহাসমরে হিন্দুজাতি মুসলমান জাতির নিকট পরাজিত হয় এবং সেই সঙ্গে ভারতের সুখরবি অস্তমিত হইয়া যায়, সেই দিন হইতে এতাবৎ কাল সমগ্র হিন্দুসমাজ প্রাচ্যবিজ্ঞান অনুশীলন করতঃ আধিভৌতিক বিষয়ে স্থিতি-শীল হইয়া এক প্রকার মোহনিদ্রায় নিদ্রিত থাকে বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতিসাধন করিয়া জাতিধর্ম্ম পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এখন আবার ইংরাজ রাজের অনুগ্রহে আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার সুবিমল জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া আধিভৌতিক উন্নতিসাধন করতঃ সভ্যতাপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের জাতিধর্ম্ম বিনষ্ট হইবার উপক্রম এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিকতা বিনষ্ট প্রায়।

এখন আমরা ইংরাজি বিদ্যারই সম্পূর্ণ আদর করিয়া থাকি। জ্ঞান

বল, সম্মান বল, অর্থ বল, সংসারিক সুখসচ্ছন্দতা বল, সকলই আমরা আজকাল ইংরাজিবিদ্যাপ্রভাবে অর্জ্জন করিতে প্রয়াস পাই। যে স্থলে এত অধিক প্রলোভন, সে স্থলে আপামর সকলেই যে সে বিষয়ে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। অপরপক্ষে সমাজে প্রাচ্যবিদ্যার এখন কিছুমাত্র আদর নাই। "সর্ব্বশূন্যাদরিদ্রতা" ইহার চিরসহচর; সে স্থলে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনে কে মনোনিবেশ করিতে যান? কিন্তু যদি আমরা ভারতমাতার সুসন্তান হই এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ পূর্ণভাবে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হই, আবহমানকাল আদৃত প্রাচ্যবিজ্ঞানের সম্যক আদর ও সম্যক অনুশীলন করা আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে আর্য্যজাতির পবিত্র শোণিত আমাদের শিরায় শিরায় বহমান, সেই আর্য্যজাতির কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ প্রাচ্যবিজ্ঞানের অনাদর করিয়া কোন্ কুলাঙ্গার স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিতে ইচ্ছা করেন? আরও দেখ, এই প্রাচ্যবিজ্ঞান প্রভাবে ভারত একদিন জগতে শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হয়। যে সময়ে ইংরাজদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বন্য পশুর ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে বিচরণ করিতেন, সেই সময়ে ভারত এই বিজ্ঞান বলে প্রাচ্যজগতে সভ্যতা-জ্যোতি বিকীর্ণ করে। যে প্রাচ্যবিজ্ঞানদ্বারা সমগ্র প্রাচ্যজগৎ পূর্ব্বে এত অধিক উপকৃত, এখন সেই প্রাচ্যবিজ্ঞানের অনাদর করা কি আমাদের কর্ত্তব্য?

এই প্রাচ্যবিজ্ঞানই আমাদের প্রধান ও প্রকৃত গৌরবের বিষয়। এই প্রাচ্যবিজ্ঞান দেখিয়াই আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া থাকি। পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করতঃ কালোচিত শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হইলে, আমরা পুনরায় পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় জাতীয় জীবনে উন্নতি সাধন করিতে পারিব। অতএব যে প্রাচ্যবিজ্ঞান পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি-কলাপ আমাদের মনে চিরজাগরুক করাইয়া দেয়, তাহার সম্যক অনুশীলন করা আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আরও দেখ, এই প্রাচ্যবিজ্ঞানের অস্তিত্বের সহিত হিন্দুজাতির অস্তিত্ব, হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব অপরিহার্য্যরূপে জড়িত। আমাদের রাজশক্তি গিয়াছে, ধনসম্পদ্ সকলই গিয়াছে, আছে কেবল একমাত্র প্রাচ্যবিজ্ঞান বা সংস্কৃত

দেবভাষা। তাহাও আজ কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে। হায়! হিন্দুসমাজের কি দুর্দ্দিন উপস্থিত! এই প্রাচ্যবিজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, আমাদের জাতিধর্ম্ম চিরদিনের জন্য নষ্ট হইবে এবং হিন্দুজাতির অস্তিত্বও জগতে একেবারে লুপ্ত হইবে।

এখন সমাজের যেরূপ দারুণ দুরাবস্থা উপস্থিত, তাহাতে যে ধর্ম্মধন আবহমানকাল আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর এবং যাহার বলে আমরা এতদিন নানাবিঘ্নসত্ত্বেও জগতে জাতীয়তা রক্ষা করিয়া পবিত্র শোণিতের গর্ব্ব করি, সেই সনাতন ধর্ম্ম এবং উহার ভিত্তিস্বরূপ প্রাচ্যবিজ্ঞানকে আমাদের মস্তকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিরোমণি করিয়া রাখা উচিত। আর যাঁহারা পাশ্চাত্যবিদ্যায় বিমোহিত হইয়া প্রাচীন হিন্দুসমাজকে পাশ্চাত্য আদর্শে পুনঃগঠিত করিতে সাভিলাষী, তাঁহাদের নবোৎসাহ ও তথা-কথিত মোহনিদ্রা হইতে সমুত্থান কুম্ভকর্ণের অসাময়িক জাগরণের ন্যায় মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র। তাঁহারা আপনাদিগকে সমাজসংস্কারকজ্ঞানে মহা আস্ফালন করেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা হিন্দুসমাজদ্রোহী। তাঁহারা কি জানেন না বা বুঝিতে পারেন না, জাতিধর্ম্মনাশে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে? জাতিধর্ম্ম রক্ষা করা হিন্দুমাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং পরাধীন অবস্থায় আধিভৌতিক উন্নতিসাধন বিড়ম্বনা মাত্র, এরূপ চিন্তা কি তাঁহাদের বিকৃত মস্তিষ্কে কখনও উদয় হয় না?

পাশ্চাত্যশিক্ষা এদেশে বহুবিস্তৃত হওয়ায়, প্রকৃতির অনিবার্য্য নিয়মানুসারে সুফল ও কুফল উভয়ই দৃষ্ট হয়। এই শিক্ষার গুণে আধিভৌতিক বিষয়ে হিন্দুসমাজের যে জড়ভাব এতদিন উহার অস্থিমজ্জায় নিহিত ছিল, তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে এবং ইহা সভ্যতাপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেছে। এই শিক্ষার গুণে এখন আমাদের চক্ষু নানাবিষয়ে উন্মীলিত, আমরা দেশবিদেশ ভালরূপ জ্ঞাত এবং সভ্যজাতির ন্যায় আমরা আধিভৌতিক উন্নতির জন্য নূতন উৎসাহে উৎসাহান্বিত। এই শিক্ষার গুণে যাহা বিজ্ঞান-সম্মত, তাহাই আমাদের বিশ্বসনীয় এবং প্রাচীন শাস্ত্রগুলি একেবারে অভ্রান্ত বিবেচনা না করিয়া উহাদের সত্যানুসন্ধানে এখন আমরা তৎপর।

এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে আমরা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া পরম্পরাগত অজ্ঞানতা জন্য কুসংস্কাররূপ মোহান্ধকার হইতে উন্মুক্ত প্রায়।

এ সকল সুফল দর্শনে মনে বিশেষ আনন্দোদয় হয় বটে, কিন্তু ইহার কুফল দর্শনে মন তদনুরূপ ব্যথিত। দেখ আজকাল অনেকে ইংরাজি অর্থকরী বিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া দেশীয় শাস্ত্রগুলির সম্যক অনাদর করেন। তাঁহারা বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজবংশীয়দিগের প্রসাদলাভেচ্ছায় জাতীয়তার মস্তকে পদাঘাত করেন। যাঁহারা কলেজের যত উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা স্বধর্ম্মকে ততই ঘৃণা করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, হিন্দুধর্ম্ম কেবল কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, ইহা অসার, অপদার্থ পৌত্তলিকতা মাত্র। দেখা যায়, যাঁহারা পাশ্চাত্যগরল পান করেন না, স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকে; আর যাঁহারা এ গরল যত অধিক পান করেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মের প্রতি তত বীতশ্রদ্ধ হন।

এইরূপে পাশ্চাত্যশিক্ষা বহু বিস্তৃত হওয়ায় হিন্দুসমাজের আধ্যাত্মিক অধঃপতন ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। কি আক্ষেপের বিষয়! কি পরিতাপের বিষয়! যে হিন্দুজাতি জগতে আধ্যাত্মিকতার জন্য বিখ্যাত, যে জাতির অধিকাংশ লোক পরম নিষ্ঠাবান ও সদাচারী, সেই হিন্দুজাতি আজ শিক্ষা দোষে আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। একবার নেত্রোন্মীলন করিয়া সমাজের প্রকৃত অবস্থা ভালরূপ পর্য্যালোচনা কর, বুঝিতে পারিবে, আমরা কি ছিলাম, এখন কি হইতেছি, আমাদের কতদূর আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিতেছে। যে হিন্দু শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই জানিতেন না এবং যিনি কেবল শাস্ত্রাদেশ পালন করিয়া ধর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিতেন, সেই হিন্দু আজ অর্থোপার্জ্জনের জন্য, উদরান্নের জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানরহিত এবং সকল বিষয়ে শাস্ত্রাদেশ উল্লঙ্ঘন করিতেই ব্যগ্র। আধ্যাত্মিক অবনতি আর কাহাকে বলে?

এখন যে আধ্যাত্মিক অবনতির পথে সমাজ ক্রমশঃ অগ্রসর, সে পথ কি প্রকারে রুদ্ধ হইতে পারে, তাহা বিচার করা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকের বিশ্বাস, যে সকল শাস্ত্র এতদিন হিন্দুজাতিকে আধ্যাত্মিক পথে, ধর্ম্ম পথে অবিচলিত রাখিতে সমর্থ হয়,

সেই সকল শাস্ত্র পুনরায় অনুশীলিত হইলে, আমরা আমাদের যথার্থ শ্রেয়ঃ বুঝিতে পারিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে তৎপর হইব। এই বিষয়টী কোন কোন সহৃদয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি ভালরূপ বুঝিয়াছেন এবং তাঁহাদের যত্নে ও গুণে সমাজে পুনরায় অনুকূল পবন বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। এতদিন লোকে পাশ্চাত্যবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া দেশীয় শাস্ত্রের সম্যক অনাদর করিতেন; এখন তাঁহারা আবার প্রাচীন, গলিত, কীটদষ্ট প্রাচ্যবিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেশীয় শাস্ত্ররূপ মহার্ণবে কত উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট রত্নরাজি প্রক্ষিপ্ত, তাহারই অনুসন্ধানে আজকাল অনেকে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ইহা পরম সুখের বিষয়, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও শাস্ত্রের সম্যক অনুশীলন আরম্ভ হয় নাই। সমাজের মঙ্গলের জন্য যে পরিমাণে শাস্ত্রালোচনা আবশ্যক, তাহা এখনও আরম্ভ হয় নাই। অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া অবকাশমত শাস্ত্রানুশীলন করা হিন্দু মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রপাঠ করিলে, মনে যে বিমল আনন্দ উত্থিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। আবার শাস্ত্রোল্লিখিত উপদেশ-মত কার্য্য করিতে পারিলে, আমাদের দুঃখের আলয় কিরূপ স্বর্গসুখ প্রদান করে, তাহাও বর্ণনাতীত।

আজকাল অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, যে সমাজের অধিনায়ক ব্রাহ্মণজাতি এতকাল কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া হিন্দুসমাজকে আধিভৌতিক উন্নতি সাধন করিতে দেন নাই এবং ইহাকে সকল বিষয়ে কুসংস্কারজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেন। তাঁহারা বলেন, এখন আমরা জাতীয় উন্নতি সাধন করতঃ জগতে এক শ্রেষ্ঠ জাতি হইব এবং সকল বিষয়ে আধিভৌতিক উন্নতি সাধন করিব। অতএব ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ না করিয়া আমরা এখন পাশ্চাত্যবিদ্যা উত্তমরূপ শিক্ষা করতঃ পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করিব এবং সেই সঙ্গে সভ্যতার উচ্চপদবীতে আরোহণ করিব। এখন জিজ্ঞাস্য, সমাজের পরাধীন অবস্থায় কি আধিভৌতিক উন্নতি সম্ভব? যে ব্যক্তি পরের দাস, তাহার আবার আধিভৌতিক উন্নতি কি? যে জাতি পরাধীন ও পরের গলগ্রহ, সে জাতির আবার আধিভৌতিক

উন্নতি কি? সে জাতি কেবল জাতিধর্ম্ম বজায় রাখিয়া জগতে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইবে, সে জাতি কেবল ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া দুঃখের দিন দুঃখে অবসান করিবে এবং যখন সুসময় উপস্থিত হইবে, তখন পুনরায় আধিভৌতিক উন্নতি সাধন করিয়া জগতে গণ্য ও মান্য হইবে। জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া হিন্দুজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই ব্রাহ্মণ জাতি এতকাল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া আমাদিগকে কেবল ধর্ম্মের পথ দেখান। এখন যে সকল শাস্ত্রপাঠ করিলে আমাদের জাতিধর্ম্ম পূর্ণভাবে বজায় রাখিতে পারা যায়, তাহা যে আমাদের কতদূর আবশ্যক, সে বিষয়টী কি সকলে ভালরূপ বুঝিয়া দেখেন?

দেশীয় শাস্ত্রের অনাদর করায়, একদিকে আমাদের যেরূপ আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিতেছে, সেইরূপ আবার অপরদিকে শারীরিক অবনতিও ঘটিতেছে। এখন আমরা নানাকারণে ক্ষীণবীর্য্য ও অল্পায়ু। যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ক্রিয়াযোগ দ্বারা আমরা দীর্ঘজীবন লাভ করিতাম এবং সুস্থ শরীরে জীবন অতিবাহিত করিতাম, সে সকল এখন ধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া আমাদের ধ্রুববিশ্বাস জন্মিয়াছে, সেই সঙ্গে আমরাও এখন অল্পায়ু হইতেছি।

পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আজকাল আমরা মনে করি, আমাদের চক্ষু সকল দিকে প্রস্ফুটিত। যে ব্রাহ্মণজাতি এতকাল হিন্দুসমাজকে আধিভৌতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেন নাই, এখন আমরা তাঁহাদের স্বার্থপরতা ও ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়াছি এবং সেই সঙ্গে আমরা তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে শিখিতেছি। ব্রাহ্মণ দেখিয়া আমাদের মস্তক আর অবনত হইতে চায় না। মনে হয়, পূজারি ব্রাহ্মণগণ কবে ভারত হইতে চিরবিদায় লইবেন। যে স্বার্থপর ব্রাহ্মণজাতি এতকাল হিন্দুসমাজকে চালনা করিয়া উহাকে অকূলপাথারে ডুবাইয়াছেন, তাঁহারা কি আমাদের সম্মানের পাত্র? কিন্তু মহামহোপাধ্যায়, অসাধারণ বিদ্যাবিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই আমাদের পরমারাধ্য গুরু। তাঁহারা আমাদের শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যান করেন, তাহাই একমাত্র আমাদের শিরোধার্য্য। তাঁহারা চতু-র্বেদের যেরূপ অর্থ করিয়া প্রচার করেন, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের

মনে হয়, স্বার্থপর ব্রাহ্মণ জাতির অত্যাচারে আমরা এতদিন যে বেদপাঠ করিতে পাইতাম না, এখন সেই বেদের অর্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা ব্রাহ্মণজাতির মস্তকোপরি উপবেশন করিতেছি। যে পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণজাতির দর্প চূর্ণ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি। যথার্থ বলিতে কি, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে যাইবার উপক্রম বলিয়া আমাদের মনে ঐরূপ কুসংস্কার ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে। যে নিঃস্বার্থ ব্রাহ্মণজাতি ত্রিংশশতাব্দি হিন্দুসমাজকে ধর্ম্মের পথে, আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর করান, তাঁহারা হইলেন আজ স্বার্থপর ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক! আর যে সকল পাশ্চাত্যমূর্খ হিন্দুশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া উহার বিকৃত অর্থ করেন, তাঁহারা হইলেন পরমারাধ্য শিক্ষাগুরু! হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম অধঃপাতে যাইবার আর কি বাকী?

আজকাল অনেক কৃতবিদ্য যুবক শাস্ত্রপাঠে ঘোর আপত্তি করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, শাস্ত্রগুলি অলীক, কাল্পনিক জ্ঞানে ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ এবং উহাদের কিছুমাত্র সারবত্তা নাই। বোধ হয়, তাঁহারা একথা কোথাও শ্রবণ করেন নাই, যে ধর্ম্মশাস্ত্রের আদ্যন্তর যোগেশ্বর প্রকটিত; সেজন্য উহাদের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা কলিযুগের সাধারণ মানবের সাধ্যাতীত এবং অনেক স্থলে শাস্ত্রোল্লিখিত উপাখ্যান কেবল রূপকে পূর্ণ, তাহা ভেদ করিয়া উহাদের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অর্থ করা অনেক সময় দুঃসাধ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ কথা তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না, অথবা প্রবেশ করিলেও মনে স্থান পাইবে না। এক কুসংস্কারের দোহাই দিয়া তাঁহারা আজকাল সব উড়াইয়া দেন।

ওহে উন্নত পাঠক! তোমার যে রুচি আজ স্পেন্সার, ডারউয়িন, মিল প্রভৃতি পাঠ করিয়া সুমার্জ্জিত, সেই মার্জ্জিত রুচির নিকট কি কাল্পনিক উপাখ্যান সমাকুল পুরাণস্তূপ ও জটিল দর্শনশাস্ত্র কদাচ পাঠ্য হইতে পারে? কেন তুমি ঐ সকল অসার কাল্পনিক পুস্তক পাঠ করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিবে? আজ তুমি ইংরাজরাজের অনুগ্রহে অত্যুজ্জ্বল পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের প্রকৃত আস্বাদ পাইয়াছ, তুমি পাশ্চাত্যবিজ্ঞানানুশীলনেই বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে শিখিয়াছ, পুরাকালের দর্শনশাস্ত্রপাঠ কি এখন তোমার

ভাল লাগে? যাহা হউক, তুমি কি কোথাও শ্রবণ কর নাই, যে ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর এমন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সদুপদেশ আছে, যাহা কার্য্যে পরিণত করিলে, এই দুঃখপূর্ণ ভবধাম অশেষ সুখের আলয় হয়? তুমি কি কোথাও শ্রবণ কর নাই, যে ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর এমন মহৎ মহৎ উচ্চ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত, যাহা পাশ্চাত্যবিজ্ঞান এখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, অথবা যাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা এখনও উহার জন্মে নাই?

আজ ইংরাজরাজ আমাদের উপর সুপ্রসন্ন হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ মাকালফল আমাদের হস্তে দিতে ব্যগ্র। আমরাও উহার বাহ্যিক চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হইয়া উহা পাইবার জন্য সমধিক সমুৎসুক। কিন্তু উহার অভ্যন্তর কিরূপ পুতিগন্ধে পূর্ণ, তাহা এখনও আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে নাই। একবার স্থিরচিত্তে ভাব দেখি, পাশ্চাত্যসভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে হিন্দুসমাজের কিরূপ দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত? অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবন, পানদোষ, ভোগবিলাস, কুটিলতা, চাতুর্য্য প্রভৃতি কৃত্রিমসভ্যতাসুলভ দোষসমূহ সমাজে ক্রমশঃ কিরূপ প্রবল হইতেছে? এখন এই সকল দোষ বঙ্গভূমিকে ছারখার করিতে উদ্যত। এখন ধর্ম্মশাস্ত্রের পুনরনুশীলন ব্যতীত সমাজোদ্ধারের উপায়ান্তর নাই।

পাশ্চাত্যসভ্যতা "বিষকুম্ভং পয়োমুখং"। ইহার হলাহল পান করিয়া হিন্দুসমাজ অত্যল্প সময়ে জর্জ্জরীভূত। ধর্ম্মোপদিষ্ট সৎকর্ম্মানুষ্ঠানই ইহার সঞ্জীবনী মহোষধি। যে সকল সৎকর্ম্ম বা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াযোগ তুমি আজ কুসংস্কারজ্ঞানে ত্যাগ করিতে বসিয়াছ, বা ত্যাগ করিয়াছ, উহাদেরই পুনরনুষ্ঠান দ্বারা তুমি জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে পারিবে, বা জগতে এক মহৎ জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ তথাকথিত অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া ঐ সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া হিন্দুনামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিয়া যান। আজ কি না তুমি ঐ সকল সৎকর্ম্ম ত্যাগ করায় অল্পায়ু হইয়া নিজ বুদ্ধি দোষে "মজিলে স্ববংশে আপনি, মজাইয়াছ কনক ভারতে"। প্রকৃত শ্রেয়োলাভে অভিলাষী হইলে, জাতীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হও, জাতীয়তা ভালবাস, এবং জাতীয় শাস্ত্রের সম্যক অনুশীলন কর।

বৈজ্ঞানিক হিন্দু-ধর্ম্ম।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মাণ্ড রহস্যময়।

এ জগতের যাবতীয় পদার্থই আমাদের নিকট রহস্যময়। কেবলমাত্র চিরপরিচিত বলিয়াই, উহারা রহস্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বস্তুতঃ আমরা যখন যে দিকে যে বস্তু নয়নগোচর করি, তাহাই আমাদের সসীম বুদ্ধির নিকট একটী প্রকাণ্ড রহস্য। তুমি যে বিষয়টী যত উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষা কর না কেন, যথার্থ বলিতে কি, তাহাই তোমার নিকট তত বিরাট রহস্য। তুমি যতই কেন বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলন কর না, তুমি বস্তুমাত্রের কেবল বাহ্যস্তরটী বুঝিতে পার এবং উহা লইয়াই চিরদিন আন্দোলন কর; কিন্তু যদি তুমি উহার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাও, অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হয় এবং তুমিও ক্ষুণ্নমনে প্রত্যাবর্ত্তন কর। যাহারা সংসারে গণ্ডমূর্খ, তাহাদের নিকট কিছুই রহস্যময় বলিয়া বোধ হয় না; আর যাঁহারা যত জ্ঞানী ও যত প্রাজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট বস্তুমাত্রেই তত রহস্যময়।

এই যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ প্রতিদিন তোমার নয়নসমক্ষে ব্যোমমার্গে উদিত, অস্তমিত বা বিলীন হয়, উহাদের বিষয় তুমি কি জান, বল? সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল, গ্রহগণ উহার চতুর্দ্দিকে দিবারাত্র অমিতবেগে ভ্রাম্যমাণ এবং উহা হইতে আলোক, উত্তাপ ও জীবনীশক্তি

প্রাপ্ত. ঐ সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডল পরস্পর পরস্পরের মধ্যাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট ও শূন্যমার্গে অবস্থিত, ইত্যাদি জ্যোতিষ্শাস্ত্রের নানা কথা তুমি এখন উত্তমরূপ শিক্ষা কর ; ইহ'তেই বা তুমি উহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের কতটুকু জান, বল? আর যিনি দূরবীক্ষণ সহযোগে উহাদিগকে আজীবন উত্তমরূপ দেখেন, তিনিই বা তোমা অপেক্ষা অধিক কি শিক্ষা করেন?

এই যে প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান জগৎ, কখন চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত, কখনও বা তদভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, যাহার পৃষ্ঠদেশে অসংখ্যজাতীয় জীবজন্তু সদা বিচরমাণ ও অসংখ্যজাতীয় উদ্ভিজ্জ সদা উৎপদ্যমান, এই জগৎ সম্বন্ধেই বা তুমি কি জান, বল? সত্য বটে, পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে তুমি ইহা দর্শন. শ্রবণ ও স্পর্শ কর এবং ইহার আঘ্রাণ ও আস্বাদ লও, এমন কি যে সকল ভৌতিকপদার্থ-সমুচ্চয়ের পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা ইহা বিরচিত. তুমি আজ পরীক্ষাগারে উহাদিগকে বিশ্লিষ্ট কর এবং যে সকল ভৌতিকশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ইহা এমন সুন্দর রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করে, উহাদের নিয়মাবলি তুমি আজ সোৎসাহে নিরূপণ কর, তাহাতেই বা তুমি জগতের জ্ঞাতব্যবিষয় কতটুকু জানিতে পার, বল?

এই যে অত্যল্প উদক লইয়া তুমি উহাকে যন্ত্র সংযোগে উদজন ও অম্লজনে বিশ্লিষ্ট কর এবং পুনরায় উদজন ও অম্লজন লইয়া উদক প্রস্তুত কর, ইহাতেই বা তুমি উদক সম্বন্ধে কি অধিক শিক্ষা কর, বল? এতদূর শিক্ষা করিয়াই কি উদক সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানস্পৃহা সম্যক চরিতার্থ হয় এবং আর অধিক শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা তুমি অনুভব কর না?

এই যে সর্ষপকণাবৎ বটবীজ মৃত্তিকায় পতিত হইয়া তোমার নয়নসমক্ষে কালক্রমে সুবিশাল বৃক্ষে পরিণত, ইহা সম্বন্ধেই বা তুমি কি জান, বল? সত্য বটে, আধুনিক উন্নত উদ্ভিজ্জবিজ্ঞান তোমায় এতৎসম্বন্ধে নানা কথা শিক্ষা দেয় এবং উহার শ্রেণীবিভাগ ও দেহ পোষণ সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক সত্যের উপদেশ দেয়, তাহাতেই কি তোমার মন সম্পূর্ণরূপ প্রবোধ মানে?

এই যে মানব কয়েক দিবসের জন্য জলবুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত হইয়া কখনও বা সুখে হাসেন, কখনও বা দুঃখে কাঁদেন, তৎপরে চিরদিনের জন্য

কালকবলে বিলীন হইয়া যান ; এখন সেই মানবের জীবন ও দেহ সম্বন্ধে তুমি কি জান, বল ? তোমার বিজ্ঞান, তোমার দর্শন ও তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র এতৎসম্বন্ধে নানা কথা তোমায় শিখায় বটে এবং তুমিও নিজ বিশ্বাসে তাহা মহাসত্য বলিয়া আদর কর বটে, তাহাই যে জগতের অমোঘ সত্য, তুমি তাহা কিরূপে জানিলে, বল ? তোমার শারীরস্থান ও শারীরবিধানশাস্ত্র তোমার দেহ সম্বন্ধে নানা কথা শিখায় বটে এবং অনুবীক্ষণ সহযোগে ইহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখায় বটে, তাহাতেই কি তোমার মন সম্পূর্ণরূপে প্রবোধ মানে ? যথার্থ বলিতে কি, দেহের প্রত্যেক যন্ত্র ও প্রত্যেক যন্ত্রের প্রত্যেক ক্রিয়া আমাদের নিকট প্রকৃত রহস্যময়।

এখন এই রহস্যময় জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য আমাদের কৌতূহল শিখা চিরপ্রদীপ্ত। যেরূপ বুদ্ধিশক্তি লইয়া আমরা অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করি, অথবা যুগধর্ম্মে আমাদের আধিভৌতিক উন্নতিসাধিকা জ্ঞানশক্তি নৈসর্গিক জ্ঞান বা সংস্কারের পরিবর্ত্তে যেরূপ বিকসিত, তাহাতে আমরা সকল বিষয়ে স্বতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া থাকি। এই ঔৎসুক্য বশতঃ আমরা সাধনবলে, অনুশীলনবলে অপার জ্ঞানোন্নতিসাধন করিয়া জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের পরিবর্দ্ধন করি, স্বীয় সামাজিক অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করি ও প্রাণীজগতে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করি ; এমন কি চিররহস্যময়ী অমিততেজস্বিনী প্রকৃতি দেবীকেও আমরা আপনাদিগের স্বাভিপ্রায়-সাধনোদ্দেশে নিযুক্ত করিতে শিক্ষা করি এবং উহার উপর জয়লাভ ও আধিপত্য বিস্তার করিতে ক্রমশঃ প্রয়াস পাই।

যেমন একটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু সামান্য জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাপরম্পরা সন্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পিতামাতাকে উহাদের কারণ জিজ্ঞাসা করে ; সেইরূপ মানবও জাতীয় জীবনের শৈশবাবস্থা হইতে নিজ বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সকল বিষয়ের কারণ পরম্পরা অবগত হইবার জন্য সমুৎসুক হন। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি যে সময়ে যেরূপ বিকসিত ও স্ফুরিত বিশ্বের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে তিনি তদনুরূপ তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিয়া আপনার চিরপ্রদীপ্ত কৌতূহলশিখা নির্ব্বাপিত করেন। দেখ, অসভ্যাবস্থায়

বায়ু দেবতা বিশেষ, দার্শনিকযুগে উহা একটী ভৌতিক পদার্থ, বৈজ্ঞানিক-যুগে উহা অম্লজন ও যবক্ষারজনের মিশ্র সংযোগ মাত্র।

এইরূপে মানবের জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। এ জগতে উন্নতিরও সীমা আছে, অবনতিরও সীমা আছে। যখন মানব জ্ঞানের চরমসীমায় উপনীত হন, তখন খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হইয়া ভৌতত্বিক পরিবর্ত্তন দ্বারা মহাদেশবিশেষ জলমগ্ন হয় এবং সমুদ্রের গর্ভস্থ ভূমিখণ্ড উত্থিত হইয়া মহাদেশে পরিণত হয়। সেই খণ্ড প্রলয়ে জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার লুপ্তপ্রায় হইয়া যায় এবং নবোত্থিত মহাদেশে যে নবমানবজাতি আবির্ভূত হয়, তাহাদিগকে পূর্ব্বতন জ্ঞানের পুনরভিনয় করিতে হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য, মানব জীবনের কূটপ্রশ্ন কি, যাহা মীমাংসা করিবার জন্য মানব চিরদিন সমভাবে সমুৎসুক? এ পৃথিবীর আদি ও অন্ত কোথায় ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে, কিরূপেই বা ইহা সৃষ্ট হইল, কতদিন হইল ইহা সৃষ্ট হইয়াছে কতদিনই বা ইহা রহিবে, পরেই বা কি হইবে, তুমি কোথা হইতে আসিলে, কোথায় বা যাইবে, কেন তুমি সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য কি? এই সকল প্রশ্নই মানব জীবনের কূটপ্রশ্ন। এই সকল কূটপ্রশ্ন মীমাংসা করিবার জন্য মানব চিরদিনই স্বীয় অসীমবুদ্ধি চালনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি কোন কালে ইহাদের ভালরূপ মীমাংসা করিতে সমর্থ হন না। এই সকল কূটপ্রশ্ন মীমাংসা করিবার জন্য তিনি বুদ্ধিবলে কত দর্শনশাস্ত্র, কত বিজ্ঞানশাস্ত্র রচনা করেন; কিন্তু সকলশাস্ত্রই তাঁহাকে সমস্বরে বলে, এ সকল বিষয় মানবমনের অজ্ঞেয়। কেবলমাত্র অতি প্রাচীনকালে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যোগেশ্বরদিগের সমাধিস্থ আত্মায় এ সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রতিভাত হইত।

এখন জিজ্ঞাস্য, মানবের জ্ঞানশক্তি কি প্রকারে উদ্ভূত? বিজ্ঞানের মতে সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া জাতীয় সাধনার গুণে মানবমস্তিষ্কের অধিক স্ফূর্ত্তি হওয়াতে কালক্রমে তাঁহার জ্ঞানশক্তি ক্রমবিকশিত। আধ্যাত্মবিজ্ঞা-নের মতে, যুগধর্ম্মে মানবের আধ্যাত্মিকতার হ্রাস হওয়াতে, জগতের আধি-

ভৌতিক উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহার জ্ঞানশক্তি ক্রমবিকসিত। সভ্য মানবের জ্ঞানশক্তি যেরূপ স্ফুরিত, অসভ্য বর্ব্বর মানবের বুদ্ধি সেইরূপ অস্ফুরিত। আবার বর্ব্বর মানবের বুদ্ধি বনমানুষের বুদ্ধির সহিত তুলনা করিলে, উহাদের ভিতর বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। অতএব মানববুদ্ধি এ জগতে বৈশেষিক।

মানবের এই জ্ঞানশক্তি চিরদিনই অসম্পূর্ণ ও সসীম। অনুশীলনবলে, সাধনবলে ইহা ক্রমোন্নত হইবে এবং ক্রমোন্নত হইয়া তাঁহার আধিভৌতিক সুখসম্ভার বৃদ্ধি করিবে, এজন্য প্রাথমিক অবস্থায় ইহা এত ভ্রমসঙ্কুল ও প্রমাদগ্রস্ত হয়। কিন্তু নিকৃষ্ট জন্তুদিগের নৈসর্গিক সংস্কার কদাচ প্রমাদগ্রস্ত হয় না। জগতে উহাদের উন্নতিও নাই, অবনতিও নাই; উহারা প্রাকৃতিক সাম্যাবস্থায় অবস্থিত। মানবের জ্ঞানশক্তি যেমন স্ফুরিত তাঁহার নৈসর্গিক সংস্কার তেমনি ক্রমশঃ অস্ফুরিত ও মন্দিভূত। তিনি কেবল জ্ঞানশক্তির উন্নতিসাধন করিয়া জগতে অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকিতে চাহেন। এই জ্ঞানশক্তি যতই কেন স্ফুরিত হউক না, যতই কেন উন্নত হউক না, বিশ্বের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা কদাচ শান্ত হয় না এবং কস্মিনকালে তিনি এ জগতে জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারেন না। অথচ যে সময়ে তিনি যেরূপ জ্ঞানলাভ করেন, তাহাই তাঁহার নিকট অভ্রান্ত ও মহৎ সত্যজ্ঞানে পূজিত; তাহাই আবার ভূয়োদর্শনে বহুকাল পরে অসত্যজ্ঞানে উপেক্ষিত হইতে দেখা যায়। তাহার সাক্ষ্য, দেখ না পূর্ব্বে ধরিত্রী অচলা ছিলেন, এখন কিনা উহা অমিতবেগে অহর্নিশি ভ্রাম্যমানা।

যথার্থ বলিতে কি, রহস্যময়ী প্রকৃতির মহাসত্যগুলি আমাদের এই ভ্রমসঙ্কুল জ্ঞানশক্তির উপর চিরদিন যেন অট্টহাসিয়া বিদ্রূপ করে। আমরা উহা-দিগকে পাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করি বটে; কিন্তু উহারা আমাদিগের নিকট হইতে ততই দূরে পলায়ন করে, কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে অত্যল্পমাত্র আভাস দিয়াই আমাদিগকে চরিতার্থ করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মহাত্মাগণ যোগাভ্যাস দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণ করতঃ যোগবলে মহাসত্য প্রাপ্ত হইতেন। এখন এ কলিযুগে আমরা কেবলমাত্র প্রকৃতিপুস্তক অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃতির মহাসত্য অবগত হই এবং জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার

অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞানোন্নতি করি। সত্যসংগ্রহে আমাদের সমস্ত চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম প্রায় বিফল হয়। এজন্য জগৎবিখ্যাত নিউটন সাহেব বলেন, "জ্ঞানসমুদ্র পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ, আমি উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উপলখণ্ডমাত্র সংগ্রহ করিতেছি" এবং পণ্ডিতপ্রবর সক্রেটিশ বলেন "আমি এইমাত্র জানি, যে আমি কিছুই জানি না।" এজন্য প্রকৃতির গূঢ়রহস্যজ্ঞ মহাকবি সেক্ষপীয়ার যথার্থই বলেন—"There are many things more in this world, Horatio, than your Philosophy can dream of." দর্শনশাস্ত্র যাহা ভাবে, তদ্ব্যতীত সংসারে আরও অনেক বিষয় আছে। বস্তুতঃ আমরা সসীম জ্ঞানশক্তিবলে এ জগতের কোন বিষয়ের আদ্যন্ত পাই না, বা পাইব না।

প্রকৃতির মহাসত্য অবগত হওয়া মানবজীবনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। "নাস্তি সত্যাৎপরো ধর্ম্মঃ।" সত্য লাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এ জগতে আর কিছুই নাই। পরমার্থজ্ঞান বা তত্বজ্ঞান লাভ করাতেই জীবাত্মার যথার্থ শ্রেয়োলাভ ও মঙ্গললাভ এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের মহৎ ব্রত। ইহার জন্যই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন জ্ঞানমার্গের এত অনুশীলন করে এবং উহার এত প্রশংসা করে। তত্ত্বজ্ঞানলাভেই মহাত্মাগণ জীবন্মুক্ত হন।

জগতে সত্যের বিনাশ নাই। সত্য চিরদিনই নিজ জ্যোতি সমভাবে বিকীর্ণ করে। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির কথা প্রচার করাতে যে সকল পাদরীপুঙ্গবেরা মহাত্মা গ্যালিলিয়োকে কারারুদ্ধ করেন, তাঁহারা কি সেই প্রকার পাশব অত্যাচারে পৃথিবীর আহ্নিকগতি বন্ধ করিতে পারেন? দেখ, সেই সকল দুরাচারগণ অনন্তকালে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মহাত্মা গ্যালিলিয়ো এখনও জগতে জীবিত আছেন, "কীর্ত্তি যস্য স জীবতি"।

"একমেবাদ্বিতীয়ং" এর বার্ত্তা প্রচার করাতে, যে সকল নরাধম যীশুখৃষ্টকে ক্রুসে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, তাহারা কি জগতে একেশ্বরবাদ বন্ধ করিতে পারে? দেখ, তাহারা সকলে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু যীশুখৃষ্ট জগতে অদ্বিতীয় হইয়া আছেন এবং খৃষ্টজগতে কোটী কোটী মানব তাঁহারই ধর্ম্মামৃত পান করতঃ জীবন সার্থক করেন।

রহস্যময় ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সদা ব্যগ্র হও। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, দর্শন ও জড়বিজ্ঞানের মহাসত্য অবগত হইয়া জীবাত্মার অপার উন্নতিসাধন করিতে সচেষ্ট হও। পরমার্থজ্ঞানলাভে মনপ্রাণ অর্পণ কর এবং চিরজীবন সর্ব্বত্র ইহারই অন্বেষণ কর; তাহা হইলেই তোমার মানবজীবন ধন্য ও সার্থক হইবে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ও জড়বিজ্ঞান।

প্রথম দর্শনশাস্ত্র ও জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তিবিষয় কিঞ্চিৎ লেখা যাউক; পরে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইবে।

বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিতদিগের মতে মানবের জাতীয় ইতিহাসে জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে তিনটী যুগ বর্ত্তমান; (১) অসভ্য যুগ, (২) দার্শনিক যুগ (৩) বৈজ্ঞানিক যুগ। অসভ্য যুগে অশিক্ষিত মানব জগৎকে বিভীষিকাময় দর্শন করেন এবং ভীতিসংবলিত চমৎকার রস কর্ত্তৃক চালিত হইয়া কল্পনাবলে সকল বিষয়ের কাল্পনিক কারণতত্ত্ব উদ্ভাবন করতঃ আপনার দুর্ব্বল মনকে সান্ত্বনা করেন। আধুনিক অসভ্য মানবসমাজ দর্শন কর, জগতের এ অবস্থাটী তোমার সম্যক বোধগম্য হইবে। পরে জাতীয় সাধনার গুণে বিদ্যাবুদ্ধির ক্রমোন্নতির সহিত অসভ্যাবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইয়া মানব সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হইলে পর, তিনি জাতীয় সুখবর্দ্ধনোদ্দেশে জীবনের ও জগতের কূটপ্রশ্ন মীমাংসায় স্বীয় উন্নত ও মার্জ্জিত বুদ্ধিশক্তি চালনা করেন। এস্থলে স্বাভিপ্রায় সাধনোদ্দেশে তিনি দুইটী বিপরীত পথ (দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পথ) দেখিতে পান। প্রথমতঃ তিনি বহুদিবস দার্শনিক পথে বিচরণ করেন; অবশেষে ঐ পথের অসারত্ব দর্শনে অশেষ ফলপ্রদ বৈজ্ঞানিক পথ অনুসরণ করিতে আরম্ভ করেন।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিৎ মহাত্মাদিগের মতে সৃষ্টির সত্য ত্রেতা-দ্বাপর যুগে অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্যক অনুশীলিত হয়। তৎপরে যুগধর্ম্মানুসারে মানবের আধ্যাত্মিক অপগমনের সঙ্গে তদীয় মনে জ্ঞানশক্তি স্ফুরিত হইলে, যদিও

তিনি সংসারে আধিভৌতিক উন্নতির প্রার্থী হন, তথাচ পূর্ব্বতন যুগের আধ্যাত্মিকতা প্রাপ্তির জন্য ও জ্ঞানশক্তির সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য তিনি বহু-দিবস দর্শনশাস্ত্র অনুশীলন করেন। পরে কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান-শক্তি সম্যক স্ফুরিত হইলে, তিনি আধ্যাত্মিকতা একেবারে ভুলিয়া গিয়া সমাজের আধিভৌতিক উন্নতির জন্য সবিশেষ ব্যগ্র হন এবং আধুনিক জড়-বাদী জড়বিজ্ঞান অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন।

বিজ্ঞানের মত সত্য হউক, বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মত সত্য হউক, পুরা-কালে সভ্যজগতে দর্শনশাস্ত্রের যেরূপ সমাদর ও অনুশীলন হইত, আজকাল সভ্যজগতে জড়বিজ্ঞানের সেইরূপ সমাদর ও অনুশীলন দেখা যায়। ঐতি-হাসিক সময়ে প্রাচ্যভূমিতে মানব প্রথম সভ্যতাসোপানে আরূঢ় এবং প্রাচ্য-জগৎই দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত জন্মভূমি। ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিসর, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি দেশ পুরাকালে সভ্যতার উচ্চপদবীতে আরূঢ় হয়। সভ্যতার পূর্ণবিকাশের সময় ঐ সকল দেশে বিবিধ দর্শনশাস্ত্র রচিত ও সম্যক অনুশীলিত হয়। কিন্তু ইহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়, যে ভারতবর্ষে দর্শন শাস্ত্রের চরম উন্নতিসাধন হয় এবং হিন্দুজাতি উন্নত দর্শনশাস্ত্রে পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতির আদিগুরু। মহামহোপাধ্যায় কপিলাদি মুনিগণ যে সকল দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন, তাহা জগতে অতুলনীয়, তাঁহারা মানবজীবন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন, তাহা চিরদিন জগতে আদৃত। ভারতের নিকট গ্রীশ দর্শনশাস্ত্রের জন্য চিরঋণে আবদ্ধ। কথিত আছে, পিথাগোরাস, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীশদেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বদেশে আগমন করিতেন। তৎকালেও সভ্যদেশগুলি নানাকারণে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আনীত হইত। দিগ্বিজয়, বাণিজ্য-বিস্তার, ধর্ম্মপ্রচার, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি নানাকারণে একজাতি অন্যজাতির সহিত স্বাধীনভাবে মিলিত হইত; ইহাতেই একদেশের উৎকৃষ্ট মতামত অন্যদেশে নীত ও আদৃত হইত।

ভারতবর্ষে যতগুলি দর্শনশাস্ত্র রচিত হয়, তন্মধ্যে ষড়্দর্শন বিখ্যাত এবং আজপর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে উহারা সম্যক আদৃত। কপিল, ব্যাস, পাতঞ্জল, কনাদ, গৌতম ও জৈমিনি ঐসকল দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়া

আজ ভুবনবিখ্যাত। সেইরূপ গ্রীশদেশে পিথাগোরাস, সক্রেটিশ, প্লেটো, আরিষ্টটল, ষ্ট্রাবো, ডিমোক্রাইটস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। গ্রীকদর্শনের সহিত হিন্দুদর্শনের তুলনা করিলে, শেষোক্তটী যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিজাতীয় পণ্ডিতেরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। যথার্থ বলিতে কি, যেমন সংস্কৃত দেবভাষা ও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আমাদের পূর্ব্বতন গৌরবের প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ, সেইরূপ হিন্দুদর্শনও আমাদের জাতীয় উন্নতির আর একটী প্রধান স্মৃতিচিহ্ন। যে জাতি মানবমনের এত গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করেন, সে জাতি জগতে কতদূর উন্নতি সাধন করেন, সে বিষয়ে কেহ কি কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে পারেন ?

গ্রীকদিগের নিকট হইতে রোমানেরা এ বিদ্যা প্রাপ্ত হয়। পরে মধ্যযুগে সমগ্র ইউরোপ গ্রীশ ও রোমের ভগ্নাবশেষ অনুশীলন করিয়া আধুনিক সভ্যতাসোপানে অধিরোহন করিতে সমর্থ হয়। অতএব সাহঙ্কারে বলা উচিত, আধুনিক উৎকৃষ্ট সভ্যতার মূলীভূত কারণ হিন্দুদিগের দর্শনাদি বিদ্যা। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, আমাদিগেরই গণিতশাস্ত্র পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির গণিতশাস্ত্রের আদিগুরু এবং আমাদেরই গণনাপদ্ধতি এখন সকল সভ্যদেশে প্রচলিত। হিন্দুজাতির নিকট অন্যান্য জাতি নানাবিষয়ে কিরূপ ঋণগ্রস্ত, সে বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ব নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও এখন কিছু কিছু নির্দ্দেশ করে। এখনও এসিরিয়া ব্যাবিলন ও মিসরদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্যক আবিষ্কৃত হয় নাই ; সেজন্য প্রাচীনকালে ভারতের সহিত উহাদের কিরূপ সংস্রব ছিল, তাহা প্রায় অজ্ঞাত।

হিন্দুজাতি চিরদিন দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে কিরূপ অনুরক্ত, তাহা পণ্ডিতবর ম্যাক্সমুলার সাহেবের একটী কথায় সম্যক প্রকাশ পায়। তিনি হিন্দুজাতিকে দার্শনিকজাতি বলিয়া অশেষ সুখ্যাতি করেন। যে ইংরাজজাতি আজ বাণিজ্য বলে জগতে অগ্রগণ্য, সে জাতি অন্যান্য জাতির নিকট দোকানদারের জাতি (a nation of shop-keepers) বলিয়া প্রখ্যাত। সেইরূপ আমরাও চিরদিন দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে রত বলিয়া অন্যান্য জাতির নিকট দার্শনিক জাতি (a nation of philosophers) বলিয়া প্রখ্যাত। যথার্থ বলিতে কি, আমাদের এত অধিক

আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলন হইতে উপজাত এবং দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াই আমরা ধর্ম্মপথে ও আধ্যাত্মিক পথে এত অগ্রসর।

পুরাকালে জ্ঞানজগতে দর্শনশাস্ত্রেরই সম্যক সমাদর হয়। তৎকালে সুধীবর্গের মানসিক শক্তি এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যার অনুশীলনে ব্যয়িত হয় এবং তাঁহারা ইহাতেই অপার আনন্দ উপভোগ করেন। তৎকালে তাঁহারা ইহারই সম্যক অনুশীলন করিয়া আপনাদের আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানশক্তির স্ফূর্ত্তি করিতে চেষ্টা পান। ইহা জ্ঞানজগতের একটী জ্বলন্ত সত্য, যুগধর্ম্মানুসারে প্রাকৃতিক কারণে মানববুদ্ধির যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, বিদ্যানুশীলনেরও প্রায় তদনুরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। তোমার নিকট দর্শনশাস্ত্র এখন জটিল ও দুর্বোধ্য, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র সহজ ও সুগম। এখন তুমি পুরাণকাহিনী ভাল বাস না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তুমি ইতিহাসের সম্যক আদর কর।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা মানববুদ্ধি ক্রমশঃ প্রখর হয় এবং এই প্রকারে ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দিতে জগৎ-বিখ্যাত পণ্ডিত বেকন সাহেব আরিষ্টটলের মতানুযায়ী জ্ঞানানুশীলনের নূতনমার্গ প্রদর্শন করেন। তদবধি পাশ্চাত্যজগতে পুরাতন মার্গানুসৃত দর্শনশাস্ত্রের পূর্ব্ব গৌরব খর্ব্ব হইয়া যায় এবং নববিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়। তিন শত বৎসরের মধ্যেই নববিজ্ঞান অতিক্রতপদে উন্নতিপথে কিরূপ অগ্রসর এবং উহার অসাধারণ উন্নতিতে সমগ্র জগৎ আজ কিরূপ বিমুগ্ধ, তাহা সকলেই জানেন। সুবিশাল জ্ঞানবৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা লইয়া আজ নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র রচিত এবং উহাদের উন্নতিও আজ অলৌকিক। নববিজ্ঞানের কল্যাণে পাশ্চাত্যজগৎ আজ সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত এবং উহার যশসৌরভ আজ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত। নববিজ্ঞানের সাহায্যে পাশ্চাত্যজগৎ আজ সমগ্রজগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত এবং উহার ভয়ে সমগ্র জগৎ ভীত ও ত্রস্ত। নববিজ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞানজগতে আজ অসংখ্য অসংখ্য সত্য আবিষ্কৃত এবং মানবসমাজের সুখবর্দ্ধনের জন্য অসংখ্য অসংখ্য উদ্ভাবনা আজ পরিকল্পিত। নববিজ্ঞানের সাহায্যে

জঙ্গলাকীর্ণ পৃথিবী আজ রম্য নন্দনকাননে, শুষ্ক মরুভূমি আজ স্নিগ্ধ জলাশয়ে, কঠিন শৈল আজ সুকোমল শয্যায়, অনুজ্জ্বল অঙ্গার আজ সমুজ্জ্বল হীরকে পরিণত। নববিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির উপর আজ আমাদের অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব আধিপত্য বিস্তীর্ণ। বাষ্পীয়পোত, বাষ্পীয়রথ, তাড়িৎ বার্ত্তাবহ, তাড়িতালোক, টেলিফোন প্রভৃতি যে সকল উদ্ভাবনাবলে সভ্যজগতের সুখসম্ভার আজ সম্যক বর্দ্ধিত, তাহা কেবল বিজ্ঞানানুশীলনের একমাত্র ফল। বস্তুতঃ মানবসমাজের আধিভৌতিক উন্নতিসাধনে নব-বিজ্ঞান যুগান্তর আনয়নে সমর্থ। এখন জ্ঞানজগতে বিজ্ঞান কতকাল রাজত্ব করিবে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

এখন অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাউক। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, পরমার্থবিদ্যা, রাজগুহ্যযোগ, গুপ্তবিদ্যা (Isoteric Science), তত্ত্ববিদ্যা (Theosophy) সকলই একপ্রকার শাস্ত্র। এ শাস্ত্র সম্বন্ধে ম্যাডাম ব্ল্যাভিৎস্কি স্বরচিত পুস্তকাবলিতে কিঞ্চিৎ লিখিয়া যান। এ শাস্ত্র বহুকাল হইতে জনসাধারণের নিকট অবরুদ্ধদ্বার, এমন কি, ইহার অস্তিত্বের বিষয় কেহ অবগত নয়।

মহাত্মাগণের বিশ্বাস, অতিপ্রাচীনকালে বা সত্যযুগের প্রারম্ভে, যখন সুমেরুস্থ দেবভূমিতে স্থূলদেহবিশিষ্ট মানবের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্মরূপধারী দেবগণ বিচরণ করেন তখন তাঁহাদের ভিতর অধ্যাত্মবিজ্ঞান দৈববাণীযোগে সর্ব্ব-প্রথম প্রকটিত হয়। ইহাই প্রাথমিক শ্রুতি (Primeval revelation) বা বেদ; আধুনিক বেদ ও প্রত্যেক বৈশেষিক ধর্ম্মের ধর্ম্মগ্রন্থ ইহার নকলমাত্র। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়োবিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥

গীতা।

"আমিই পূর্ব্বে এই অবিনাশি যোগশাস্ত্র (অধ্যাত্মবিজ্ঞান) সূর্য্যদেবকে বলি, সূর্য্যদেব মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেন। এই প্রকারে রাজর্ষিগণ পরম্পরাগত অধ্যাত্মবিজ্ঞান অবগত হন। কিন্তু কালক্রমে সেই বিজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। তুমি আমার একান্ত ভক্ত, প্রিয় ও সখা এবং ইহাও অত্যুত্তম রহস্য; অতএব সেই পুরাতন যোগশাস্ত্র আজ আমি তোমায় বলিতেছি।"

যদি তুমি একথার গীতোক্ত প্রমাণ না মান, ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া এখন অসম্ভব। তোমার পূজ্যতম জড়বিজ্ঞান সবেমাত্র জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ব্রহ্মার সেই অমরপুত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সমক্ষে জড়বিজ্ঞান দুগ্ধপোষ্য বালক মাত্র; ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অস্তিত্বের বিষয় কি জানিবে? ইহার প্রত্নতত্ত্ব এখনও ঘোর তমসাচ্ছন্ন; কালক্রমে ইহার যতই উন্নতিসাধন হইবে, প্রাচীনকাল সম্বন্ধে ততই নূতন নূতন সত্য জগতে আবিষ্কৃত হইবে।

অনৈতিহাসিক সময়ে যে সকল জাতি জগতীতলে সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হয় এবং যাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়, সে সকল প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে স্পষ্ট বোধগম্য হয়, সকল ধর্ম্মের আদ্যস্তরটী প্রায় এক সমতলক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্রেই প্রায় একরূপ ভাবে ও মতামতে পূর্ণ। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন, সকলগুলিই সেই প্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে সংগৃহীত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে, মানবপ্রকৃতি একপ্রকার বলিয়া প্রাচীনকালের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ প্রায় একরূপ ভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহারা বলেন, যেমন অসভ্যাবস্থায় বর্ব্বরজাতিমাত্রেই প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে এবং জড়োপাসনায় রত হয়, সেইরূপ মানবপ্রকৃতি একপ্রকার বলিয়া সেই প্রাচীনকালেও অতিদূরবর্ত্তী দেশের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি প্রায় একরূপ মতামত প্রকাশ করে। ফলতঃ যখন ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ অত্যুচ্চ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ, তখন আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি, মানবপ্রকৃতি একরূপ বলিয়া উহারা অত্যুচ্চ ভাব প্রকাশ করে? অতএব এস্থলে অসম্পূর্ণ জড়বিজ্ঞানের কথায় কর্ণপাত করা আমাদের উচিত নয়।

যুগধর্ম্মানুসারে মানবদেহ যেরূপভাবে স্থূলত্বে পরিণত হইয়া বিভিন্ন

চর্ম্মাবৃত হয় এবং যেরূপভাবে তাঁহার তৃতীয় নয়ন ক্রমশঃ অপগত হইতে থাকে, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা সেই পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞানও মানবসমাজে গুপ্ত হইয়া যায়। এজন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

"স কালেন মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপ।"

"হে অর্জ্জুন! সেই যোগ বহুকালে নষ্ট হইয়া যায়।" মানবসমাজে ইহা ক্রমশঃ লুপ্ত হয় বটে; কিন্তু কোন কোন দেশে যোগেশ্বর মহাত্মাগণ এ শাস্ত্র চিরদিন অনুশীলন করেন, যেমন ভারতবর্ষ, তিব্বৎ প্রভৃতিদেশ এবং কোন কোন দেশে মন্দিরের গুপ্তদীক্ষায় এ শাস্ত্র দীক্ষিত হয়, যেমন গ্রীশদেশ। জনসাধারণ এ শাস্ত্রের বিষয় অবগত হইলে, যোগের অষ্টসিদ্ধিলাভের জন্য অতীব ব্যগ্র হয়। ইহাতে কলিকালে মানবসমাজের প্রভূত অনিষ্টোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা; এজন্য মহাত্মাগণ যুগধর্ম্মে বাধ্য হইয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান সাধারণ মানবমণ্ডলীর ভিতর গোপন করেন। তাঁহারা নিভৃতস্থলে বা গিরিগহ্বরে থাকিয়া এ স্বর্গীয় শাস্ত্র অনুশীলন করেন। অধ্যয়ন দ্বারা এ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ হয় না। সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত ও যোগাভ্যাস ব্যতীত, এ শাস্ত্রে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। যাঁহার আধ্যাত্মিকতা যেরূপ স্ফুরিত, অধ্যাত্মবিজ্ঞান তাঁহার সেইরূপ আয়ত্ত। এ শাস্ত্র আয়ত্ত করা কলিকলুষিত মানবের দুঃসাধ্য। কোন মহাত্মাকে এ পাপনয়নে দর্শন করি নাই বা কোন মহাত্মার সদুপদেশ এ পাপকর্ণে শ্রবণ করি নাই, কেমন করিয়া সেই স্বর্গীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিষয় অবগত হইব!

যে সকল যোগেশ্বর মহাত্মাগণ সময়ে সময়ে গুপ্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ জগতে প্রচার করেন, তন্মধ্যে বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ, জরথুস, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব, ঋষভদেব, যোগাচার্য্য, কপিলদেব, হারমিজ, মূষা, কনফুউসস্, বুদ্ধদেব, প্লেটো, ঈষা, মহম্মদ ও শঙ্করাচার্য্য বিখ্যাত। তাঁহারা জনসাধারণের নিকট এই স্বর্গীয়শাস্ত্রের অত্যল্প মাত্র প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা ইহার যৎসামান্য যাহা সাধারণভাবে প্রচার করেন এবং যেরূপ অলৌকিক যোগবল

করতঃ উহাকে জগতে প্রচার করেন। অতএব দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতাগণ কোন্ পূর্ব্বতনগ্রন্থপাঠে নিজ নিজ মতামতে সুবিশারদ হইয়া তাহা স্বপুস্তকে লিখিয়া যান, তাহাও নির্দ্দেশ করা যায় না।

পুরাকালে জনসাধারণের বুদ্ধিশক্তি যেরূপ স্ফুরিত হউক না কেন, দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতাগণ যে সমধিক প্রতিভাশালী, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থাবলি এখন এত দুর্বোধ্য, যে ভাষ্য ও টীকা ব্যতীত সে সকল আদৌ বোধগম্য হয় না। আরও দেখা যায়, যে শাস্ত্র যত প্রাচীন, সে শাস্ত্র তত দুর্বোধ্য ও দুরূহ। ঐরূপ হইবার প্রকৃত কারণ কি? ইহাতে কি বোধ হয় না, যে পুরাকালের মহোদয় পণ্ডিতবর্গ আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রতিভাশালী, অথবা যুগধর্ম্মে আমাদের আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পাওয়াতে আমরা এখন ততদূর আধ্যাত্মিকতা বুঝিয়া উঠিতে পারি না? যে কারণে হউক না কেন, তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থগুলি আমাদের নিকট এখন জটিল হইতে জটিলতর। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, এক বেদান্তের অর্থ শঙ্করাচার্য্যদেব কিরূপ করেন ও রামানুজস্বামীই বা কিরূপ করেন? পূর্ব্বতন গ্রন্থগুলির বিভিন্ন অর্থ ও প্রত্যর্থ হইয়াই ত এখন নানামুনির নানামত জগতে প্রচলিত।

দর্শনশাস্ত্রগুলি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যদি অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে আদিগুরু বলা যায়, দর্শনশাস্ত্রগুলি সেই মহামহিম, পূজ্যতম আদিগুরুর লোকপ্রখ্যাত শিষ্য মাত্র। ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, ক্যাল্ডিয়া, পারস্য, গ্রীশ প্রভৃতি যে সকল সভ্যজনপদবর্গে যে সকল দর্শনশাস্ত্র বিরচিত হইয়া লোকসমাজে প্রখ্যাত হয়, তত্তৎ দেশের দর্শনশাস্ত্র প্রণেতাগণ সেই প্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কিছু কিছু মহাসত্য প্রাপ্ত হইয়া স্বমত পোষণ করতঃ স্বদেশে তাহা প্রচার করেন। একথারও ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া এখন সুকঠিন। কত কত যোগী, মহাত্মা, পয়গম্বর ও মহর্ষি কত লোককে কত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য মৌখিক উপদেশ দিয়া যান, তাহা কেহ কি বলিতে পারেন?

অধ্যাত্মবিজ্ঞানই যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের মূল। সমগ্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, আজকাল গুপ্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অল্পাধিক আভাস পাওয়া যায়।

এ কলিযুগে অধ্যাত্মবিজ্ঞান কদাচ লোকপ্রখ্যাত হয় নাই। সেজন্য দর্শন-শাস্ত্রগুলিকে লোকপ্রখ্যাত করিবার জন্য তত্তৎ প্রণেতাগণ সাধ্যমত চেষ্টা পান এবং ভ্রমসংকুল মানববুদ্ধির সাহায্যে লিখিয়া সাধারণলোকের বোধগম্য করিতে চেষ্টা পান। মহাত্মাগণ বলেন, কলিযুগবন্ধনের সঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞান ক্রমশঃ গুপ্ত হইলে ইহার পরিবর্ত্তে দর্শনশাস্ত্রগুলি মানবসমাজে প্রচলিত হয়। ইহারাও মানবজীবনের কূটপ্রশ্ন মীমাংসা করিতে বিশেষ প্রয়াস পায় বটে, কিন্তু সে পথে ইহারা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, যে হেতুক মানববুদ্ধি চিরদিনই অসম্পূর্ণ।

প্লেটো, বুদ্ধদেব প্রভৃতি অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিৎ মহাত্মাগণ গুপ্তপরমার্থবিদ্যা সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই ; কিন্তু তাঁহারা সে বিষয় দুই একজন যোগ্য প্রিয়শিষ্যের নিকট প্রকাশ করেন। সেইরূপ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে অধ্যাত্মযোগ গোপনে প্রকাশ করেন। তাহারই কিয়দংশ গীতায় লিখিত হইয়া লোকপ্রখ্যাত হয়। সেইজন্যই চিরদিন হিন্দুসমাজে গীতার এত অধিক সমাদর। আর যদি তুমি মনে কর, কোন এক সুপণ্ডিত লোকদিগকে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় মুখবাণী হইতে ঐ সকল মহাসত্য নিঃসারিত করান এবং যদি তুমি গীতাকে "হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান" বলিয়া উড়াইয়া দেও, তুমি হিন্দুসমাজের একজন অকালকুষ্মাণ্ড।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র উভয়েই একপথের পথিক। উভয়েই মানবজীবনের কূটপ্রশ্ন মীমাংসায় রত। প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথমতঃ অধ্যাত্মবিজ্ঞান সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগের শাস্ত্র ও দেবাসুরদিগের শাস্ত্র, আর দর্শনশাস্ত্র কলিযুগের শাস্ত্র ও আধুনিক মানবের শাস্ত্র ; দ্বিতীয়তঃ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান যোগবলে সমাধিস্থ আত্মায় প্রতিভাত হয়, আর দর্শনশাস্ত্র ভ্রমসঙ্কুল মানববুদ্ধিযোগে অনুশীলিত হয়, এজন্য ইহা সময়ে সময়ে মহৎ ভ্রমেও পতিত। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভ্রম নাই, পরিবর্ত্তন নাই। সকল দেশের সকল সময়ের মহাত্মাগণ প্রায় একরূপ মতামত অবলম্বন করেন। প্রত্যেক যোগীর মনে আধ্যাত্মিকতা যেরূপ স্ফুরিত হয়, তিনি তদনুরূপ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মহাসত্য হৃদয়ঙ্গম করেন। যোগেশ্বর বুদ্ধদেবের মনে যে পরি-

মাগে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য প্রতিভাত হয়, পরম্পর যীশুখৃষ্টের অন্তঃকরণে বোধ হয় তদনুরূপ হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যদেবের মনে যেরূপ আধ্যাত্মিকতা স্ফুরিত হয়, রামমোহন রায়ের মনে বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই।

যাহা হউক, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সহিত দর্শনশাস্ত্রের কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ নাই, কোনরূপ বাক্‌বিতণ্ডা নাই; উভয়েই এক পথের পথিক। কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্র অসম্পূর্ণ এবং এক এক শাস্ত্র এক এক মত পোষণ ও প্রচার করে। চিরদিন দর্শনশাস্ত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে পরমারাধ্য পরমগুরু বলিয়া উহার পূজা করে।*

দর্শনের সহিত জড়বিজ্ঞানের বিরোধ।

যেরূপ পাশ্চাত্যবিদ্যার সার পাশ্চাত্যবিজ্ঞান, সেইরূপ প্রাচ্যবিদ্যার সার দর্শনশাস্ত্র। ইহাকে প্রাচ্যবিজ্ঞান বলা যায়। প্রসর, ক্রিয়া, বিষয় ও উদ্দেশ্য লইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবিজ্ঞানের ভিতর অনেক প্রভেদ।

প্রাচ্যবিজ্ঞান মূলানুসন্ধায়ী যুক্তিবলে (By Synthetic *a priori* Deductive method) তত্ত্বোদ্ভেদ করে। ইহা প্রথমে পদার্থের কতকগুলি মৌলিক গুণনির্দ্দেশ করিয়া উহার বাহ্যগুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়। মৌলিক গুণনির্দ্দেশে ইহা কোনরূপ প্রমাণ চায় না, বরং উহাদিগকে এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধান্ত করিয়া লয়। কিন্তু উহাদের সাহায্যে ইহা যাবতীয় পদার্থের বাহ্যগুণাগুণ বিচার ও সিদ্ধান্ত করে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-দিগের মতে বস্তুর মৌলিক গুণ, যাহা দর্শন স্বতঃসিদ্ধান্ত করিয়া লয়, তাহা অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে গৃহীত। তাহার সাক্ষ্য, বেদান্তের মায়াবাদ ও পর-ব্রহ্মের অস্তিত্ব, সাংখ্যদর্শনের বস্তুর মৌলিকগুণ এবং যোগের নিয়মাবলি অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে গৃহীত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ

* কেহ অধ্যাত্মবিজ্ঞান চক্ষে দর্শন করেন নাই বা করিবেন না। দর্শনশাস্ত্র অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের শিষ্য এ কথায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা থিয়সফির পুস্তক পাঠ করিলে উহার সত্য বুঝিতে পারিবেন।

বলেন, দর্শনপ্রতিপাদিত বস্তুর মৌলিক গুণাগুণ কেবল অনুমানসিদ্ধ। বস্তুতঃ এ কলিযুগে আমাদের আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ আমরা উহাদিগকে এখন অনুমানসিদ্ধ জ্ঞান করিয়া থাকি।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান কার্য্যানুসন্ধায়ী-যুক্তিবলে (By Analytic, *a posteriori*, Inductive method) তত্ত্বান্বেষণ করে। ইহা পর্য্যবেক্ষণাদিবলে পদার্থ বিশেষের বাহ্যগুণাগুণ সম্যক বিচার করিয়া, অথবা পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রদ্বারা পদার্থ বিশেষের বাহ্যগুণাগুণ সম্যক পরীক্ষা করিয়া, উহার আভ্যন্তরিণ মৌলিকধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পায়। দর্শন সকল বিষয়ের প্রাথমিক অন্তঃস্তর অনুমানবলে সিদ্ধান্ত করিয়া, অথবা অধ্যাত্মবিজ্ঞানলব্ধ সত্য দ্বারা মীমাংসা করিয়া, উহাদের বাহ্যস্তরগুলি প্রথমোক্তস্তর সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু বিজ্ঞান পদার্থ বিশেষের বাহ্যস্তরগুলি অতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া তল্লব্ধজ্ঞানে উহার অন্তঃস্তর ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পায়। দর্শনের গতি কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে (Centrifugal); আর বিজ্ঞানের গতি পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে (Centripetal)। দর্শন বস্তুর সাধারণ ধর্ম্ম হইতে বৈশেষিক ধর্ম্মের অনুসন্ধানে তৎপর; আর বিজ্ঞান বস্তুর বৈশেষিক ধর্ম্ম সম্যক আলোচনা করিয়া উহার সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে ব্যগ্র।

এ দেশের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ও আধুনিক উন্নত ইংরাজিচিকিৎসাবিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করিলে, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ ভালরূপ বুঝা যায়। প্রাচ্য আয়ুর্ব্বেদের মূলভিত্তি দর্শনপ্রতিপাদিত, অনুমানসিদ্ধ বাতপিত্ত কফের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে প্রত্যেক পীড়া বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শবব্যবচ্ছেদলব্ধ চাক্ষুস পরীক্ষিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার প্রত্যেক গ্রন্থে পীড়াগুলি শরীরের যন্ত্রানুসারে বিভক্ত। সত্য বটে, কবিরাজগণ মনে করেন, বাত পিত্ত কফ এই মতটী প্রাচীনকালের আর্য্যঋষিদিগের যোগসিদ্ধ বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে সংগৃহীত; কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, ইহা কেবল অনুমানসিদ্ধ। তাঁহারা ভাবেন, মুখ ও মলদ্বার হইতে বাত, পিত্ত ও কফ নিঃসৃত হয়, অতএব

বাত পিত্ত কফই শরীরের প্রধান রস এবং উহাদের বিকৃতিতে শরীরের বিকৃতি ও উহাদের সাম্যাবস্থায় শরীরের স্বাস্থ্যভোগ। তাঁহারা আরও ভাবেন, যেমন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সত্ত্বরজস্তম প্রকৃতির ত্রিগুণ, সেইরূপ ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বাত পিত্ত কফ শারীরিক প্রকৃতির ত্রিগুণ।

এখন বাত পিত্ত কফ এই মতটী সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, অনুমানসিদ্ধ হউক বা যোগসিদ্ধ হউক, এই বাত পিত্ত কফ লইয়াই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সমস্ত পীড়ার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যচিকিৎসাবিজ্ঞান প্রত্যেক রোগের প্রত্যেক লক্ষণটী শরীরস্থ যন্ত্রের বিকৃতির সহিত দেখিতে চেষ্টা পায় এবং কোন্ রোগে যন্ত্রের কিরূপ বিকার উপস্থিত হয়, তাহারই ভালরূপ অনুসন্ধান করে। আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান উভয়েই প্রত্যেক রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করে ও নানারোগ আরোগ্য বা উপশম করে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শারীরিক প্রকৃতির আদ্যস্তর বাত পিত্ত কফ সিদ্ধান্ত করিয়া উহাদের যোগে রোগের বাহ্য লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করে; আর পাশ্চাত্যবিজ্ঞান রোগের লক্ষণ, উপশম ও যন্ত্রের বিকারাদি সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের আদি কারণ আবিষ্কার করিতে বা উহাদের সাধারণ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পায়। আয়ুর্ব্বেদের গতি কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে বা সাধারণ ধর্ম্ম হইতে বৈশেষিক ধর্ম্মের দিকে, আর পাশ্চাত্যচিকিৎসাবিজ্ঞানের গতি পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে বা বৈশেষিক ধর্ম্ম হইতে সাধারণ ধর্ম্মের দিকে। প্রথমের ভিত্তি প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্র, আর অপরের ভিত্তি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্র।

বিষয় ও উদ্দেশ্য লইয়া দর্শন ও বিজ্ঞানের বিস্তর পার্থক্য আছে। দর্শন অধ্যাত্মজগৎ ও মনোজগতের তত্ত্বান্বেষণে যেমন অধিক রত, বাহ্য-জগতের সত্যানুসন্ধানে সেইরূপ অল্প রত; আর বিজ্ঞান বাহ্যজগতের সত্যান্বেষণে যেমন অধিক অনুরক্ত, মনোজগতের তত্ত্বান্বেষণে সেইরূপ অল্প অনুরক্ত। দর্শন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুবিমল জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া মনোজগতের ক্রিয়া সম্যক ব্যাখ্যা করে; আর বিজ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে বাহ্যজগতের সুবিমল জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া মনোজগতের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পায়। দর্শনের মতে স্থূলজড় সূক্ষ্মবুদ্ধির চরম পরিণাম বা

বিকার ; ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সূক্ষ্মপদার্থের ক্রমবিবর্ত্তনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্থূল বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্ট। কিন্তু বিজ্ঞানের মতে কেবলমাত্র জড় ও শক্তির সংযোগে ও বিয়োগে এ জগৎ সৃষ্ট ; ইহার মতে সূক্ষ্মবুদ্ধি স্থূলজড়ের চরম পরিণাম, স্থূলজড় ভৌতিক নিয়মানুসারে ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া উৎকৃষ্ট জীবদিগের সূক্ষ্মবুদ্ধি উৎপাদন করে। দর্শনের মতে মানববুদ্ধি বৈশেষিক ও স্বর্গীয়, পশুবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিজ্ঞানের মতে মানববুদ্ধি ও পশুবুদ্ধিতে পরিমাণগত বিস্তর প্রভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ কোন প্রকারগত প্রভেদ নাই : কেবল মানবের মস্তিষ্ক অধিক স্ফুরিত হওয়ায় তাঁহার বুদ্ধি শক্তি এত অধিক স্ফুরিত। দর্শনের মতে মানবজাতি ব্যতীত উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবিশিষ্ট বিভিন্ন অবস্থাপন্ন জীব অন্য অদৃশ্য জগতে বিদ্যমান ; কিন্তু বিজ্ঞানের মতে উহা একপ্রকার অসম্ভব কথা।

দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি ; কি প্রকারে তাঁহার আত্মার প্রকৃত উন্নতিসাধন হয় ; কি প্রকারে তিনি এ জগতের দ্বন্দ্বজ ক্ষণস্থায়ি আধিভৌতিক সুখ দুঃখ উপেক্ষা করতঃ প্রকৃত আধ্যাত্মিক সুখে সুখী হন। ইহার মতে মানবের চরম উন্নতি, কি প্রকারে তিনি যোগবলে অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন ; কি প্রকারে তাঁহার আত্মায় অষ্টসিদ্ধি স্ফুরিত হইয়া তিনি যোগবলে বলীয়ান হন ; কি প্রকারে ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইয়া তিনি দেবত্বে পরিণত হন।

বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য মানবের আধিভৌতিক উন্নতি ; কি প্রকারে তিনি এ জগতে অশেষ ভৌতিক সুখে সুখী হন ; কি প্রকারে তিনি নিজ বুদ্ধি বলে প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করতঃ আপন ইন্দ্রিয় সুখসম্ভার বৃদ্ধি করেন। ইহার নিকট এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমাণ জগৎই সর্ব্বস্ব এবং এই স্থূলজগতের উপর আধিপত্য বিস্তারই ইহার চরম উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান কেবল মানবের বুদ্ধিশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বুদ্ধি বলে তাঁহাকে দেবত্বে পরিণত করিতে চাহে। ইহার মতে ধর্ম্ম মানব-মনের দুর্ব্বলতামাত্র।

বিজ্ঞানের মতে এ জগতের এক অজ্ঞেয় কারণ থাকিলেও থাকিতে পারে ; কিন্তু ইহা লোকপ্রখ্যাত বা লৌকিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না।

ইহার মতে আত্মারও অস্তিত্ব নাই, পরলোকেরও অস্তিত্ব নাই এবং মানবের যথাসর্ব্বস্ব মানবমন কেবল মানবমস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন বা উহার ক্রিয়া মাত্র। পঞ্চেন্দ্রিয়যোগে বাহ্যবস্তুর যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই ইহার মতে একমাত্র প্রমাণসিদ্ধ এবং তাহাই একমাত্র বিশ্বসনীয়। ইহার মতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কল্পনা মাত্র। ইহা অনুমানসিদ্ধ প্রমাণকে একেবারে অগ্রাহ্য করে এবং যাহা চাক্ষুস প্রমাণ, তাহাই সাদরে গ্রহণ করে।

এইরূপ নানাবিষয় লইয়া দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। এ বিবাদ মিটিয়া যাইবে কি না, বা কত দিনে মিটিবে, তাহা এখন বলা যায় না।

বিজ্ঞানকর্তৃক দর্শনের দোষোদ্ঘাটন।

আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞানের মতে দর্শনশাস্ত্র অসার, শূন্যগর্ভ ও কাল্পনিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ; এ শাস্ত্রের আলোচনায় সমাজের তাদৃশ কোন বিশেষ উপকার নাই এবং এই অপদার্থ ও অলীক শাস্ত্র অনুশীলন করিয়াই এতকাল সুধীবর্গ কেবল বিপথে চালিত হন। আজ কাল অনেকেই বলেন, যে দিন হইতে বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতে পদার্পণ করে, সেই দিন হইতেই মানবসমাজ প্রকৃত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় এবং তৎপূর্ব্বে উহা ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, পাশ্চাত্য জগৎ বিজ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথে কিরূপ দ্রুতপদে অগ্রসর, আর প্রাচ্যজগৎ দর্শনশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া কিরূপ রক্ষণশীল বা কিরূপ অবনত? অতএব দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা বিজ্ঞান যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ফলতঃ জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির দিকে ধাবমান বলিয়াই আজকাল জ্ঞানের এত উন্নতি ও বিজ্ঞানের এত প্রাদুর্ভাব।

বিজ্ঞানের মতে একজন দর্শনশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত অপেক্ষা একজন অধমাধম জুতানির্ম্মাতাও সমাজের অধিক উপকারক। দর্শনশাস্ত্র অনুশীলন

করিয়া একজন পণ্ডিত সমাজের যে কি উপকার সাধন করেন, তাহা বুঝা যায় না ; কিন্তু একজন জুতা-নির্ম্মাতা জুতা প্রস্তুত করিয়া লোকের পদযুগল কণ্টকাদি হইতে রক্ষা করে; অতএব সে ব্যক্তি সমাজের মহোপকারক। আর নিভৃতে একজন দার্শনিক পণ্ডিত জটিল দুর্বোধ্য দর্শনশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া কতকগুলি মানবকপোলকল্পিত জ্ঞানে বিভোর হন ও কাল্পনিক আনন্দে উন্মত্ত হন ; আর সেই সঙ্গে তিনি সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হন ; অতএব তিনি সংসারের একজন অপোগণ্ড মাত্র। যে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া লোকে সংসার ত্যাগ করিতে ও বিজয় পান করিতে শিক্ষা করে, সেই বেদান্তের আবার সুখ্যাতি করা উচিত ? সমাজ আর কিরূপে অধঃপাতে যায়, বল ?

বিজ্ঞানের মতে দার্শনিক জ্ঞান মাত্রেই কাল্পনিক ও ভ্রমসঙ্কুল, আর বাগড়ম্বরে ও বাক্যালঙ্কারে পূর্ণ ; দর্শনের ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও পরিদর্শন নাই এবং পরীক্ষাযন্ত্র ত আদৌ নাই; আছে মাত্র কেবল স্বকপোলকল্পনা ও অনুমান। উহাদের সাহায্যে দার্শনিক পণ্ডিত একটি অপরূপ জ্ঞানব্যূহ রচনা করেন এবং তাহাতেই আপনাকে জড়ীভূত করিয়া ফেলেন।

বিজ্ঞানের মতে দর্শনশাস্ত্র মূলে ভ্রান্ত ; ইহার মৌলিক বিশ্বাসগুলি সর্ব্বৈব অনুমানসিদ্ধ; সেজন্য ইহা আদ্যোপান্ত ভ্রমেই পরিপূর্ণ। দেখ, যে অট্টালিকার বনিয়াদ মন্দ, সে অট্টালিকা মন্দ এবং ইহা কদাচ বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। সেইরূপ দর্শনের বনিয়াদ মন্দ, ইহা কতকগুলি অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ; অতএব ইহা কি প্রকারে বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে ? দর্শন বস্তুর যে সকল মৌলিক গুণ নির্দ্দেশ করে বা প্রকৃতির আদ্যন্তর যেরূপভাবে বর্ণন করে, বিজ্ঞান তাহা কস্মিনকালে গ্রাহ্য করিতে পারে না এবং এক তুড়িতে তাহা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পায়। সেজন্য বিজ্ঞান দর্শনপ্রতিপাদিত ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, অতীন্দ্রিয়জ্ঞান প্রভৃতি কিছুই মানে না।

বিজ্ঞান সদর্পে ও সাহঙ্কারে দর্শনের উপর উপহাস করিয়া বলে, "রে ভ্রান্তদর্শন! ত্রিংশ শতাব্দি ব্যাপিয়া তুমি যে মানবমনকে চালাইয়া আসিলে,

তাহাতে তুমি মানবসমাজের কি কি মঙ্গলসাধন করিয়াছ, বল? এতকাল মানবসমাজ কেবল তোমার অনুশীলন করিয়া বিপথে চালিত হয় এবং ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু দেখ, অল্পদিন মাত্র হইতে চলিল, আমি পাশ্চাত্যসভ্যজগৎ চালিত করিতেছি; ইতিমধ্যেই সর্ব্বত্র আমার বাহবা পড়িয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বত্র আমার জয়জয়কার হইতেছে। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, আমার সৃষ্ট বাষ্পীয়রথ, বাষ্পীয়পোত, তাড়িৎবার্ত্তাবহ দ্বারা মানব-সমাজের যে কত মহোপকার সাধিত তাহার কি কিছুমাত্র ইয়ত্তা আছে? ভবিষ্যতে আমি নূতন নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনাবলে মানবসমাজের সুখসমৃদ্ধি আরও যে কি পরিমাণে বর্দ্ধন করিব, তাহারও কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই। রে নির্বোধ দর্শন! এতদিন মানব কেবল তোমার কুহকে পতিত হইয়া নিজ শ্রেয় বুঝিতে পারেন নাই এবং তুমিই তাঁহাকে প্রকৃত সভ্যতা-সোপানে আরোহন করিতে দেও নাই। আজকাল সভ্যজগতের লোকেরা তোমার গুণাগুণ ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছে, তজ্জন্য তাহারা আর তোমার কুহকজালে পতিত হয় না। তোমার অপদার্থতা ও অসারত্ব দর্শন করিয়াই ত তাহারা আজকাল তোমার এত অনাদর করে। বস্তুতঃ তোমাতে অনুমাত্র সারবত্তা নাই, তুমি সর্ব্বথা অনাদরেরই পাত্র।”

আজকাল সভ্যজগতে জড়বিজ্ঞানেরই প্রাদুর্ভাব ও সমাদর; অতএব বিজ্ঞান দর্শনসম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করে, জনসাধারণ তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লয়। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতজ্ঞানী, তাঁহারা কদাচ দর্শনের অনাদর করেন না। তাঁহারা ভালরূপ জানেন, যে দর্শন মানবকে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর করায়, যে দর্শন জগতের আদ্যন্তর সম্যক ব্যাখ্যান করে. সেই দর্শন কি কদাচিৎ অনাদরের পাত্র হইতে পারে? আর যাঁহারা জগতের বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ ও ক্ষণভঙ্গুর আধিভৌতিক উন্নতির জন্য ব্যগ্র, তাঁহারাই বিজ্ঞানের সমাদর ও দর্শনের অনাদর করেন।

"তত্ত্ববিদ্যাকর্ত্তৃক জড়বিজ্ঞানের দোষোদ্ঘাটন।"

জড়বিজ্ঞানের এত আস্ফালন, এত বাহ্বাস্ফোট সত্ত্বেও আজ আবার আমাদের কর্ণকুহরে কি অপরূপ কথা শ্রুত হয়! তত্ত্ববিদ্যা (Theosophy) জড়বিজ্ঞানসম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করে, তাহাও সকলের শ্রবণীয়। এস্থলে তাহারই ঈষৎ আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

জড়বিজ্ঞান যাবতীয় স্থূলপদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যস্তরের গুণাগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও সুশৃঙ্খলতার সহিত নির্দ্দেশ করে, প্রকৃষ্টপদ্ধতিতে উহাদের শ্রেণীবিভাগ করে এবং উহাদের উপর যে সকল জড়শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া অনুক্ষণ প্রকটিত, তাহাদের ভৌতিকনিয়মাবলি সোৎসাহে ব্যাখ্যান করে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিজ্ঞান স্থূলপদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যস্তরটী অনুশীলন করে মাত্র এবং উহার আভ্যন্তরিণ সূক্ষ্মস্তর একেবারে অস্বীকার করে। ইহার মতে সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব আদৌ নাই; যাহা কিছু আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়যোগে অনুভব করি, তাহারই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে; তদ্ভিন্ন সকলই ইহার মতে বিরাট শূন্যময়। এই সূক্ষ্মপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে না বলিয়া বিজ্ঞান জড়পদার্থের আভ্যন্তরবর্ণনকালে মহৎ গোলযোগে পতিত; তৎকালে বালকদিগের কাণামাছি খেলার ন্যায় ইহা নিমীলিতাক্ষ হইয়া অন্ধকারে হস্তপ্রসারণ করিতে থাকে মাত্র এবং পদার্থের বাস্তবরূপটী ধরিতে একেবারে অসমর্থ হয়। বিজ্ঞান বুঝিতে পারে না, জড়পদার্থের যে স্তরটী পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নয়, তাহা অতীব সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসাপেক্ষ। এই অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মপদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করাতে বিজ্ঞান জগতের কোন বস্তুর প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না এবং সকল সময়ে পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলস্তর পর্য্যালোচনা করায় বিজ্ঞান আজকাল সম্পূর্ণ জড়বাদী। জড়বাদীর মতে জগতে কেবল জড় ও জড়শক্তি বিদ্যমান এবং তদ্ভিন্ন কিছুই নাই। দেখ, বিজ্ঞান আকাশ বা ইথরের (Ether) অস্তিত্ব মানিয়া লয়; কিন্তু ইহা যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় ও অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মপদার্থ, তাহা বিজ্ঞান বুঝিতে অক্ষম। বিজ্ঞানের জড়বাদিত্বই অনেক

অনর্থের মূল। ইহারই জন্য, বিজ্ঞান আজ দর্শন ও ধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত এবং কালক্রমে ইহাতে মানবসমাজের প্রভূত অনিষ্টোৎপত্তি হইবে।

এ জগতের নিয়ম এই যে, যাহা একদিকে অন্ধকারাবৃত, তাহাই আবার অপরদিকে আলোকে উদ্ভাসিত এবং যাহা একদিকে স্থূল, তাহাই আবার অপরদিকে সূক্ষ্ম। সেজন্য বলা উচিত, এই স্থূলজগতের মূলে সূক্ষ্ম বা অধ্যাত্মজগৎ বর্ত্তমান এবং স্থূলপদার্থ মাত্রেই সূক্ষ্মপদার্থের সহিত অপরিহার্য্যরূপে জড়িত। মনে কর, একটী জলমগ্ন শৈল সমুদ্র হইতে উত্থিত। এস্থলে ইহার নিম্নভাগ সমুদ্রজলে নিমগ্ন এবং উপরিভাগটী দৃষ্টিগোচর মাত্র। এখন ইহার ঊর্দ্ধভাগটী আমাদের নয়নগোচর হয় বলিয়া আমরা কি ইহার জলনিমগ্ন অংশের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি? সেইরূপ স্থূলজগতের যে অংশটুকু আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, আমরা কি কেবল সেই অংশটুকুর অস্তিত্ব স্বীকার করিব, আর উহার মূলে যে সূক্ষ্ম, শ্রেষ্ঠ অংশ বিদ্যমান, তাহার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার কবিব না? সেই সূক্ষ্ম অংশটুকু এখন আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং কবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে, তাহাও আমরা জানি না। সত্যবটে, সেই সূক্ষ্ম অংশটুকু একমাত্র অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসাপেক্ষ এবং মহাত্মাগণের দিব্য চক্ষে প্রতিভাত হয়, তথাচ আমরা কলিযুগের মানব হইলেও সেই সূক্ষ্ম অংশের অস্তিত্ব এখন আমরা অনুমানবলে স্বীকার করিয়া লই। কিন্তু জড়বাদী প্রত্যক্ষদর্শীবিজ্ঞান সেই সূক্ষ্ম অংশের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না এবং উহাকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেয়। যখন পুরাকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও দর্শন এ বিষয়টী স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে এবং আমরাও এখন অনুমানবলে উহা বুঝিতে পারি, তখন ভ্রমসঙ্কুলমানববিরচিত জড়বিজ্ঞানের একমাত্র কথা গ্রাহ্য করা আমাদের কদাচ উচিত নহে।

এস্থলে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মপদার্থ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলপদার্থের যথার্থ প্রভেদ কি, তাহা নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। সকলেই জানেন, ইন্দ্রিয়গণ মনের দ্বারস্বরূপ। এ সংসারে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়যোগে বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ করি। তন্মধ্যে যে বস্তু এখন ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ীভূত, তাহাই আমাদের নিকট স্থূল, আর যে বস্তু বা বস্তুর যে স্তরটুকু এখন উহাদের অবিষয়ীভূত, তাহাই আমাদের নিকট সূক্ষ্ম। এ মন্বন্তরে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়যোগে বাহ্যজগতের সহিত

সম্বন্ধ; সেজন্য এখন যে বস্তু বা বস্তুর যে স্তর আমাদের নিকট সূক্ষ্ম, হয়ত পর মন্বন্তরে তাহা স্থূল হইবে। যে আকাশের গুণাগুণ আমরা এখন আদৌ জানি না এবং যাহা আমাদের নিকট বিরাট শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, পর মন্বন্তরে যখন মানবের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্ফুরিত হইবে, তখন আকাশ তাঁহার নিকট বায়ুর ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া স্থূল হইবে। স্থূলসূক্ষ্মের প্রভেদ চিরদিন এইরূপে বিচার করা যায়।

আরও দেখ, অম্লজন (Oxygen) ও উদজন (Hydrogen) দ্বারা বিনির্ম্মিত উদক অন্তর্নিহিত উত্তাপের তারতম্যানুসারে বাষ্প, জল ও বরফ এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে বাষ্প সূক্ষ্ম, জল স্থূল ও বরফ স্থূলতম। এস্থলে সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ অন্তরূপ; কারণ বাষ্পরূপ জলের অবস্থাটী আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেজন্য উহা সূক্ষ্ম নয়; কিন্তু উহা প্রকৃত স্থূল। উপরে যে সূক্ষ্ম পদার্থের কথা উল্লিখিত হইল, তাহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত। এ মন্বন্তরে আমরা সে পদার্থের গুণাগুণ আদৌ বিচার করিতে পারি না।

সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থের মধ্যে এক অনতিক্রম্য গণ্ডী ব্যবহিত। এ গণ্ডী পার হইবার ক্ষমতা সাধারণ মানবের নাই। যেমন পরলোক ও ইহলোকের মধ্যে এক অনতিক্রম্য গণ্ডী ব্যবহিত, স্থূলসূক্ষ্মের সম্বন্ধ ঠিক তদনুরূপ। এ দেহ ধারণ করিয়া কেহ পরলোকের বিষয় অবগত হইতে পারেন না। সেইরূপ এ সংসারেও কেহ সূক্ষ্মপদার্থ নয়নগোচর করেন না। চর্ম্মচক্ষুর কথা ছাড়িয়া দেও, সূক্ষ্মদর্শী অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা তুমি স্থূলপদার্থকে সহস্রবার দেখ, তুমি উহার কেবল স্থূলরূপটী দেখিতে পাও; কিন্তু উহার মূলে যে সূক্ষ্মরূপ বিদ্যমান, তাহা তুমি আদৌ দেখিতে পাও না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তি সহস্রগুণ বর্দ্ধিত কর অথবা উহা অপেক্ষা আরও সূক্ষ্মদর্শী যন্ত্র উদ্ভাবন কর, তুমি অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পদার্থ সম্বন্ধে চিরদিন 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' থাক। একজন রাসায়নিক পণ্ডিত পরীক্ষাগারে জড়পদার্থের গুণাগুণ পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়া বহুদূর অগ্রসর হন; কিন্তু যখন তিনি অনতিক্রম্য গণ্ডীর সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন তিনি চলৎশক্তি রহিত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি কূপস্থ ভেকের ন্যায় সামান্য কূপকে পৃথিবী জ্ঞান করেন এবং বস্তুর অনতিক্রম্য গণ্ডীর বহির্ভাগে যে কিছু বর্ত্তমান আছে, তাহা তিনি আদৌ

বুঝিতে পারেন না। তিনি নিজের বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ মনে করেন, আমি বস্তুর আদ্যন্তর প্রাপ্ত হইলাম। যথার্থ বলিতে কি, জড়বিজ্ঞান বস্তুর গুণ নির্দ্দেশে এতদূর আসিয়া হতবল হয়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান সেই অনতিক্রম্য গণ্ডী ভেদ করিয়া বস্তুর সূক্ষ্ম স্তর অন্বেষণ করিতে করিতে আরও অগ্রসর হয়। যে মহাত্মা যোগবলে স্বীয় আত্মায় অতীন্দ্রিয় জ্ঞান প্রস্ফুরিত করিতে সমর্থ হন, তিনিই ইহসংসার হইতে সূক্ষ্ম জগতের বিষয় কথঞ্চিৎ অবগত হন। আমরা এই কলিযুগের অধমাধম মানব; আমাদের জীবাত্মা এখন সর্ব্বতোভাবে স্থূলে জড়িত এবং সম্পূর্ণরূপে জড়ত্বে পরিপূর্ণ; আমাদের মনে কিরূপে অতীন্দ্রিয়জ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে? আমরা এখন কেবল অনুমান করিয়া লই, যে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকল বস্তুর মূলে বর্ত্তমান।

দেখ, এই স্থূলদেহের মূলে সূক্ষ্ম মন কিরূপ বিরাজমান? এই মনের অস্তিত্ববশতই দেহ অনন্তচিন্তায় চিন্তিত ও অনন্ত চেষ্টায় চেষ্টান্বিত। ইহার শুক্ররেণুর ক্ষমতাও অপরূপ, যাহার বলে পিতামাতার মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতি পুত্রে সম্যক প্রতিফলিত হয়। এস্থলে স্থূলসূক্ষ্মের যোগাযোগ অত্যাশ্চর্য্য। সেইরূপ পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থে স্থূলসূক্ষ্মের অত্যদ্ভুত যোগাযোগ বিদ্যমান। ভ্রান্তবিজ্ঞান এ কথা বুঝিতে পারে না বলিয়া আমরা যে উহারই কথা একমাত্র শিরোধার্য্য করিব, তাহা কদাচ হইতে পারে না।

হিন্দুশাস্ত্রমতে স্থূলজগৎ সূক্ষ্মজগতের পরিণতি বা বিকৃতি। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মজগতই ক্রমবিবর্ত্তনে প্রপঞ্চীকৃত হইয়াও আকারবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলজগতে পরিণত। তত্ত্ববিদ্যাও হিন্দুশাস্ত্রের এই উন্নতমতের সম্পূর্ণ পোষকতা করে। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি, পরিণতি বা বিকার, ইহা হিন্দুধর্ম্মের একটী জলন্ত সত্য। এ মহাসত্য যাবচ্চন্দ্রদিবাকর কদাচ মিথ্যা হইবার নয়। জলবুদ্বুদগণ জলে উত্থিত এবং জলেই লয়প্রাপ্ত। জড়বিজ্ঞানের মতামতও সেইরূপ কালে সমুত্থিত হয় এবং কালেই লয়প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানজগতে আজ এক নূতন মত প্রচারিত হয়, দশদিন পরে উহা আবার খণ্ডিত হয়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মত কস্মিনকালে খণ্ডিত হইবার নয়। ইহার প্রিয়পুত্র, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সত্যও কস্মিনকালে লয় পাইবার নয়।

লোকের বুদ্ধিশক্তি যখন যেরূপ বিকাসিত ইহার মহাসত্য গুলি তাহারা সেই-রূপ বুঝিতে সক্ষম।

আধুনিক তথা-কথিত উন্নত জড়বিজ্ঞান জড় ও শক্তি লইয়া বিশ্বরচনা প্রতিপাদন করে। এখন যদি বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করা যায়, যে সকল ভৌতিক পদার্থের সংযোজনে ও বিয়োজনে এ জগৎ সৃষ্ট ও নির্ম্মিত, সেই সকল ভৌতিক পদার্থ (*Elements.*) কোথা হইতে আইসে? এ কথার বিজ্ঞানের একমাত্র উত্তর এই যে, এ সকল ভৌতিক পদার্থ অনাদি; যেমন ইহাদের মৃত্যু নাই, ইহারা অবিনশ্বর; সেইরূপ ইহারা অনাদি কাল হইতে প্রচলিত; যদি বিজ্ঞানকে আরও পীড়াপীড়ি করা যায়, ইহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? তখন বিজ্ঞানের একমাত্র উত্তর, সে কথা জানিবার কাহারও আবশ্যকতা নাই; ইহারা অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, এই পর্য্যন্ত জানাই সকলের পক্ষে যথেষ্ট।

পরমাণুবাদের অবতারণা করিয়া বিজ্ঞান জড়পদার্থের আদ্যন্তর ব্যাখ্যান করিয়া থাকে। ইহার মতে যে সকল ভৌতিকপদার্থের সংযোগে ও বিয়োগে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ নির্ম্মিত, উহাদের পরমাণুপুঞ্জ জড়শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া কোথাও সংযোজিত, কোথাও বা বিয়োজিত, কোথাও সংঘটিত, কোথাও বা বিঘটিত। পরমাণুরাশিই জড়বস্তুর আদ্যন্তর। কিন্তু পরমাণুগুলি আজ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আয়ত্তে আইসে নাই; উহারা এখনও অতি তীক্ষ্ণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দৃষ্ট হয় নাই। বস্তুতঃ পরমাণু আছে কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়। অনেকে মনে করেন, এই মতটী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের সর্ব্বৈব অনুমানসিদ্ধ। যে বিজ্ঞান দর্শনের মতামতকে অনুমানসিদ্ধ বলিয়া উহার উপর উপহাস করে, সেই বিজ্ঞান জড়বস্তুর আদ্যন্তর বর্ণনে নিজে অনুমানের সাহায্য লয়। যে স্থলে অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও দর্শন স্থূলপদার্থের মূলে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া স্থূলপদার্থের আদ্যন্তর সম্যক ব্যাখ্যান করে, সে স্থলে আধুনিক জড়বাদী জড়-বিজ্ঞান জড়পদার্থের মূলদেশ পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা অধিকৃত স্বীকার করিয়া জড়পদার্থের আদ্যন্তর ব্যাখ্যান করিতে প্রয়াস পায়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যেমন

কোন সুগন্ধদ্রব্যের অনুগুলি আকাশে মিলিত হইয়া বায়ুর তরঙ্গ যোগে নাশাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও তথায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুসংঘর্ষে মস্তিষ্কে ঘ্রাণোৎপাদন করে এবং সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুগুলি যদিও কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আয়ত্বে আইসে নাই, তথাচ উহাদের অস্তিত্ব আমরা ঘ্রাণেন্দ্রিয়যোগে সম্যক অনুভব করি; সেইরূপ যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু রাশি সম্পূর্ণরূপে আমাদের অদৃশ্য হইলেও উহাদের একত্র সমাবেশও সমবায় দ্বারা জগতের যাবতীয় পদার্থ নির্ম্মিত ও বিরচিত। যে সকল জড়শক্তি দ্বারা জড়জগৎ চালিত, সেই সকল জড়শক্তি ঐ সকল ভৌতিক পদার্থের পরমাণুরাশির উপর নিজ নিজ প্রতাপ ও ক্রিয়া অনুক্ষণ প্রকটিত করে।

পরমাণুবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, জড়বস্তুর আদ্যন্তর বর্ণনে বিজ্ঞানের সকল দর্প চূর্ণ। পরমাণুবাদের সাহায্য লইয়াও জড়বাদী বিজ্ঞান জড়জগতের আদ্যন্তর-সম্বন্ধে যথার্থ মত প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির মনে এই মত পাঠে কদাচ তৃপ্তি বোধ হয় না। যোগী ও মহাত্মাগণ এ কথা শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করেন না। আরও দেখা যায়, এক বিজ্ঞানশাস্ত্র পরমাণুগুলির গুণ আবশ্যকমত একরূপ নির্দ্দেশ করে এবং অন্য বিজ্ঞানশাস্ত্র নিজের আবশ্যকতানুযায়ী উহাদের গুণ অন্যরূপ নির্দ্দেশ করে। কেহ বলেন, উহারা অবিভাজ্য; কেহ বা বলেন, উহারা অবিভাজ্য ও স্থিতিস্থাপক; যে বস্তু অবিভাজ্য, সে বস্তু কদাচ স্থিতিস্থাপক হইতে পারে না। এইরূপ এক বিষয় লইয়াই বিজ্ঞানজগতে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত। ইহাতেই বোধ হয়, বিজ্ঞানের পরমাণুবাদ অসম্পূর্ণ।

সেইরূপ, যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বারা জড়জগৎ অহরহ চালিত, যাহাদিগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ঘাতপ্রতিঘাত জড়বস্তুর উপর নিয়ত দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ জড়বিজ্ঞান স্পষ্টরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। ইহার মতে উহারা চিৎ-শক্তিরহিত অচেতন অন্ধ জড়শক্তি, কেবল জড়পদার্থের সংযোগে উহাদের ক্রিয়া জড়জগতে প্রকটিত। মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, রাসায়নিকাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ, উত্তাপ, আলোক, তাড়িৎ প্রভৃতি

যে সকল ভৌতিকশক্তির নিয়মাবলি বিজ্ঞান সোৎসাহে নির্দ্দেশ করে, উহাদের আদিকারণ বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এ বিষয়েও নানামুনির নানামত প্রচলিত। দেখ, এক আলোক সম্বন্ধে, কেহ বলেন, ইহা ইথরের তরঙ্গায়ন (Undulation), কেহ বা বলেন ইহা ইথরাণুগণের পুনঃপুনঃ সঞ্চালন (Vibration)। যাহা হউক, এত আস্ফালন ও এত দর্পের ভিতর বিজ্ঞান স্পষ্ট বলিয়া থাকে, যে বিশ্বের চরমাদ্য বিষয়গুলি (Ultimate facts of Nature) অবগত হওয়া মানবের সাধ্যাতীত। এস্থলে বিজ্ঞান অনন্যোপায় হইয়া নিজ দোষ স্বীকার করিয়া লয়।

তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া থাকে, যদিও ভৌতিকশক্তিগুলি কেবলমাত্র জড়-পদার্থ যোগে প্রকটিত, তথাচ সূক্ষ্মজগতের সহিত উহাদের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। সে জন্য জড়জগতের ক্রিয়া দেখিয়া উহাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশ করা কেবল মূর্খতার কর্ম্ম। যে আকাশ বা ইথর দ্বারা উহারা এ জগতে ব্যক্ত, তাহাই কাহারও ইন্দ্রিয়গোচর নয়; অতএব উহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি প্রকারে নির্দ্দেশ করা যায়? সকলের পক্ষে এ পর্য্যন্ত জানাই যথেষ্ট, যে উহারা প্রকৃত আধিদৈবিক; প্রত্যেক শক্তির মূলদেশ সূক্ষ্মজগতে চিৎশক্তিবিশিষ্ট দেবগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। তাঁহারাই সূক্ষ্মজগৎ হইতে স্থূলজগৎকে এমন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালন করেন। সমগ্র জগতে যে সুশৃঙ্খলতা ও সামঞ্জস্য দেদীপ্যমান, তাহা কি কদাচ অন্ধ জড়শক্তির কার্য্য হইতে পারে? ঝটিকা, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনাবলি, আমাদের মনে হয়, অন্ধ ভৌতিকশক্তির একমাত্র ক্রিয়া। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; উহারা সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপ পরিচালিত। এ কথা শ্রবণে অনেকে হাস্যসম্বরণ করিবেন না সত্য এবং এ বিষয়ে প্রমাণ দেওয়াও একরূপ অসম্ভব; কিন্তু ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কথা ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কথা। দৈব অনুশাসনের উপর লোকের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলিয়াই আকস্মিক ঘটনা মাত্রেই পূর্ব্বে দৈব ঘটনা বলিয়া উক্ত হইত। কিন্তু এখন আমরা দৈবশব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতে শিখিতেছি। হিন্দুধর্ম্মে অগ্নি, পবন, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি যে সকল বৈদিক দেবতা উল্লিখিত, উহাদিগকে পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ মনে করেন,

যে উহারা অসভ্যযুগের জড়োপাসনার চিহ্ন। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মতে উহারাই ভৌতিকশক্তির মূলদেশ অধিকার করিয়া আছেন। পুরাকালে দেবতাদিগের উপর লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; এখন ঃকেশ্বরবাদ-প্রচলনের সঙ্গে উহাদের পরিবর্ত্তে লৌকিক ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রবল হইয়াছে; এখন আবার সভ্যজগতে জড়বিজ্ঞানের অভ্যুত্থানে ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে অন্ধ জড়শক্তির উপর বিশ্বাস অধিকাংশ লোকের মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে।

এখন জীবদেহ সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞানকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করা যাউক। সকলেই জানেন, জীবদেহে যতদিন প্রাণ অবস্থিতি করে, ততদিন জীব সংসারে জীবিত থাকিয়া অনন্ত কর্ম্মে ব্যাপৃত হয় এবং যে মুহূর্ত্তে প্রাণ জীবদেহ হইতে বহির্গত হয়, সেই মুহূর্ত্তে ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখন প্রাণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? জনসাধারণের বিশ্বাস,-যে ইহা . একপ্রকার বায়ুবিশেষ। নিশ্বাস প্রশ্বাসযোগে যতক্ষণ এ বায়ু শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ততক্ষণ প্রাণ জীবদেহে বর্ত্তমান থাকে এবং যখন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই জীবের মৃত্যু উপস্থিত হয়। বায়ুর সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধবশতঃই লোকে ঐরূপ ভাবিয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাখ্যান অন্যরূপ।

জড়জগৎ ব্যাখ্যান করিবার সময় যেমন জড়বিজ্ঞান পরমাণুপুঞ্জের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সেইরূপ জীবদেহের ক্রিয়া ব্যাখ্যান করিবার সময় বিজ্ঞান জীবাণুপুঞ্জের আশ্রয় লয়। এই সকল জীবাণু (Cells) বিজ্ঞান অণুবীক্ষণ-যন্ত্রযোগে দর্শনও করে। ইহারা প্রটোপ্লাসম নামক (Protoplasm জৈবনিকপদার্থে পূর্ণ এবং জৈবনিকশক্তিসম্পন্ন। এখন প্রটোপ্ল্যাসমে জীবনীশক্তি কোথা হইতে আইসে, বিজ্ঞান তাহা স্পষ্টরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। যেমন পরমাণুরাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া জড়বস্তু নির্ম্মিত, সেইরূপ জীবাণুরাশিও পুঞ্জীকৃত হইয়া জীবদেহ বিরচিত। এখন যে জীবাণুপুঞ্জ একত্রিত হইয়া জীবদেহ নির্ম্মাণ করে, উহাদিগের জৈবনিকশক্তির সমষ্টি সমগ্র জীবদেহের প্রাণ। এই প্রাণ জীবের সমস্ত শরীরে অভিব্যাপ্ত। এখন জীবজগতে যে জীব যত উন্নতপদবীতে অধিরূঢ়, উহার দেহস্থ যন্ত্রগুলি তত জটিল এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধও তত ঘনিষ্ঠ। এ কারণে উৎকৃষ্ট

জীবের মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া যতদিন সমভাবে চালিত ও বিশুদ্ধ রক্ত সর্ব্বশরীরে সমভাবে বহমান, ততদিন ঐ জীবদেহ জীবনসম্বন্ধীয় কতকগুলি রাসায়নিক, ভৌতিক ও মানসিক ক্রিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকৃতি-জগতের উপর আধিপত্য করে। কিন্তু যখন উপরোক্ত যন্ত্রগুলির অসাধ্য ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় এবং শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় শোণিত বিশুদ্ধ হইতে পায় না, তখনই সমস্ত দেহের ক্রিয়া রহিত হইয়া যায় এবং উহার জীবনীশক্তি লুপ্ত হয়; তৎকালে প্রকৃতিজগৎ উহার উপর আধিপত্য প্রদর্শন করতঃ উহার পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়।

জীবদেহে যে শোণিত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয়, তাহা সার ও অসার বস্তুতে পরিপূর্ণ। উহা হইতেই যন্ত্রস্থ জীবাণুগুলি স্ব স্ব প্রয়োজনীয় সার বস্তু গ্রহণ করে এবং ক্রিয়াঘটিত অসার পদার্থগুলি উহাতেই প্রক্ষেপ করে। ফুস্‌ফুসে অঙ্গারজনপূর্ণ অপবিত্র শোণিত বায়ুর অম্লজনযোগে বিশুদ্ধ হয়। নিশ্বাস দ্বারা বহির্জগতের বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে এবং অপবিত্র শোণিতকে পবিত্র করে এবং প্রশ্বাস দ্বারা অপবিত্র বায়ু ফুস্‌ফুস হইতে নিঃসৃত হয়। শোণিতশোধনের জন্য বায়ু এত আবশ্যক বলিয়া শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং লোকে প্রাণকে বায়ুস্বরূপ জ্ঞান করে। হৃৎপিণ্ড নিজসঙ্কোচন দ্বারা অপবিত্র শোণিতকে শোধনার্থ ফুস্‌ফুসে প্রেরণ করে এবং পবিত্র শোণিতকে জীবনীক্রিয়ানির্ব্বাহার্থে সর্ব্বশরীরে প্রেরণ করে : এজন্য যেইমাত্র হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়, সমস্ত শরীর অচল হয় ও মৃত্যু উপস্থিত হয়। এইরূপ দেহের প্রত্যেক যন্ত্র জীবনীক্রিয়ানির্ব্বাহার্থ বিশেষ আবশ্যক।

দেহস্থ যন্ত্রগুলির ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া কিরূপে শরীরের পোষণ, বর্দ্ধন ও নাশ হয়, তাহা বিজ্ঞান সম্যক ব্যাখ্যান করিতে প্রয়াস প্রায় বটে, কিন্তু জৈবনিকশক্তি কিরূপ, তাহা ইহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারে না এবং কেবলমাত্র স্থূলদেহ পরীক্ষা করিয়া বা শবব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহা জানা যায় না। পূর্ব্বে শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতগণ মনে করিতেন, যে দেহের জৈবনিক-শক্তি বৈশেষিক ; কিন্তু তাঁহারা আজকাল উহাকে রাসায়নিক ও ভৌতিক-শক্তি হইতে আদৌ পৃথকজ্ঞান করেন না। বেদান্তমতে জীব বা জৈবনিক-

শক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এ কথারও বিজ্ঞান আজকাল কিছু কিছু আভাস পায়।

সেইরূপ জীবদেহে যে চৈতন্য বর্ত্তমান, যাহার বলে জীব আমিত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া সর্ব্ববিধক্রিয়া সম্পাদন করে ও প্রকৃতিজগতের উপর আধিপত্য করে, সেই চৈতন্য কোথা হইতে আইসে, উহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহাও বিজ্ঞান বলিতে পারে না। এস্থলেও বিজ্ঞান আপনাকে এই বলিয়া প্রবোধ দেয়, যে জগতের চরমাদ্য বিষয়গুলি (Ultimate facts of Nature) মানবের অজ্ঞেয়। এস্থলেও বিজ্ঞানের দর্প সম্যক চূর্ণ।

মানসিক ক্রিয়াসম্বন্ধেও বিজ্ঞানের উক্তি অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক। মানসক্ষেত্রে যে অনন্তচিন্তা ও অনন্তভাবনা অনুক্ষণ উদয় হয়, এ সকল ইহার মতে মস্তিষ্কের স্নায়বীয় পদার্থের নিষ্ঠীবনমাত্র (Secretion), অথবা স্নায়বীয়পদার্থ শোণিতসংযোগে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাবনায় পরিণত হয়। বিজ্ঞান আরও একপদ অগ্রসর হইয়া বলিয়া থাকে, যে তাড়িৎপ্রবাহ (Electric Current) স্নায়ুশিরার স্নায়বিক আকাশে (Nervous ether) সঞ্চরণ করিয়া প্রতিফলিত ক্রিয়াগুলি (Reflex action) উৎপাদন করে, তাহাই অধিক স্ফুরিত মস্তিষ্কে মানসিকক্রিয়ায় পরিণত হয়। যাহা হউক, বিজ্ঞানোক্ত এই সকল শ্রুতিমনোহর কথা অন্ধকারে উপলখণ্ডপ্রক্ষেপের ন্যায় বোধ হয়।

তত্ত্ববিদ্যা উপদেশ দেয়, জীবের স্থূলদেহটী এই পরিদৃশ্যমাণ স্থূলজগতের বস্তু; কিন্তু দেহনিবদ্ধ মন জীবনের অপর সমতলক্ষেত্রের বস্তু অর্থাৎ সূক্ষ্ম-জগতের বা অধ্যাত্মজগতের বস্তু। সেজন্য ইহা উভয় জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ মানসিক ক্রিয়াগুলি স্থূলজগতের পঞ্চেন্দ্রিয় ও উহাদের বিষয় দ্বারা সম্যক চালিত হইলেও, উহারা প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম-জগৎ হইতে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়। পাঠক! এ সকল উপহাসের কথা নয়। এ সকল অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অবিনাশী সত্য। সূক্ষ্মজগতের সহিত মনের এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃই মানবীয় নিয়তি বা জাতীয় নিয়তি সূক্ষ্ম-জগৎস্থিত দেবগণ কর্ত্তৃক এত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নিয়ন্ত্রিত।

জড়বিজ্ঞান সাহঙ্কারে উপদেশ দেয়, যে কতকগুলি অপরিবর্ত্তনশীল ভৌতিক নিয়ম দ্বারাই এ জগৎ পরিচালিত। কিন্তু স্থলবিশেষে এমন অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখা যায়, যাহা বিজ্ঞান স্বাবিষ্কৃত ভৌতিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যান করিতে অসমর্থ। যোগীরা যোগবলে শূন্যে উত্থিত হন, এক মাসকাল অনশনে থাকিয়াও জীবনধারণ করেন, ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াও এক মাস পরে পুনরুজ্জীবিত হন, এবং অতীন্দ্রিয় দর্শন ও পরকায়াপ্রবেশাদি নানা অলৌকিকক্রিয়া প্রদর্শন করেন। বিজ্ঞান এ সকল অলৌকিক ঘটনাকে একতুড়িতে উড়াইয়া দেয় বটে, কিন্তু উহাদের ব্যাখ্যান করিতে ইহা অসমর্থ। অনেকেই ত দেখিয়া থাকেন, কত কত মহাত্মা যোগবলে কিরূপ লোকাতিগক্ষমতা প্রদর্শন করেন! এ সকল প্রবঞ্চকের কার্য্য বলিয়া বিজ্ঞান অবজ্ঞা করে; কারণ উহাদিগকে ব্যাখ্যান করিলে, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ভৌতিকনিয়মাবলি কিয়ৎপরিমাণে মিথ্যা হয়। যাহা হউক, এখন সভ্যজগতে জড়বিজ্ঞানেরই সমাদর ও প্রতিপত্তি এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান নামে মাত্র পর্য্যবসিত।

এখন জিজ্ঞাস্য, সভ্যজগতে জড়বিজ্ঞানের এত প্রাদুর্ভাব ও এত সমাদর কেন? কেনই বা লোকে ইহার মোহিনীমূর্ত্তিদর্শনে এত বিমুগ্ধ? এই কলিযুগে মানবের আধ্যাত্মিকতার যাহা কিছু অবশিষ্ট, তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে আধিভৌতিকতার উন্নতি হইবে ও স্থূলত্বেরই চরমপরিণতি হইবে; ইহাই প্রকৃতিজগতের অখণ্ডনীয় নিয়ম। এ জগতে কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই। অতএব যে জড়বিজ্ঞান কেবল মানবসমাজের আধিভৌতিক উন্নতিসাধক, এখন উহারই এত গৌরব ও সমাদর! এখন সকলে উহার বাহ্য চাকচিক্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া উহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া পূজা করে এবং উহারই উপদেশ শিরোধার্য্য করে। আধুনিক বিদ্যাজগতে জড়বিজ্ঞানের যেরূপ অনুশীলন ও সম্মান, তাহাতে বোধ হয়, ইহাই জগতে একাধিপত্য করিবে। ইহারই গুণে মানবের আধিভৌতিকতার চরম উন্নতিসাধন হইবে এবং সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট, তাহা একেবারে লুপ্ত হইবে। যে স্রোত খরবেগে বহমান, সেই স্রোতে তুমি, আমি, সকলেই সমভাবে বাহ্যমান। কলিযুগে

মানবের সম্যক আধিভৌতিক উন্নতির জন্য জড়বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত এবং তজ্জন্য আজকাল সভ্যজগতে ইহার এত সমাদর ও প্রতিপত্তি।

ধর্ম্মের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ।

পুরাকালের অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্র মানবধর্ম্মের বিশেষ পোষকতা করে; কিন্তু আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞান প্রকাশ্যভাবে উহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান। ভূমণ্ডলে আজকাল যে সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচলিত, উহাদের সহিত দর্শনশাস্ত্রের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ; এমন কি, উহাদের মূলভিত্তি সর্ব্বত্র দর্শনশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য বটে, কোন কোন দর্শনশাস্ত্র (চার্ব্বাকাদি) নাস্তিকবাদ প্রচার করায় ঘোর ধর্ম্মদ্বেষী হয়; কিন্তু অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্র সকল দেশে ও সকল সময়ে মানবধর্ম্মের সম্যক পোষকতা করিয়া যায়; এমন কি, সকল দেশেই দর্শনলব্ধজ্ঞানই উহার সম্যক উন্নতিসাধন করে। সাংখ্য মত, বেদান্ত মত, কনফুউসাস মত, জোরাষ্টার মত, প্লেটোর মত প্রভৃতি সকল দার্শনিক মতই মানবধর্ম্মকে দেশবিশেষে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। প্রাচ্যজগতে দর্শনশাস্ত্র সম্যক উন্নতিলাভ করে; এজন্য প্রাচ্যজগতেই দর্শনপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মগুলি প্রথম প্রচারিত হয় এবং উহারাই কালক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে অভিব্যাপ্ত হয়।

দর্শনশাস্ত্রই ভূমণ্ডলে একেশ্বরবাদ বা অন্যরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত প্রচার করে। অনেকের মতে হিন্দুধর্ম্মের একেশ্বরবাদ বেদান্ত ও উপনিষদ দ্বারা প্রচারিত এবং ষড়দর্শনের সহিত উহার সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। বৌদ্ধমত সাংখ্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ খ্রীষ্টমতও গ্রীক ও ইরানদর্শনের উপর স্থাপিত। সর্ব্বত্র এরূপ দৃষ্ট হয় দর্শনশাস্ত্রের উন্নতিই ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতির মূলীভূত কারণ। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে যে দেশে মানবের বুদ্ধিশক্তি যেরূপ স্ফুরিত হয়, তিনি তদনুরূপ পরমার্থজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে দেশীয় দর্শনশাস্ত্রের, পরে জাতীয় ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করেন। যৎকালে গ্রীশদেশে পৌত্তলিকতা প্রবল, তৎকালে সক্রেটিশপ্রমুখ পণ্ডিতগণ যুক্তিবলে একেশ্বর জ্ঞানলাভ করেন। পরে তিন শতাব্দির ভিতর তাঁহাদের উন্নত মত ক্রমশঃ

বহুবিস্তৃত হইলে পর, ধর্ম্মজীবন মহাত্মা ঈশা দুন্দভিস্বরে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট একেশ্বরবাদ প্রচার করতঃ তদর্থে নিজ প্রাণ আহুতি দিয়া যান। তাঁহারই শিষ্যানুশিষ্যদিগের উৎসাহে ও যত্নে তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম কালক্রমে পাশ্চাত্য-জগতে প্রবল হয়। সেইরূপ মহম্মদও প্রাচ্যজগতে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন।

এইরূপ নানামত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ প্রকাশ করেন তাঁহারা মানবের জাতীয় ইতিহাস অন্বেষণ করিয়া ঐ সকল সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা উপরোক্ত মত খণ্ডন করতঃ বলেন, যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হইয়াই যোগসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ দেশে দেশে নূতন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন এবং দার্শনিক পণ্ডিতগণও মানবজীবনের কুট প্রশ্নসম্বন্ধে নূতন নূতন মত প্রচার করেন। যাহা হউক, বিজ্ঞানের মত সত্য, কি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মত সত্য, তাহা এস্থলে সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মের সহিত দর্শনের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনশ্বরত্ব, পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তৎকর্ত্তৃক জগতের আধিনায়কত্ব প্রভৃতি মানবধর্ম্মের উৎকৃষ্ট মতামতগুলি উন্নতদর্শনশাস্ত্রসম্মত। এখন ঐ সকল শ্রেষ্ঠ মতামত সর্ব্ববাদিসম্মত এবং খ্রীষ্ট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠধর্ম্মের প্রধান অঙ্গস্বরূপ। এমন কি, ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসই আধুনিক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের মূলভিত্তি।

দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বিবাদবিসংবাদ থাকায়, শেষোক্তটী এখন দর্শনপ্রতিপাদিত মানবধর্ম্মের উপর খড়্গাহস্ত এবং উহার সমূলোৎ-পাটনে ব্যগ্র। সভ্যজগতে আজকাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কেবল নাস্তিক মত প্রচার করেন। তাঁহারা ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক, কিছুই মানেন না। একমাত্র জড় ও শক্তি তাঁহাদের উপাস্য দেবতা এবং চাক্ষুস প্রমাণই তাঁহাদের উপদেবতা। তাঁহাদের মতে সংসারে ধর্ম্মও নাই, অধর্ম্মও নাই, কেবল সমাজে বসবাসবশতঃ মানবের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান ও বিবেক উত্থিত। সত্য বটে, তাঁহারা প্রকৃতির নানা বিভাগে অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতিজগতে অগাধ নির্ম্মাণকৌশল ও অত্যাদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখান; কিন্তু

দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোন পংক্তিতে বিশ্বরচয়িতা ঈশ্বরের নামোল্লেখ নাই। তাঁহারা ভাবেন, এত অত্যুজ্জ্বলবিজ্ঞানালোকের মধ্যে ঈশ্বরের নামোল্লেখ মানবের দুর্ব্বলতাপরিচায়ক এবং ঈশ্বরস্থানে তাঁহারা আজকাল একমাত্র অন্ধ জড়শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন।

কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ঈশ্বরকে বিশ্বের অজ্ঞেয় আদিকারণ স্বীকার করেন বটে; কিন্তু যখন এই বিশ্বসংসার কতকগুলি অপরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সৃষ্ট ও পরিচালিত, তখন ঈশ্বরকে মানিবার কি প্রয়োজন? যখন তিনি এ সংসারে সাক্ষীগোপালমাত্র, তখন তাঁহার আরাধনা বা গুণকীর্ত্তন করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহারা বলেন, দুর্ব্বল মানব নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ, নিজের কুসংস্কারবশতঃ বিপদে পতিত হইলেই ঈশ্বরকে ডাকিয়া থাকেন। কিন্তু এখন আমরা বিদ্যাবলে বলীয়ান ও বিজ্ঞানবলে বলীয়ান; বিপদে পতিত হই, বিপদের প্রতিকার করিব; কেন মিছে ঈশ্বরকে ডাকিয়া জিহ্বা অপবিত্র করিব? বরং লোকের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য তাহাদের মন হইতে ঈশ্বরকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা পাইব।

তাঁহারা এখন ঈশ্বর মানেন না বটে; কিন্তু তাঁহাদের নিকট জড়, শক্তি ও অন্ধদৈবই ধর্ম্মের উপাস্য ত্রিমূর্ত্তি।

"According to Science, the holy Creative Trinity is inert matter, senseless Force and blind Chance."

Secret Doctrine.

এখন তাঁহারা ঐ উপাস্য ত্রিমূর্ত্তির ষোড়শোপচারে পূজা করেন এবং তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থে উহাদের গুণানুবাদ ও গুণকীর্ত্তন পূর্ণভাবে বিকাশিত। তাঁহারা বলেন, বিশ্বব্যাপারে জড়শক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা; ইহা ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিৎশক্তি নাই, যাহার নিকট আমাদের মস্তক অবনত করা উচিত।

এবংবিধ জড়বাদী নাস্তিক মতামত পাশ্চাত্যজগতে প্রচারিত হওয়ায়, অল্পদিনের ভিতর তথায় প্রভূত অনিষ্টোৎপত্তি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সভ্যজগতে আজকাল অধিকাংশ কৃতবিদ্যলোক খ্রীষ্টধর্ম্মের মতামতের উপর সন্দিগ্ধ; এমন কি, তাঁহারা ধর্ম্মের মূলোৎপাটনে ব্যগ্র; তজ্জন্য ধর্ম্মযাজক-

দিগের যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা এখনও সমাজে যাহা অবশিষ্ট, তাহা সঙ্কুচিত করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। এদেশেও তাঁহাদের সুশিক্ষিত শিষ্যগণ গানোর (Ganot) এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। যাহা হউক, বিজ্ঞানোপদিষ্ট নাস্তিক মতামত জগতে বহুবিস্তৃত হইলে, ধর্ম্মসম্বন্ধে মানবসমাজে যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তখনই বোধ হয়, শাস্ত্রোল্লিখিত ঘোর কলি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে স্বরাজ্য বিস্তার করিবে। এ সকল তাহারই পূর্ব্বসূত্রপাত মাত্র।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য, বিজ্ঞান কি যথার্থতঃ মানবধর্ম্মের সমূলোৎপাটন করিতে সক্ষম হইবে? বিজ্ঞান সম্প্রদায়বিশেষের বৈশেষিক মতামত খণ্ডন করিতে পারে, অথবা স্থলবিশেষে দর্শনপ্রতিপাদিত মানবধর্ম্মের মৌলিক মতামতের উপর অবিশ্বাস বা সন্দেহ করিতে পারে. কিন্তু যে প্রাকৃতিক বা সামাজিক ধর্ম্ম সকল মানবধর্ম্মের মূলে নিহিত, বিজ্ঞান উহার কদাচ বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিবে না। মানবসমাজের শৈশবাবস্থা হইতে আবহমানকাল যে সনাতন প্রাকৃতিক ও সামাজিক ধর্ম্ম চালিত এবং যাহা উহার স্থায়িত্বের সঙ্গে অপরিহার্য্যরূপে জড়িত, সে ধর্ম্মের নিকট বিজ্ঞান দুগ্ধপোষ্য বালক মাত্র। বিজ্ঞান সে ধর্ম্মের কোনরূপ অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না; বরং উহার অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়, বিজ্ঞান নিজে কালকবলিত হইবে। অসার খ্রীষ্টধর্ম্মের কতকগুলি মতামত খণ্ডন করে বলিয়া বিজ্ঞান সনাতন প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সমূলোৎচ্ছেদসাধন করিতে সক্ষম, এরূপ যাঁহারা বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রকৃততত্ত্বদর্শী নন। যে ধর্ম্ম মানবসমাজের অস্থিমজ্জায় নিহিত, যে ধর্ম্মনাশে সমাজধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, বিজ্ঞান সে ধর্ম্মের কি অনিষ্টতাচরণ করিবে? যদি বিজ্ঞান উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, বিজ্ঞান স্বয়ং লোকসমাজে অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত হইবে। চিরকালই ত নাস্তিকমত সমাজে প্রচলিত; তাহাতেই বা সমাজের কি ক্ষতি? সকল স্থলেই দেখা যায়, নাস্তিকগণ মৃত্যুকালে একবার ঈশ্বর ডাকিয়া যান।

বিজ্ঞান ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক না মানিতে পারে; কিন্তু সামাজিক ধর্ম্মের নিকট ইহা চিরদিন নতশির। চুরি করা বা নরহত্যা করা সমাজের

অমঙ্গলদায়ক, তাহা সকলকেই মানিতে হয়। অতএব সামাজিক ধর্ম্মনাশ করিতে বিজ্ঞান কদাচ চেষ্টা পাইবে না, বরং উহার সম্যক পোষকতা করিবে।

আধুনিক জড়বিজ্ঞানের আদিগুরু, সুবিখ্যাত বেকন সাহেব বলেন—"A little philosophy inclineth a man's mind to atheism but depth in philosophy bringeth a man's mind to religion."

"অল্পজ্ঞান মানবমনকে নাস্তিকতায় লইয়া যায়; কিন্তু গভীরজ্ঞান উহাকে পুনরায় ধর্ম্মপথে আনয়ন করে।" ইহাতে বোধ হয় বিজ্ঞানবিৎ নাস্তিকগণ কালক্রমে আপনাদের ভ্রম দেখিতে পাইবেন এবং তৎকালে তাঁহারা আর মানবধর্ম্মের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মায়াবাদ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এই শ্রেষ্ঠ মতটি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম কর্ত্তৃক জগতে প্রচারিত। সেদিনকার খ্রীষ্ট ও মুসলমানধর্ম্ম এ মতটী হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। গ্রীশদেশে মহাত্মা প্লেটোও নিজপুস্তকে এই শ্রেষ্ঠ মত প্রচার করেন। আধুনিক জড়বাদী, স্থূলদর্শী বিজ্ঞান এই মত আদৌ গ্রাহ্য করে না; কারণ ইহার মতে তোমার অস্তিত্বের ন্যায় এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব সকলের নিকট সত্য, মহাসত্য এবং কদাচ মিথ্যাজ্ঞানসম্ভূত হইতে পারে না।

বেদান্তের মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অতীব দুরূহ। অনেক পণ্ডিত মায়াবাদ ব্যাখ্যান কালে দৃষ্টান্ত দেন, যেমন অন্ধকারে রজ্জুদর্শনে সর্পভ্রম হয়, তৎপরে রজ্জুজ্ঞান হইলে অলীক সর্পজ্ঞান মন হইতে দূরীভূত হয়, সেইরূপ সংসারে পরমার্থ জ্ঞান হইলে সংসারের যাবতীয় মায়াজ্ঞান মন হইতে দূরীভূত হয়; তখন সংসারের কোন ভেদাভেদজ্ঞান থাকে না এবং সকলই ব্রহ্মময় বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের মতে, ইহাই মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধপণ্ডিতগণ ইহার যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। যাহা হউক, এস্থলে মায়াবাদের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে মায়াশব্দ দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত। ইহার প্রথম অর্থে অতিরিক্ত মোহ বুঝায়; যেমন দেহ, পুত্র, কলত্রাদি সংসারের ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ে মানব-মন স্বভাবতঃ মায়ায় মুগ্ধ। এ মায়াবন্ধন ছেদন করা ইহার পক্ষে অনেক সময় দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ সেইরূপ সংসারের যাবতীয় অনিত্য মিথ্যাজ্ঞান লাভ করতঃ পরব্রহ্মকে ভুলিয়া গিয়া সকল বিষয়ে আমার আমার যে মিথ্যাজ্ঞান মনে উদয় হয়, তাহাও ইহার মায়াজ্ঞান। শাস্ত্রোক্ত পরমহংসমার্গ অবলম্বন করিলে এ মায়াজ্ঞান দূরীভূত হইতে পারে।

মায়াশব্দের দ্বিতীয় অর্থে মহামোহ বুঝায়, যাহা ছেদন করা মনের পক্ষে একেবারে সম্পূর্ণরূপ অসাধ্য। পরমহংস হউন, যোগী হউন, গৃহস্থ হউন, এ মহামায়ার মহাবন্ধন মানব কস্মিনকালে এ জগতে ছেদন করিতে পারেন না। যতদিন তিনি স্থূলদেহ ধারণ করিয়া ইহলোকে বা জীবনের এই সমতল ক্ষেত্রে (this plane of existence) বাহ্যজগতের সহিত বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন, ততদিন যে মহামায়ার মহাবরণে তিনি মুগ্ধ, সে মহাবরণ তিনি কদাচ ভেদ করিতে পারেন না। এ মহামায়া তাঁহার অস্তিত্বের মূলে সংলগ্ন। এ স্থূলদেহ সর্ব্বজ্ঞ মায়াতীত আত্মার মায়াদেহ মাত্র। এ মায়াদেহে নিবদ্ধ হইলেই আত্মা মায়ামুগ্ধ হয় এবং বাস্তব পদার্থ বুঝিতে পারে না। এ মায়াদেহ ত্যাগ করিলে, ইহসংসারের যাবতীয় মায়াজ্ঞান হইতে আত্মাও নির্মুক্ত হয়। এজন্য বিশ্বব্যাপারের যাহা কিছু আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদায়ই মিথ্যাজ্ঞানসম্ভূত, তাহা সংবৃতিমূলক (relative); কিন্তু বস্তুতঃ উহারা কি, উহাদের বাস্তবরূপ কি, তাহা আমরা অবগত নহি; এবং কস্মিনকালে অবগত হইব না।

এই যে অন্ধকারে পথে যাইতে যাইতে তুমি একখণ্ড রজ্জু অবলোকন করতঃ সর্পভ্রমে ভয়বিহ্বল হইয়া পশ্চাৎপদ হও, পরে উহাকে ভালরূপ নিরীক্ষণ করাতে তোমার সর্পভ্রম দূর হয় এবং সেইসঙ্গে তোমার মনও সুস্থির হয়; এই যে বাষ্পীয় শকটে যাইতে যাইতে তুমি চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষসমূহকে চলায়মান দেখ, পরে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া বুঝিতে পার, যে শকটের গতিবশতঃ বৃক্ষগুলি বিপরীতদিকে চলায়মান; আবার যখন তুমি ভাবিতে থাক, ধরিত্রী স্বয়ং উহার পৃষ্ঠস্থ যাবতীয় পদার্থ ও চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুরাশি লইয়া ব্যোমমার্গে অমিতবেগে ভ্রাম্যমান, তজ্জন্য প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে উদয় হইতেও পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতে দেখ এবং রাত্রিকালে আকাশস্থ যাবতীয় নক্ষত্রমণ্ডল ধ্রুবতারার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে দেখ; এই যে একজন পথিক মরুভূমিতে যাইতে যাইতে পিপাসায় আতুর হইয়া পুরোভাগে জলাশয় দেখে এবং জলপানার্থ যেমন উহার দিকে ধাবমান হয়, অমনি জলাশয়টী আরও দূরে পলায়ন করে; এখন জিজ্ঞাস্য এ সকল দৃশ্যপটল তোমার মনে কিরূপ বোধ হয়? ইহারা কি তোমার মায়ামুগ্ধ মনের মায়াজ্ঞান, না ইহারা তোমার

চক্ষের ভ্রান্তিদর্শন ? ইহারা তোমার ভ্রান্তিদর্শন মাত্র এবং কদাচ মায়াজ্ঞান নহে। এরূপ ভ্রান্তিদর্শনোৎপাদনে যে মহামায়ার কথা উপরে লিখিত, উহার কিছুমাত্র অনুশাসন নাই। এ সকল কেবল আমাদের দর্শনশক্তির ভ্রান্তিমাত্র। অল্পমাত্র জ্ঞান লাভেই এরূপ ভ্রান্তির অপনোদন হয়।

কিন্তু এই যে অশ্বত্থ বৃক্ষটী যাহা বিশাল ও বহুবিস্তৃত শাখাপ্রশাখা লইয়া তোমার পুরোভাগে দণ্ডায়মান, যাহার প্রতিকৃতি তোমার নয়নাভ্যন্তরে বিপরীতভাবে প্রতিবিম্বিত এবং যাহার রূপ তুমি যাবজ্জীবন একরূপ দেখিয়া থাক, ইহাই তোমার মায়ামুগ্ধ মনের মায়াজ্ঞান। প্রকৃতি ঐ বৃক্ষের সহিত তোমার চক্ষু ও মনের যেরূপ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিয়া দেয়, তাহাতে তুমি উহাকে চিরদিন একরূপ দেখ। আলোক যোগে বৃক্ষটীর যেরূপ প্রতিবিম্ব তোমার নয়নদ্বয়ে পতিত হয়, অধ্যাসবশতঃ তুমি উহার চিরপরিচিত রূপটী নয়নগোচর কর এবং বাহ্যজগতে উহার অবস্থিতি অনুভব কর। তুমি কদাচ বলিতে পার না, যে উহার বাস্তবরূপ ঠিক ঐ প্রকার। আবার তুমি ঐ বৃক্ষটী যেমন দেখ, একটা পিপীলিকাও যে উহাকে ঐরূপ দেখে, তাহাও তুমি বলিতে পার না। ইহাতে কি বোধ হয় না, যে অশ্বত্থবৃক্ষটীর জ্ঞান তোমার মায়াজ্ঞান মাত্র? সেইরূপ এ জগতের যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান আমাদের মায়াজ্ঞান মাত্র। এখন যে মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া আমাদের জীবাত্মা এ সংসারে মায়াজ্ঞানলাভ করে, তাহাই মহামায়া।

এখন মায়া দ্বারা চালিত হইয়া আমরা বিশ্বপ্রপঞ্চের যে জ্ঞানলাভ করি, তাহা আমাদের মায়াজনিত মিথ্যাজ্ঞান, অথচ তাহাই আবার আমাদের মায়াজনিত সত্যজ্ঞান। যতদিন আমরা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এই মায়াময় জগতে অবস্থিতি করি, ততদিন ঐ মায়াজনিত মিথ্যাজ্ঞানই আমাদের নিকট মহাসত্য জ্ঞানে পূজিত হয়। এতদ্ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। এ স্থলে জগৎ মায়া-ময় এবং আমরাও সকলে সমভাবে মায়ামুগ্ধ; তজ্জন্য আমরা কদাচ মায়াজনিত জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া জানিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা মহামায়া হইতে মুক্ত, তাঁহাদের নিকট আমাদের মায়াজনিতজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হয়। এখন এ সংসারে এমন লোক অতীব বিরল। পরমহংস হউন, যোগী হউন, মহামায়ার মহামোহ ভেদ করা সকলের পক্ষে সমান অসাধ্য। একমাত্র

পরব্রহ্মই মায়াতীত। সেজন্য তাঁহারই নিকট আমাদের যাবতীয় জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান; অথবা যে সকল দেবতা অল্পাধিক মায়ামুক্ত, তাঁহাদের নিকটও আমাদের এ মায়াজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান মাত্র। দেখ, এই বিশ্বকে তুমি ও আমি যেরূপ দেখি, সকলেই ঠিক সেইরূপ দেখেন; কিন্তু ইহার বাস্তবরূপ কি, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না এবং বোধ হয় দেবতারাও জানেন না।

এখন দেখা যাউক, আমরা কি প্রকারে সংসারের মায়াজ্ঞানলাভ করি। এ মন্বন্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়ই মনের দ্বারস্বরূপ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়যোগেই মন জগতের যাবতীয় জ্ঞানলাভ করে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পদার্থের জ্ঞানলাভে চক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের অধিক সাহায্য করে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি কোন ইন্দ্রিয়ের অভাব হয়, অপরগুলি উহার অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা পায়; যেমন অন্ধের যষ্টিই স্পর্শযোগে অনেকস্থলে চক্ষুর কার্য্য করিতে দেখা যায়।

এ সংসারে মানবমন ও চক্ষুর যেরূপ সম্বন্ধ এবং উহাদের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে তুমি দর্শনশক্তি দ্বারা যাবতীয় পদার্থের একপ্রকার জ্ঞানলাভ কর। যদি কোন কারণে তোমার চক্ষুদ্বয় বিকৃত হয়, পদার্থবিশেষের জ্ঞানও তখন অন্যরূপ হয়। দেখ, গোলাপ ফুলটী তোমার চক্ষে কেমন সুন্দর ও রমণীয়! যদি তোমার চক্ষু বিকৃত হইয়া যায়, তুমি উহাকে অন্যরূপ দেখ, অথবা যদি তোমার মন বিকৃত হইয়া যায়, উত্তম চক্ষু সত্ত্বেও তুমি উহাকে অন্যরূপ দেখিয়া থাক। যখন তোমার চক্ষুদ্বয় এই সুবিস্তৃত, পরিদৃশ্যমান জগৎসমক্ষে উন্মীলিত হয় এবং তোমার মনও ঐদিকে ধাবিত হয়, তখন তুমি ইহার বিচিত্ররূপদর্শনে বিমুগ্ধ হও। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিয়া দেখ, সেই অপরূপ দৃশ্যটী তৎক্ষণাৎ তোমার মানসপট হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং জগৎও ঘোরান্ধকারে আবৃত হয়। তখনই তুমি স্পষ্টই বুঝিতে পার, এ বিশ্বপ্রপঞ্চ কেবল মায়াময়।

একজন জন্মান্ধকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার সম্মুখস্থ বৃক্ষবিশেষের বা জন্তু-বিশেষের স্বরূপ কি প্রকার? দর্শন ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়যোগে তাহার মনে ঐ পদার্থ বা জন্তুর যেরূপ জ্ঞান ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাই সেই হতভাগ্য ব্যক্তি উল্লেখ করে। তুমি দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি দণ্ডায়মান আছ, কি উপবিষ্ট আছ? তোমার বাক্য উচ্চদেশ হইতে নিঃসৃত

হইতেছে শ্রবণ করিয়া সে ব্যক্তি বলিয়া থাকে, তুমি দণ্ডায়মান আছ। তোমার মায়াজ্ঞান তোমার নিকট যেরূপ সত্য, তাহার মায়াজ্ঞান তাহার নিকটও সেইরূপ সত্য।

জীবজগৎ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক নিকৃষ্টজীবে ইন্দ্রিয়গণ অতি অস্ফুটভাবে বর্ত্তমান ; এমন কি, অনেক জীবে এক বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের অভাব দৃষ্ট হয় ; অথচ সকলেই দেহযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করে। প্রকৃতি যাবতীয় জীবজন্তুকে স্ব স্ব অবস্থার উপযোগী করিয়া দেয়। ইহাতে বোধ হয়, সকল জীবের মায়াজ্ঞান বিভিন্ন। যে জীব যে অবস্থায় পতিত, উহার মায়াজ্ঞান তদবস্থোপযোগী। পিপীলিকা একখণ্ড মিষ্টান্ন দর্শন করিয়া অপর পিপীলিকাগণকে কিরূপে আহ্বান করে, তাহা আমরা অবগত নহি ; কেবল পিপীলিকারাই তাহা বুঝিতে পারে।

তত্ত্ববিদ্যা উপদেশ দেয়, এক এক মন্বন্তরে মানবের এক একটী ইন্দ্রিয় স্ফুরিত ; সেজন্য প্রত্যেক মন্বন্তরে তাঁহার মায়াজ্ঞানও বিভিন্ন। এখন আমরা এই কার্য্যকারণাত্মক বিশ্বের যেরূপ জ্ঞানলাভ করি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরে মনুপুত্রগণ বোধ হয় অন্যপ্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া যান। স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে যে মায়াজ্ঞান প্রচলিত, চাক্ষুস মন্বন্তরে তাহা বিভিন্ন এবং বৈবস্বত মন্বন্তরে তাহা আরও বিভিন্ন। এস্থলে জড়বিজ্ঞান সাহঙ্কারে যে উপদেশ দেয়, চিরদিন ভৌতিকশক্তি একরূপ, তাহা আমরা কদাচ গ্রাহ্য করিতে পারি না।

মায়া পরব্রহ্মেরই মহাশক্তি। সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া পরব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয় এবং প্রলয়ের প্রাক্‌কালে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। যতদিন সৃষ্টি অবস্থিতি করে, ততদিন মায়ার অনুশাসন সর্ব্বত্র সমভাবে পরিচালিত। এই মহাশক্তির নিকট এ জগতের যাবতীয় জড়শক্তি ক্ষণস্থায়িনী। এই মহাশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া অথবা মহামায়ারূপ মহাবরণে আবৃত হইয়া জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন লোকে, ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে, ভিন্ন ভিন্ন জন্মে কর্ম্মফল ভোগ করে। প্রত্যেক অবস্থায়, প্রত্যেক লোকে মায়া কর্ত্তৃক চালিত হইয়া জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানলাভ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন সুখ দুঃখ ভোগ করে। এইরূপ নানালোকে ভিন্ন ভিন্ন মায়াজ্ঞানলাভ করিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন মায়াজনিত সুখ দুঃখ ভোগ

করিয়া জীবাত্মা কর্ম্মফল হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হয়। যতদিন জীবাত্মা ইহসংসারে দেহ ও মনের সহিত সম্বন্ধ হইয়া বিচরণ করে, ততদিন পঞ্চেন্দ্রিয়ই ইহাকে বিশ্বের পঞ্চবিষয় উপভোগ করায় এবং উহাদের জ্ঞানলাভ করায়। যে দিন ঐ সম্বন্ধ নষ্ট হয়, সে দিন এই সংসার সম্বন্ধে ইহার যাবতীয় মায়াজ্ঞানও নষ্ট হয়।

শাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করেন, কেবলমাত্র নিত্য, নিরঞ্জন, সত্য, সনাতন পরব্রহ্মই মায়াতীত; তদ্ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে যাবতীয় লোক মায়ামুগ্ধ। "ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ" ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মায়া কর্ত্তৃক বিরচিত। সেজন্য বলা উচিত দেবলোকের এক প্রকার মায়াজ্ঞান, গন্ধর্ব্বলোকের অন্য প্রকার মায়াজ্ঞান। তাঁহারা আরও বলেন, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই মহামায়া এবং প্রকৃতির তিনগুণ সত্বরজস্তম মায়ারিই ত্রিগুণ। সংসারের যাবতীয় বস্তু মায়াময় বলিয়া মায়ার ত্রিগুণে আবৃত এবং উহারা উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহা মায়াতীত, তাহার সৃষ্টি নাই, বিনাশ নাই, রূপান্তর নাই, পরিবর্ত্তন নাই; তাহা অনন্তকাল সমভাবে বিদ্যমান। আর যাহা মায়াময়, তাহারই ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তর, পরিবর্ত্তন, হ্রাস, ক্ষয় ও ধ্বংস হয়।

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক পণ্ডিতদিগের মতে যাহা সৎ, তাহাই মায়াতীত এবং যাহা অসৎ, তাহা মায়াবিশিষ্ট। একমাত্র পরব্রহ্মই সৎ বা সত্যস্বরূপ, এজন্য তিনি বেদে ওঁ তৎসৎ ও সচ্চিদানন্দ বলিয়া কথিত। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়াময়, এজন্য ইহা অসৎ, ক্ষণে ক্ষণে ইহা পরিবর্ত্তিত এবং ইহাতে ত্রিগুণের অনন্তলীলা প্রকাশিত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের মতে এই কার্য্যকারণাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ, যাহা আমাদের চর্ম্মচক্ষের সমক্ষে প্রত্যক্ষীভূত, তাহাই সৎ বা সত্যস্বরূপ; আর যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাই অসৎ বা মিথ্যা। সৎ ও অসৎ এই দুইটী শব্দের তাৎপর্য্যে এত পার্থক্য থাকায়, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে যে কত গোলযোগ উপস্থিত, তাহা এস্থলে বর্ণন করিবার আবশ্যকতা নাই।

পরব্রহ্মের মহামায়া দুরত্যয়া। ইহার অনুশাসন পরিহার করা জীবের অসাধ্য।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ।
দেবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।

গীতা।

"মায়ার ত্রিগুণে সমস্ত জগৎ বিমুগ্ধ, তজ্জন্য গুণাতীত, মায়াতীত অবিনশ্বর পরমাত্মা যে আমি, আমাকে কেহ জানিতে পারে না। আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া লোকে অতিকষ্টে পরিহার করে । কেবল যাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই আমার এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন।"

যে মহাত্মা অসাধারণ যোগবলে সমাধিস্থ হইয়া মায়ামুগ্ধ দেহের চব্বিশ তত্ত্বের ক্রমশঃ লয়সাধন করতঃ পরব্রহ্মের সহিত নিজ আত্মার মিলন করিতে পারেন, তিনিই সমাধির অবস্থায় মায়া হইতে বিচ্যুত হন। সমাধি ভঙ্গ হইলেই তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় মায়াবিশিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হন। কলিযুগের কয়জন লোক সেরূপ যোগাভ্যাস করিতে পারেন, বল? অর্দ্ধঘণ্টার জন্য নিমীলিতাক্ষ হইয়া একপ্রাণে, একধ্যানে ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিতে পারিলে, যে তুমি সমাধিস্থ হইয়া মায়ামুক্ত হয়, তাহা কদাচ মনে করিও না। চব্বিশতত্ত্বের লয়সাধন করিয়া প্রকৃত সমাধিস্থ হওয়া কত সাধনাসাপেক্ষ, তাহা মহাত্মাগণই জানেন।

জীবাত্মা মহামায়া দ্বারা অনন্ত কাল চালিত। কেবল যে ইহসংসারে জীবাত্মা ইহাদ্বারা চালিত, এমন নহে; অন্যান্য লোকেও জীবাত্মা ইহাদ্বারা সম্যক পরিচালিত। যখন নিজ কর্ম্মফল কর্ত্তৃক চালিত হইয়া জীব জীবনের বিবিধাবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন সমতলক্ষেত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন লোকে পরিভ্রমণ করে, তখনও ইহা এই মহামায়া দ্বারা চালিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানলাভ করিতে থাকে ও ভিন্ন ভিন্ন সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। যুগযুগান্তরে, কল্পকল্পান্তরে কোটী কোটী বৎসরের পর শিক্ষা ও সংযম দ্বারা ক্রমোন্নত হইয়া যখন জীবাত্মা পরব্রহ্মে মিলিত হইয়া নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়, তখনই ইহা মহামায়া হইতে একেবারে বিমুক্ত হয়। তদ্ভিন্ন সকল লোকে ও

সকল অবস্থায় জীবাত্মা মায়া হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় না এবং সুখদুঃখরূপ মহাবর্ত্তে পতিত হইয়া ঘূর্ণায়মান হয়।

পাঠক! তুমি আজ কলিযুগে মানবাকারে ইহসংসারে বিচরণ করিয়া সংসারের যাবতীয় পদার্থের একপ্রকার জ্ঞানলাভ করিতেছ এবং তুমি আজ একপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মাবলি দ্বারা চালিত। হয়ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে তোমারই জীবাত্মা ইহজন্ম বিস্মৃত হইয়া পুনরায় এ জগতে বিচরণ করিবে। তখন তোমার জীবাত্মা বিভিন্নপ্রকার ভৌতিক নিয়মাবলি দ্বারা চালিত হইবে এবং বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানলাভ করিবে। কখন বা দেবলোকে, কখন বা তপলোকে, কখন বা জনলোকে, কখন বা সত্যলোকে তোমার জীবাত্মা বিচরণ করিবে এবং সকল অবস্থায় একমাত্র মায়া দ্বারা ইহা চালিত হইবে। সেজন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে এই মহাশক্তি মায়াদেবীর নিকট মস্তক অবনত করিতে উপদেশ দেয়। জগদম্বা মহেশ্বরীই মায়াদেবী। এস, আমরা তাঁহার শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণত হই।

এখন মায়াবাদের উপর আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞান কিরূপ মতামত প্রকাশ করে, তাহাও সকলের জানা উচিত। বিজ্ঞান মায়াবাদের উপর উপহাস ও বিদ্রূপ করে। ইহার মতে মায়াবাদরূপ কতকগুলি কাল্পনিক জ্ঞানে মানবমনকে বিভোর করিলে, সংসারের অণুমাত্র উপকার নাই বরং উহাদ্বারা ইহার প্রভূত অনিষ্ট সাধন হয়; কারণ লোকে মায়াবাদ পাঠ করিয়া সংসার উপেক্ষা করিতে শিক্ষা করে মাত্র। অতএব এ সকল মতামত সমাজে যত অপ্রচলিত হয়, সমাজের ততই মঙ্গল। বিজ্ঞানের মতে যে জ্ঞান তুমি মায়াজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া উপেক্ষা করিতে শিক্ষা কর, তাহাই তোমার যথার্থ ও সত্যজ্ঞান এবং উহার উন্নতিতে তোমার উন্নতি এবং তোমার সমাজের উন্নতি। অতএব সেই যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা করাই জীবনের মুখ্যব্রত হওয়া উচিত। সে জ্ঞানকে কি কদাচ মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া উপেক্ষা করা যায়? অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলুক, বেদান্ত বলুক, আর যে শাস্ত্র বলুক না কেন, উহাদের বিকৃত উপদেশে কে কর্ণপাত করে? যতদিন তুমি এ জগতে থাক, ততদিন কেবল ঐ মিথ্যা, তথা-কথিত মায়াজ্ঞান লইয়াই তোমায় থাকিতে

হয়। ঐ মিথ্যাজ্ঞান ত্যাগ করিলে, কোথায় তুমি অন্য সত্যজ্ঞান পাইবে? তবে কেন তুমি মায়াবাদের কুহকজালে পতিত হও? আরও দেখ, বেদান্তের মায়াবাদ দ্বারা লোকে সংসারাশ্রম ত্যাগ করতঃ বন জঙ্গলে গিয়া বাস করিতে শিক্ষা করে এবং সেইসঙ্গে পৃথিবীকে জঙ্গলাকীর্ণ করে। কিন্তু লোকে বিজ্ঞানানুশীলন করিয়া বন জঙ্গল পরিষ্কার করতঃ পৃথিবীকে নন্দনকানন ও প্রমোদোদ্যান করে। তবে কেন এই অত্যুজ্জ্বল বিংশ শতাব্দীতে মায়াবাদের কথা উত্থাপন করিয়া জিহ্বা অপবিত্র কর? ঐ সকল অশ্লীল, অশ্রোতব্য কথা যতই পুস্তক হইতে দূরীভূত হয়, সমাজের ততই মঙ্গল।

এখন সমাজে জড়বিজ্ঞানের অধিক প্রতিপত্তি ও সমাদর। অতএব উহারই উপদেশ শিরোধার্য্য করা সকলের কর্ত্তব্য।

সৃষ্টিরহস্য।

এ পৃথিবীর আদি কোথায়, ইহা কিরূপে সৃষ্ট বা উদ্ভূত, এই কূট প্রশ্নটী মীমাংসা করিবার জন্য মানব চিরদিন সাধ্যমত চেষ্টা করেন। যথার্থ বলিতে কি, সৃষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য তাঁহার কৌতুহলশিখা চিরপ্রদীপ্ত। সকল দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহার বিষয় সম্যক বর্ণিত। তন্মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে এতদ্‌সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত, তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্তোষলাভ হয় না। যখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বর্গের একান্তে বসিয়া বিশ্বসৃষ্টি করিতে মানস্ করেন, তখন তিনি আদেশ দেন "আলোক হউক" এবং তাঁহার আদেশানুযায়ী আলোক সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হয়। তৎপরে তিনি ছয়দিবস দিবারাত্র ঘোর পরিশ্রম করিয়া এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলাদি সমুদয় সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টি রচনা করিতে করিতে তিনি এতদূর ক্লান্ত হন, যে সপ্তমদিবসে তিনি বিশ্রামসুখ লাভ করেন। যে ধর্ম্ম দ্বারা আজ জগতে অত্যুজ্জ্বল সভ্যতা-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ, দেখ সেই ধর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের কি অপরূপ মহিমা ও গৌরব প্রকাশিত! তাহা না হইলে, খ্রীষ্টধর্ম্মের এত শ্রেষ্ঠতা কেন? কেন ইহার এত প্রশংসাবাদ ও সুখ্যাতিবাদ? রে মহামহিম খৃষ্টধর্ম্ম! তুমিই সংসারে

একমাত্র সত্য ধর্ম্ম! তুমিই সংসারে যথার্থ জ্ঞানালোক ও সভ্যতালোক বিতরণ করিতেছ! কিন্তু বল দেখি, জড়বিজ্ঞান আজ তোমার উপর কিরূপ মত প্রকাশ করে? দেখ এই জড়বিজ্ঞান তোমারই প্রিয়পুত্র, তোমার দ্বারাই ইহা লালিত ও পালিত; অথচ সেই জড়বিজ্ঞান আজ তোমার শিরচ্ছেদ করিতে খড়্গহস্ত। তোমার অলীক কথা শ্রবণে বিজ্ঞান হাস্য সম্বরণ করেনা এবং প্রকাশ্যভাবে বলে, "তুমি সংসারে গণ্ডমূর্খ বলিয়া এতদিন উপরোক্ত অসত্য প্রচার করিতেছ; এখন যদি তুমি নিজমঙ্গলপ্রার্থী হও, আমার কথায় কর্ণপাত কর এবং নিজের ভ্রমসংশোধন কর।" এস্থলে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদ করিবার জন্য, পুরাকালের দর্শনশাস্ত্র যেরূপ যত্নবান, আধুনিক জড়বিজ্ঞানও সেইরূপ যত্নবান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে সকল ক্রিয়াপরম্পরা বা ঘটনাপরম্পরা দ্বারা এ জগৎ সৃষ্ট বা ক্রমবিবর্ত্তিত, তাহা ধারাবাহিকরূপে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্পূর্ণ মানবমনের সাধ্যাতীত। এ বিষয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাহায্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গূঢ় রহস্যটী বুঝাইবার অনেক প্রয়াস পায়; কিন্তু বিজ্ঞান কিয়ৎ-দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াই অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হইতে দেখিয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এ বিষয়ে মনোরথ সিদ্ধ না হওয়ায়, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন, জগৎসৃষ্টি যেরূপ রহস্যময়, একটী পরমাণুসৃষ্টিও সেইরূপ রহস্যময়, তবে কেন বৃথা চেষ্টা?

কেহ কেহ বলেন, বিশ্বের সৃষ্টিও নাই, প্রলয়ও নাই, ইহা অনাদিকাল হইতে চলিত ও অনন্তকালস্থায়ী; কাল—কর্ম্ম-স্বভাব বশতঃ ইহা পরম্পরা চলিত। তাঁহারা বলেন, মানবমনের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমরা সকল বিষয়ের আদি অন্বেষণে ব্যগ্র হই বটে, কিন্তু আদিপ্রাপ্ত হওয়া আমাদের অসম্ভব। মনে কর, সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি; সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয় প্রলয়ের পূর্ব্বে সৃষ্টি; এরূপ যুক্তিতে আমরা কোন বস্তুর আদ্যন্ত পাই না। অতএব সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত বলাই শ্রেয়।

কালের আদিও নাই, অন্তও নাই, ইহা অনাদি ও অনন্ত। ব্রহ্মাণ্ডেরও প্রারম্ভ নাই, অন্তও নাই, ইহা সর্ব্বব্যাপী। আকাশেরও সেইরূপ আদিও

নাই অন্তও নাই, ইহা সর্ব্বময়। পৃথিবী যেমন গোলাকার, ইহার প্রারম্ভও নাই, অন্তও নাই; ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ গোলাকার, ইহারও প্রারম্ভ নাই, অন্তও নাই।

সৃষ্টিসম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের মনে একটা কুসংস্কার বদ্ধমূল। তাঁহারা ভাবেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই থাকে না। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ঈশ্বর ভৌতিক পদার্থগুলি ও ভৌতিকশক্তিগুলি সৃজন করেন এবং কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম স্থাপন করেন; ইহাতেই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্ট ও উদ্ভূত। সেইরূপ বোধ হয় প্রলয়ের প্রারম্ভে ভৌতিকপদার্থ গুলি ও ভৌতিক শক্তিগুলি নষ্ট হইবে এবং এক আধার ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান থাকিবে না। বস্তুতঃ সৃষ্টিপ্রক্রিয়াটী এমন সহজ নয়; আর চিরদিনই সৃষ্টিস্থিতিসংহার সমভাবে চালিত। যে ক্রমবিবর্ত্তন দ্বারা এ জগৎ সৃষ্ট, পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত, সে বিবর্ত্তনের বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই; উহা চিরদিন সমভাবে চালিত। এখন যে সকল ভৌতিক পদার্থ ও ভৌতিক শক্তি দেখা যায়, উহারাও মন্বন্তরে মন্বন্তরে পরিবর্ত্তিত। এজন্য সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চিরদিন আমাদের নিকট এত রহস্যময়।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মতে ব্রহ্মই বিশ্বের আদি ও অন্ত। তিনিই ইহার রচয়িতা, তিনিই ইহার উপাদানকারণ এবং তিনিই ইহার আধার। যে চিৎশক্তিযোগে বিশ্ব রচিত, ব্রহ্মই সেই চিৎশক্তির সমষ্টি। যে সকল উপাদানযোগে বিশ্ব রচিত, ব্রহ্মই সেই সকল উপাদানের সমষ্টি। যে অনন্ত, অসীম আধারে বা স্থলে বিশ্ব রচিত, ব্রহ্মই সেই আধারের সমষ্টি। যিনি মায়া যোগে বর্দ্ধিত হইয়া বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত, তিনিই ব্রহ্ম। "একোঽহং বহু স্যাম" তিনি অগ্রে এক থাকেন, পরে বহু হন। শাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করেন, যেমন উর্ণনাভ স্বীয় জাল স্বাভ্যন্তর হইতে নিঃসরণ করে এবং পুনরায় উহাকে স্বাভ্যন্তরে সঙ্কুচিত করে; সেই রূপ পরব্রহ্ম সৃষ্টিকালে বিশ্বপ্রপঞ্চকে স্বাভ্যন্তর হইতে প্রকটিত করেন এবং প্রলয়কালে উহাকে স্বাভ্যন্তরে লীন করিয়া লন। এস্থলে উর্ণনাভ ও তদীয় জালে পার্থক্য আছে, কিন্তু বিশ্ব ও ব্রহ্মে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই; একই ব্রহ্ম বর্দ্ধিত হইয়া বিশ্বে পরিণত। ব্রহ্মই আবার বিশ্বের অন্ত। প্রলয়কালে বিশ্বরচয়িতা সেই ব্রহ্মের চিৎশক্তি

জগৎ রচিত এবং এই স্থূলজগতের মূলদেশে সূক্ষ্ম বা অধ্যাত্মজগৎ বর্ত্তমান; উহাতে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারাই উপর হইতে নিম্নস্থ স্থূলজগৎকে পালন, পোষণ ও ধারণ করেন।

সৃষ্টি প্রকরণ লিখিবার পূর্ব্বে ইহার বিপরীত অবস্থা প্রলয়সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। প্রলয় দুই প্রকার (১) মহাপ্রলয় বা প্রাকৃতিক প্রলয় (২) নৈমিত্তিক প্রলয় বা খণ্ডপ্রলয়। মহাপ্রলয় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শতবৎসর আয়ুঃশেষে ও খণ্ডপ্রলয় তাঁহার দিবাবসানে প্রত্যেক কল্পের শেষে বা প্রত্যেক মন্বন্তরের শেষে সংঘটিত হয়। মহাপ্রলয়ে চতুর্দ্দশভুবন বা এই দৃশ্যমান জগৎ অসংখ্য অদৃশ্যজগতের সহিত লয়প্রাপ্ত হয় এবং খণ্ডপ্রলয়ে বিশ্বের স্থূলবিশেষ লয়প্রাপ্ত হয় মাত্র।

মহাপ্রলয়ে মায়াময়ী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া অব্যক্ত মূলপ্রকৃতিতে পরিণত হয় এবং ভবিষ্যৎসৃষ্টির উপাদান কারণ স্বরূপ অবস্থিতি করে। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি লোকসমূহ, যাহা বহুপূর্ব্ব হইতে সূক্ষ্মে পরিণত হইতে থাকে, তাহা মহাপ্রলয়কালে পরব্রহ্মরূপ মহাকাশে বিলীন হইয়া তমোময় আধার স্বরূপ রহিয়া যায়। যে চব্বিশতত্ত্ব লইয়া সাংখ্যকারগণ সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদ করেন, তৎসমুদায়ই তৎকালে অব্যক্ত মূলপ্রকৃতিতে বিলীন হয়। ব্রহ্মাদি দেবগণ পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মলোকাদি সকল লোকই তৎকালে নাশ প্রাপ্ত হয়। যথার্থ বলিতে কি, মহাপ্রলয়ের সে অবস্থাটী আমাদের কল্পনাতীত! সে অবস্থা যে কিরূপ, তাহা আমরা আদৌ ভাবিয়া উঠিতে পারি না। সে অবস্থা তমোময়, তমিস্রাময়; আর আলোকের অভাবে যে অন্ধকার দেখা যায়, তাহা মায়ারূপমাত্র; মহাপ্রলয়ে তাহাও থাকে না।

যেমন সুষুপ্তির অবস্থায় মনের মানসিক ক্রিয়া একেবারে রহিত হইয়া যায়; সেইরূপ মহাপ্রলয়েও পরব্রহ্মের চিৎশক্তির ক্রিয়া একেবারে রহিত হয়। মহাপ্রলয়ে পরব্রহ্মের সেই অব্যক্ত অবস্থাটী তোমার স্থূলমনের বোধগম্য করিবার জন্য, তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম্ম প্রলয়পয়োধি মধ্যে অনন্তকাল রূপ শেষনাগোপরি অধিশয়ান ও নিদ্রিত বিষ্ণুরূপ কল্পনা করে এবং জরায়ু-গর্ভে গর্ভোদক মধ্যে অধিশয়ান ভ্রূণের ন্যায় প্রলয়পয়োধি জলোপরি

অধিশয়ান নারায়ণরূপ কল্পনা করে। এরূপ কল্পনা ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই।

মহাপ্রলয়ে বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ, তাহা সকলের বুঝা উচিত। সকলেই মনে করেন, তৎকালে অখিল বিশ্ব একেবারে ধ্বংস হইয়া কেবল শূন্যময় ও তমোময় হয়। সাংখ্যকারেরা বলেন, সৃষ্টিরচনায় সাম্যাবস্থাপন্ন মূলপ্রকৃতি কেবল বিষম, বিমিশ্র ও জটিল অবস্থায় পরিণত হয়। সেজন্য যে সকল তত্ত্ব দ্বারা বিশ্ব রচিত, প্রলয়ের প্রাক্‌কালে সে সকল তত্ত্ব স্ব স্ব উৎপত্তিস্থলে লীন হইয়া সৃষ্টির বৈষম্যাবস্থা নাশ করতঃ সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়; যথা পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র অহংতত্ত্বে, অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হইয়া সকল তত্ত্বগুলি মূলপ্রকৃতিতে বিলীন হয়। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার তত্ত্বগুলি ক্রমবিবর্ত্তিত হয় এবং প্রলয়ে উহারা ক্রমসঙ্কুচিত হয়। এইরূপে সমগ্র বিশ্ব মহাপ্রলয়ে অব্যক্তাবস্থায় পরিণত হয়। এখন বিশ্বের এই অব্যক্তাবস্থাটী বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা আবশ্যক। দেখ, অম্লজন ও উদজন রাসায়নিক আকর্ষণে একত্রিত হইয়া উদক প্রস্তুত করে। সেই অম্লজন ও উদজন উদকাবস্থায় অব্যক্তভাবে থাকে। আমরা কদাচ বলিতে পারি না, উদকাবস্থায় উহাদের নাশ হয়; কারণ উদক পুনরায় বিশ্লিষ্ট করিলে, অম্লজন ও উদজন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইরূপ মহাপ্রলয়ে বিশ্বের ধ্বংস বা নাশ হয় না; উহা কেবল অব্যক্তাবস্থায় থাকিয়া যায়।

খণ্ডপ্রলয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিদ্রিত যান। তৎকালে যাবতীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জাদি নাশ প্রাপ্ত হয়।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।

গীতা।

"ব্রহ্মার রাত্রি হইলে, (খণ্ডপ্রলয়ে) জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জাদি লয় প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার দিন হইলে সকলে আবার উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে উহাদের উৎপত্তিও নাশ হয়।" খণ্ডপ্রলয় রুদ্রদেব কর্ত্তৃক সংকর্ষণাদি অগ্নিযোগে বা জলপ্লাবন দ্বারা সংঘটিত হয়। ইহাতে প্রকৃতি স্থলবিশেষে বা অংশবিশেষে বিপ্লবের পর বিপ্লব অতিক্রম করতঃ নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিব্যাদিকে

বিভিন্ন উন্নত জীবের বাসভূমি করিয়া দেয়। খণ্ডপ্রলয় দ্বারাই লিমুরিয়া ও আটলাণ্টিস মহাদ্বীপ-দ্বয় জলমগ্ন হয় এবং জম্বুদ্বীপ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয়।

শাস্ত্রমতে ব্রহ্মার শতবৎসর আয়ুর মধ্যে প্রথমার্দ্ধ অতীত। ইহা চতুর্থ বরাহকল্প এবং চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার মধ্যে সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার-কাল বা মন্বন্তর প্রবর্ত্তিত। ইহাতে বোধ হয়, ব্রহ্মাণ্ড আধুনিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কত প্রকার খণ্ডপ্রলয় অতিক্রম করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা হউক, যে স্থলে অসার খ্রীষ্টধর্ম্ম কেবলমাত্র ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরকে জগতের অন্তরালে বসাইয়া সপ্তদিবসে জগৎ সৃষ্টি করায় সে স্থলে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুবিমল জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া যুগযুগান্তর কত লক্ষ লক্ষ বৎসর নির্দ্দেশ করতঃ সৃষ্টি বিষয়ে যে সকল মহাসত্য নির্দ্দেশ করে, তাহা এখনও তোমার পূজ্যতম জড়বিজ্ঞান বুঝিতে অক্ষম অথবা অনেক অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের পর সবেমাত্র উহাদের আভাস পায় কেবল পাশ্চাত্য মূর্খেরাই কতকগুলি মিথ্যা উপদেশ দিয়া আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দেন। তাঁহাদেরই অত্যাচারে আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত গৌরব বুঝিতে পারি না। আমরা এখন কি ছাইভস্ম পড়িয়া শাস্ত্রোক্ত রত্নগুলিকে পদে দলন করিতে শিক্ষা করি। হায়! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, সৃষ্টিরচনা করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্ম একটী অত্যুজ্জ্বল হিরণ্ময় অণ্ড উৎপাদন করেন। তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন, অথবা তিনি ব্রহ্মের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া কমলযোনি নাম প্রাপ্ত হন। তিনি পদ্মকোষে অবস্থিতিপূর্ব্বক শতবৎসর পরব্রহ্মের তপ করিয়া তাঁহার নিকট সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন এবং প্রলয়পয়োধিজল পান করতঃ প্রজাসৃষ্টির জন্য ঋষি ও প্রজাপতিগণকে উৎপাদন করেন। তাঁহারাই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং তাঁহারাই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করেন। জনসাধারণকে সৃষ্টিপ্রক্রিয়াটী সহজ ভাষায় বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্রকারেরা রূপকভাবে ঐরূপ লিখিয়া যান। রূপক ভেদ করিয়া সামান্য কাল্পনিক উপাখ্যানের সত্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাও, বুঝিতে পারিবে, উহার ভিতর অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কি অনন্ত সত্য নিহিত!

এ স্থলে অণ্ড, পদ্ম প্রলয়পয়োধি প্রভৃতি যে কয়েকটী উপমাবাচক শব্দ ব্যবহৃত, উহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা উচিত। যেমন একটী ক্ষুদ্র অণ্ডের অভ্যন্তরস্থ সাম্যাবস্থাপন্ন স্ত্র্যণু পুরুষনিষিক্ত বীর্য্যের পুমণু সংযোগে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করতঃ কালসহকারে বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুশোভিত হইয়া একটী জীবে পরিণত; সেইরূপ বিশ্বের সাম্যাবস্থাপন্না ত্রিগুণা মূলপ্রকৃতি পুরুষনিষিক্ত তেজোরাশি দ্বারা বা পরব্রহ্মের চিৎশক্তি দ্বারা সংক্ষোভিত হইয়া পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করতঃ কালক্রমে অনন্তবৈচিত্র্যবিশিষ্ট আদ্যন্ত-বিহীন বিশ্বমণ্ডলে পরিণত। এজন্য অখিল বিশ্ব ব্রহ্মের অণ্ডস্বরূপ এবং ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড।

পদ্মের বীজে ভাবি উদ্ভিজ্জের অবয়বগুলি অব্যক্তাবস্থায় নিহিত এবং উত্তাপ ও জলযোগে বর্দ্ধিত হইয়া ইহা উদ্ভিজ্জে পরিণত হয়। সেইরূপ মূল-প্রকৃতিতে ভবিষ্যৎ বিশ্বের যাবতীয় উপাদান (সূক্ষ্ম আদিম ভৌতিকপদার্থ-গুলি) অব্যক্তাবস্থায় বর্ত্তমান এবং ইহাও চিৎশক্তিযোগে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রস্ফুরিত। এজন্য যে ব্রহ্মার বিরাট দেহ ত্রিখণ্ডিত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল বিরচিত, সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা শাস্ত্রে কমলযোনি বলিয়া উক্ত।

এখন কমলযোনি ব্রহ্মার প্রলয়পয়োধিজলে জন্মবৃত্তান্তটী বুঝিবার জন্য জরায়ুগর্ভে ভ্রূণের উৎপত্তিবিষয় ভাবা উচিত। স্ত্র্যণুর সহিত পুমণুর সংযোগ হইলে কিছুদিন পরে জরায়ু গর্ভোদকে (Liq Amnii) পূর্ণ হয় এবং উহাতে একটী জীব ভ্রূণরূপে দৃষ্ট হয়। ইহার নাভিদেশ নালীদ্বারা জরায়ুপুষ্পে সংলগ্ন থাকে। এই ভ্রূণ নিমীলিতাক্ষ হইয়া ধ্যানমগ্নবেশে কয়েক মাস জরায়ুগর্ভে বাস করে। সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়পয়োধিজলে ভাসমান হন এবং নিমীলিতাক্ষ হইয়া শতবৎসর পরব্রহ্মের ধ্যান করতঃ সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন। এস্থলে ভ্রূণের সহিত ব্রহ্মার এবং গর্ভোদকের সহিত প্রলয়পয়োধির তুলনা করা হয়। বস্তুতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে জলও থাকে না, স্থলও থাকে না এবং ব্রহ্মাও পরব্রহ্ম বা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হন না। যে প্রলয়পয়োধি পান করতঃ ব্রহ্মা সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ করেন, তাহা কেবল তমোগুণের আধিক্য। তমোগুণ বলবৎ হইয়া

প্রলয় উপস্থিত হয় এবং রজোগুণ বলবৎ হইয়া তমোগুণ নাশ করিলে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আরম্ভ হয়।

সৃষ্টিপ্রকরণে সাংখ্যকারদিগের মতামত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মতামত না উল্লেখ করিলে সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটিত হয় না। এস্থলে তাঁহাদেরই মত অনুসরণ করা যাউক। তাঁহারা মানবদেহের সৃষ্টি ব্যাখ্যান করিয়া বিশ্বসৃষ্টি ব্যাখ্যান করেন। ইহাতে তাঁহাদের কয়েকটী প্রধান উদ্দেশ্য দেখা যায়। (১) বিশ্ব যে সকল উপাদানে নির্ম্মিত, মানবদেহও সেই সকল উপাদানে নির্ম্মিত; মানবদেহ পরাৎপর পরব্রহ্মের ক্ষুদ্রমূর্ত্তি এবং বিশ্ব তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি। (২) বিরাটমূর্ত্তিনির্ম্মাণ হৃদয়ঙ্গম করা মানবের দুঃসাধ্য; মানবদেহ-নির্ম্মাণ মানবমন অসম্পূর্ণ হইলেও বুঝিতে সক্ষম। (৩) মানবমন ও মানব-দেহের সহিত বিশ্বের যে সকল সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সে সকল সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া উহাদের ভিতর যে সামঞ্জস্য দেখা যায়, তাহার বিষয় ভাবিলে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার গূঢ়রহস্য কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যায়। (৪) যখন মানব বর্ত্তমান, তখন তাঁহার সমক্ষে বিশ্বও বর্ত্তমান; যখন তিনি অবর্ত্তমান, তখন বিশ্বও তাঁহার সমক্ষে অবর্ত্তমান; যে জগতের কেন্দ্র সর্ব্বস্থলে এবং পরিধি কোথাও নাই, সে জগতের আমিই প্রকৃত কেন্দ্র; অতএব মানবদেহ সৃষ্টি বর্ণন করিলে বিশ্বসৃষ্টি বর্ণন করা হয়। (৫) যে সকল প্রক্রিয়াবলে সূক্ষ্ম ক্রমে স্থূলে বিবর্ত্তিত, অথবা যে সকল স্তর অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম ক্রমশঃ স্থূলে পরিণত, তাহা বর্ণন করিবার জন্য সহজ উপায় নাই; অতএব মানবমন ও মানবদেহের সৃষ্টি বর্ণন করিয়া সাংখ্যকারেরা সূক্ষ্মজগৎ ও স্থূলজগতের কথা কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যান করেন।

সাংখ্যমতানুযায়ী সৃষ্টিপ্রক্রিয়া উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, পুরুষ, প্রধান, ত্রিগুণ ও গুণক্ষোভ এই কয়েকটী শব্দের তাৎপর্য্য যথাসাধ্য বুঝা উচিত। "মূলপ্রকৃতি" বিশ্বের আদিম উপাদানসমষ্টি; ইহাই উঁহার উপা-দান কারণ এবং পরব্রহ্মের আবরণ মাত্র। সূক্ষ্ম মূলপ্রকৃতি ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া স্থূলপ্রকৃতিতে পরিণত। এস্থলে কেহ যেন এমন ভাবেন না, যে সকল ভৌতিক পদার্থ দ্বারা জগৎ নির্ম্মিত, উহাদের সমষ্টি মূলপ্রকৃতি। ভৌতিক পদার্থগুলি স্থূল, অতএব উহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু মূলপ্রকৃতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম। উহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অব্যক্ত। যে সকল সূক্ষ্ম আদিম

ভৌতিক পদার্থ ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক স্থূল ভৌতিকপদার্থে পরিণত, উহাদের সমষ্টি মূলপ্রকৃতি। "প্রধান" মূলপ্রকৃতির সৃষ্টিকালীন সাময়িক অবস্থামাত্র। প্রধান ও মূলপ্রকৃতিতে অত্যল্প প্রভেদ। উভয়েই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা। অণ্ড হইতে জীবোৎপাদনে স্ত্র্যণু যেরূপ ঘটনাপরম্পরা দ্বারা পরিণত ও পরিবর্ত্তিত বিশ্বরচনায়ও সেইরূপ মূলপ্রকৃতি ঘটনাপরম্পরা দ্বারা পরিণত ও পরিবর্ত্তিত।

পুরুষ পরব্রহ্মের চিৎশক্তি। স্ত্র্যণু যেমন পুম‌ণুর সংযোগ ব্যতীত পরিণাম প্রাপ্ত হয় না; সেইরূপ পরব্রহ্মের মূলপ্রকৃতি পুরুষরূপ তাঁহার চিৎশক্তির সংযোগ ব্যতীত পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। এস্থলে পুম‌ণুর সহিত পুরুষের তুলনা করা হয়। জড়বিজ্ঞানের মতে জড়বস্তুর পরমাণুগুলি যেরূপ জড়শক্তির যোগে ক্ষোভিত ও পরিণত মূলপ্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষযোগে ক্ষোভিত হইয়া পরিণাম, বিকার ও বৈষম্য প্রাপ্ত।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।

গীতা।

"স্বামীরূপে আমা দ্বারা বীর্য্য নিষিক্ত হইলে, প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব প্রসব করে এবং একারণে জগতের পরিবর্ত্তন ঘটে।"

মমযোনি মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।

গীতা।

"মূলপ্রকৃতিরূপ মহৎব্রহ্ম আমারই যোনি, তাহাতে আমি বীর্য্য নিষিক্ত করিয়া গর্ভাধান করি। তাহা হইতেই সকল ভূতের উৎপত্তি। সকল লোকে যে সকল জীবজন্তু ও ভূতাদি উৎপন্ন, সেই সকলের প্রধান যোনি বা উৎপত্তিস্থল মূলপ্রকৃতিরূপ ব্রহ্ম এবং আমিই তাহাদের বীজপ্রদ পিতা।" এস্থলে সকলের বুঝা উচিত যে, মূলপ্রকৃতি ও চিৎশক্তি লইয়াই ব্রহ্ম এবং মূলপ্রকৃতি ব্রহ্মের আব-

রূপমাত্র। ব্রহ্ম নিরুপাধি; কিন্তু প্রধান ও পুরুষ নিরুপাধি ব্রহ্মের উপাধি-বিশিষ্ট রূপমাত্র।

এখন ত্রিগুণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? স্থূল জগতের যাবতীয় বস্তু উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; আবার প্রত্যেক বস্তু উপরোক্ত তিন গুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ অবস্থাভেদে একই বস্তু উত্তম, মধ্যম ও অধম জ্ঞান করা যায়। এই প্রকার যুক্তি অনুসরণ করিয়া সাংখ্যকার সত্ত্বরজস্তম প্রকৃতির ত্রিগুণ আবিষ্কার করেন; অথবা এই মতটী অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে গৃহীত। যাহা হউক প্রকৃতির ত্রিগুণ স্থূলজগত প্রকটিত তিনগুণের সূক্ষ্মরূপমাত্র। ইহারা পরব্রহ্মের আদ্যাশক্তি মায়ার ত্রিগুণ। ইহাদের অনন্ত লীলাবশতঃ সংসারে অনন্ত বৈচিত্র্য ও অনন্ত প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

সত্ত্বংরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।
রজো রাগাত্মকং বৃদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।
তমস্ত্বজ্ঞানং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্
প্রমাদালস্যনিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত।

গীতা।

"প্রকৃতিসম্ভব বা মায়োদ্ভূত সত্ত্বরজস্তম এই গুণত্রয় জীবদেহে অক্ষয় জীবাত্মাকে নিবদ্ধ ও জড়িত করিয়া রাখে। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত স্বয়ং প্রকাশিত ও দোষস্পর্শশূন্য এবং ইহা জীবাত্মাকে সুখে ও জ্ঞানে যুক্ত করে। সত্ত্বগুণই জীবাত্মার প্রকৃত সুখ ও জ্ঞানের আকর। রজোগুণ অনুরাগ স্বরূপ; ইহা হইতে অভিলাষ ও আসক্তি জন্মে এবং ইহা জীবাত্মাকে কর্ম্মে আবদ্ধ করে। তমোগুণটী অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন; ইহা দ্বারা সকল জীবজন্তু মোহিত এবং ইহা জীবাত্মাকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রায় অভিভূত করে। সকল অমঙ্গলের কারণ তমোগুণ।"

উপরোক্ত গুণত্রয় ক্ষোভিত হইলে, প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হয়। যেমন জড়বিজ্ঞানের মতে প্রকৃতিজগতে পরমাণু ও জীবাণু ক্ষোভিত হইয়া পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়, সেইরূপ সূক্ষ্মজগতেও উপরোক্ত ত্রিগুণ ক্ষোভিত হইলে সূক্ষ্ম মূলপ্রকৃতি পরিণাম ও বিকার প্রাপ্ত হয় এবং পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করতঃ বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য, যখন ত্রিগুণ সূক্ষ্ম বস্তু বা বস্তুর মনোগ্রাহ্য অবস্থা বা সংজ্ঞা ও প্রকৃত পদার্থ নহে, তখন উহারা কি প্রকারে ক্ষোভিত বা আন্দোলিত হয়? দুগ্ধের ক্ষোভনে বা মন্থনে নবনীত উৎপন্ন, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। কিন্তু গুণক্ষোভ শব্দের অর্থ অন্যরূপ। যেমন কোন বিষয় পুনঃ পুনঃ মনে আন্দোলিত হইলে, উহা হইতে কোন সার-বস্তু বাহির করা যায়, সেইরূপ সূক্ষ্মজগৎব্যাপী মূলপ্রকৃতির সূক্ষ্ম ত্রিগুণ ক্ষোভিত বা পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইলে, মূলপ্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে উহা সাম্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিভিন্ন ও বিষম হইতে আরম্ভ হয়। মহাপ্রলয়ে মূলপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপ নিশ্চেষ্ট থাকে এবং উহার গুণত্রয় কিছুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করে না। তৎকালে উহারা স্পন্দ-রহিত হইয়া মৃতবৎ থাকে। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে পুরুষের তেজ মূলপ্র-কৃতিতে সংক্রামিত হইলে, উহার গুণক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং উহাও এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। এস্থলে মনের ক্রিয়ার সহিত গুণের ক্রিয়ার তুলনা করা হয়।

এখন সাংখ্যকারদিগের মতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণন করা যাউক। গুণক্ষোভ বশতঃ মূলপ্রকৃতির প্রথম পরিণামে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন। মহত্তত্ত্ব আর কিছুই নয়, কেবল বিশ্বব্যাপিনী বুদ্ধিশক্তির বীজস্বরূপ মূলীভূত কারণ বা সমষ্টি। ইহা দ্বারা নির্গুণ ও অব্যক্ত পরব্রহ্ম সগুণ ও ব্যক্ত হইয়া মানবমনের ভাব্য হন স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রত্যেক বস্তুতে যে অলৌকিক বুদ্ধিশক্তি অন্ত-নির্হিত এবং যাহার বলে সমগ্র জগৎ একোদ্দেশ্যসাধনের জন্য ক্রমশঃ অগ্রসর, সেই অসীম বুদ্ধিশক্তি মহত্তত্ত্ব হইতে যাবতীয় পদার্থে প্রতিভাত; যেমন এক-মাত্র সূর্য্যদেব বিশ্বের তমোনাশ করতঃ যাবতীয় পদার্থকে আলোক প্রদান করে, সেইরূপ মহত্তত্ত্বও বিশ্বের যাবতীয় পদার্থকে অল্পাধিক বুদ্ধিশক্তি প্রদান করে। গুণভেদে মহত্তত্ত্ব ত্রিবিধ সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ইহারাই

হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে পূজিত। ইহাই বিশ্বের ও বিশ্বস্থ প্রত্যেক পদার্থের প্রথম সূক্ষ্মতম আবরণ। ইহাই সূক্ষ্ম স্থূলে পরিণত হইবার প্রথম স্তর। জীবদেহে যে চৈতন্য প্রভাবে নেত্রদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণ, রসনা দ্বারা আস্বাদন ও ত্বক দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান হয় এবং মনদ্বারা অনন্ত চিন্তা করা যায়, সেই চৈতন্য মহত্তত্ত্বের আংশিক বিকাশ মাত্র।

গুণক্ষোভবশতঃ প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণামে অহংতত্ত্বের উৎপত্তি। যে জ্ঞান দ্বারা সকলের আত্মাভিমান বা আমিত্বজ্ঞান জন্মে, তাহাই অহংতত্ত্ব ; অহংতত্ত্বটী মহত্তত্ত্বকে আবৃত করিয়া বিশ্বের দ্বিতীয় আবরণ স্বরূপ হয়। সত্য বটে, ইহা জঙ্গমে যতদূর প্রকটিত, স্থাবরে ততদূর নহে, তথাচ ইহা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। গুণভেদে অহংতত্ত্ব আবার ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। অহং-তত্ত্বের সাত্ত্বিক অংশ বিকৃত হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, রাজসিক অংশ বিকৃত হইয়া দেহের ইন্দ্রিয়গণ ও তামসিক অংশ বিকৃত হইয়া জগতের পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত উৎপাদন করে। এক অহংতত্ত্বের ত্রিবিধগুণের পরিণাম বশতঃ মন, ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চভূত সৃষ্ট হওয়ায় জগতে সর্ব্বত্র সার্ব্বজনিক সামঞ্জস্য স্থাপিত।

অহংতত্ত্বের তামসিক অংশ ক্ষোভিত হইলে, প্রথমে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন ; পরে শব্দতন্মাত্র ক্ষোভিত হইলে, শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ উৎপন্ন এবং উহা মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্বকে আবৃত করিয়া বিশ্বের তৃতীয় আবরণস্বরূপ হয়। আকাশ ক্ষোভিত হইলে প্রথমে স্পর্শতন্মাত্র উৎপন্ন; পরে স্পর্শতন্মাত্র ক্ষোভিত হইলে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু উৎপন্ন এবং উহা মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব ও আকাশকে আবৃত করিয়া জগতের চতুর্থ আবরণস্বরূপ হয়। বায়ু ক্ষোভিত হইলে প্রথমে রূপতন্মাত্র, পরে রূপগুণবিশিষ্ট জ্যোতিঃ উৎপন্ন এবং উহা মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, আকাশ ও বায়ুকে আবৃত করিয়া জগতের পঞ্চম আবরণ-স্বরূপ হয়। জ্যোতিঃক্ষোভিত হইলে, প্রথমে রসতন্মাত্র, পরে রসগুণবিশিষ্ট সলিল উৎপন্ন এবং উহা মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু ও জ্যোতিকে আবৃত করিয়া জগতের ষষ্ঠ আবরণস্বরূপ হয়। সলিল ক্ষোভিত হইলে, প্রথমে গন্ধতন্মাত্র, পরে গন্ধগুণবিশিষ্ট পৃথিবী উৎপন্ন এবং উহা মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ ও সলিলকে আবৃত করিয়া জগতের সপ্তম আবরণস্বরূপ

হয়। এইরূপে অহংতত্ত্বের তামসিক অংশ হইতে জগতের পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত সৃষ্ট। ইহাতেই জানা যায়, তমোগুণের আধিক্য হইয়া কি প্রকারে সূক্ষ্ম ক্রমশঃ স্থূলে পরিণত।

অহংতত্ত্বের রাজসিক অংশ ক্ষোভিত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন। ইন্দ্রিয়গুলি দুই প্রকার, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক, এ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ ও বাক্ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা মন বাহ্যজগতের জ্ঞানলাভ করে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা মন বাহ্যজগতের নানাবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য সৃষ্টি বিষয় লিখিতে গিয়া জীবদেহের ইন্দ্রিয়োৎপত্তির বিষয় কেন লিখিত হইল? শাস্ত্রকারেরা অণ্ডের আদর্শে বিশ্বরূপ ব্রহ্মের অণ্ডের সৃষ্টি বর্ণন করেন বলিয়া, অণ্ড হইতে একটী জীব বিবিধেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি কিরূপে সূক্ষ্মভাবে উৎপন্ন হইয়া অণ্ডে অব্যক্তাবস্থায় থাকে, তাহাই তাঁহারা এস্থলে দেখান। তাঁহারা ব্যষ্টিভাবে ইন্দ্রিয়োৎপত্তি বর্ণন করিয়া সমষ্টিভাবে জগতের ইন্দ্রিয়োৎপত্তি বর্ণন করেন মাত্র। ইন্দ্রিয়গুলি জঙ্গমে যতোধিক স্ফুরিত, স্থাবরে তেমনি অস্ফুরিত।

অহংতত্ত্বের সাত্ত্বিক অংশ ক্ষোভিত হইলে, মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ উৎপন্ন। ইহাতে বোধ হয়, মন মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইলেও বস্তুতঃ ইহা কেবল এ স্থূল জগতের বস্তু নয়, ইহা অধ্যাত্মজগতের বস্তু। ইন্দ্রিয়গুলির অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ যথা, সূর্য্য চক্ষুর, দিকপাল কর্ণের, পবন ত্বকের, প্রচেতা জিহ্বার, অশ্বিনীকুমার নাসার, মিত্র পায়ুর, প্রজাপতি উপস্থের, ইন্দ্র করের, বিষ্ণু পদের এবং বহ্নি বাক্যের দেবতা। এই সকল দেবগণ স্ব স্ব অধিকারে থাকিয়া যাবতীয় জীবের ইন্দ্রিয়গুলি চালান এবং এক উদ্দেশ্যসাধন করিয়া জগতে বিশ্বজনীন সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। এখন ত্রিগুণাত্মক অহংতত্ত্ব একদিকে সত্ত্বগুণসংযোগে মন, অন্যদিকে তমোগুণসংযোগে তন্মাত্রগুলি এবং মধ্যে রজোগুণসংযোগে ইন্দ্রিয়গুলি উৎপাদন করায়, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইন্দ্রিয়গণ কি প্রকারে তন্মাত্ররূপ উহাদের বিষয়গুলি গ্রহণ করতঃ মনের বিষয়ীভূত করে এবং কি প্রকারে মনের সহিত বাহ্যজগতের অশেষ সামঞ্জস্য স্থাপিত।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা পঞ্চতন্মাত্র। ইহারা ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য বিষয় এবং যাবতীয় পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ। মহাভূতের অন্তর্গত অতীব সূক্ষ্ম অংশকে ইহার তন্মাত্র বলা যায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটী মহাভূত। জগতের যাবতীয় পদার্থ ইহাদের দ্বারা বিরচিত। যেমন জীবদেহে পঞ্চেন্দ্রিয়, তেমনি ইহাদের বিষয়ও পঞ্চ এবং বিষয়ের আশ্রয়ভূত মহাভূতও পঞ্চ। এই প্রকারে বাহ্যজগতের সহিত জীবদেহের সাক্ষ্যজনক সামঞ্জস্য স্থাপিত। যে মন্বন্তরে জীবে যে কয়েকটী ইন্দ্রিয় স্ফুরিত, সে মন্বন্তরে সেই কয়েকটি বিষয়ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে জীবদেহের যেমন পাঁচটী ইন্দ্রিয়, ইহাদের বিষয় বা তন্মাত্রও তেমনি পাঁচটী। আগত মন্বন্তরে যখন জীবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্ফুরিত হইবে, তখন ইহার বিষয়ও আর একটী বাড়িবে।

এস্থলে বক্তব্য, স্থূলাবয়ব বিশিষ্ট পৃথিবী সলিল, অগ্নি ও বায়ু, যাহা আমাদের সচরাচর নয়নগোচর হয়, তাহা দার্শনিকদিগের মহাভূত নহে। পৃথিবীর গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মরূপকে পৃথিবী নামক মহাভূত বলা হয়; বস্তুতঃ যে পৃথিবীর উপর সকলে দণ্ডায়মান, তাহা মহাভূত নহে, তাহা পঞ্চ মহাভূতে নির্ম্মিত। সেইরূপ যে সলিল পান করিয়া সকলে জীবনধারণ করে, তাহা মহাভূত নহে, তাহাও পঞ্চমহাভূতে নির্ম্মিত।

সাংখ্যমতে সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য চেষ্টা করা গেল বটে, কিন্তু সাংখ্যমতের গভীরতমপ্রদেশে প্রবেশ করা গেল না। মহামহিম কপিলদেব কিরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া ঐ সকল মহাসত্য আবিষ্কার করেন, তাহা এখন বুঝা অতীব সুকঠিন। বোধ হয়, যোগাসক্ত কপিলদেব যোগবলেই জগতের আদ্যন্তর অবগত হন। তিনি যাহা লিখিয়া যান, তাহা সকলেই অধ্যয়ন করেন বটে; কিন্তু অল্প লোকেই উহার অন্তঃপ্রবেশ করেন। "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং" এ কথার আজ পর্য্যন্ত খণ্ডন হয় নাই এবং কদাচ খণ্ডন হইবে না। সাংখ্যমতটী যাবচ্চন্দ্রদিবাকর জ্ঞানজগতে দেদীপ্যমান থাকিবে। যে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্ম্মের চতুর্ব্বেদ ও জাতিভেদপ্রথা অমান্য করেন, তিনিও সাংখ্যমতের সমক্ষে নতশির হন; এমন কি ঐ মত লইয়াই তিনি নিজধর্ম্ম জগতে প্রচার করেন।

সাংখ্যকারদিগের মহত্তত্ত্বাদি চতুর্বিংশ তত্ত্বের সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক সৃষ্টি বলে এবং ঐ চতুর্বিংশতত্ত্ব লইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ যে সৃষ্টি রচনা করেন, তাহা বৈকারিক সৃষ্টি। মহত্তত্ত্বাদি চতুর্বিংশতত্ত্বে বিশ্বরূপ অণ্ড উৎপন্ন হইলে পর, লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং উহাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার হৃদয়াকাশে সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞান পরব্রহ্ম হইতে প্রতিভাত হয়। তৎপরে অণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া যায়, একখণ্ডের নাম ব্রহ্মবাক্, দ্বিতীয় খণ্ডের নাম ব্রহ্মবিরাজ। ব্রহ্মবাক্ই সৃষ্টিবিষয়ক পূর্ণজ্ঞান এবং ব্রহ্ম বিরাজ হইতে সমগ্র জগৎ ও অন্যান্য লোক নির্ম্মিত। বিভিন্ন প্রজাসৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দশটী মানস পুত্র সৃজন করেন; তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রে ঋষি ও প্রজাপতি নামে কথিত; বৌদ্ধদিগের ভিতর তাঁহারা ধ্যানীবুদ্ধ এবং ইহুদিদিগের ভিতর তাঁহারা সেফিরথ নামে উক্ত। ইঁহারাই সৃষ্টির আদ্যশক্তি রূপে ব্রহ্মোদিত সৃষ্টিজ্ঞানকর্ত্তৃক প্রনোদিত হইয়া বিবিধ উপাদানসংযোগে বিশ্বসৃষ্টি করেন। সর্ব্বপ্রথম সূক্ষ্ম জগৎ সৃষ্ট হয়; তাহাতে স্থূলত্বের গন্ধবাষ্প কিছুমাত্র থাকে না। আজকাল পৃথিবীর জড়বস্তু যে সকল ভৌতিক পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত ও যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বারা চালিত, সূক্ষ্মজগতে উঁহারা থাকে না; কিন্তু উহাদের সূক্ষ্ম আদিপুরুষগণ বর্ত্তমান থাকে। বিগত কয়েক মন্বন্তরে সেই সূক্ষ্মজগৎ ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া স্থূলজগতে পরিণত ভৌতিকপদার্থগুলি সৃষ্ট এবং জগতের অধিবাসিগণও সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূলত্ব প্রাপ্ত। এখন কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করিয়া এবং কোন্ কোন্ মহাশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া সূক্ষ্ম-জগৎ ক্রমশঃ স্থূলজগতে পরিণত এবং সূক্ষ্ম দেবরূপী মানব আধুনিক স্থূলকায় মানবে পরিণত, তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে একেবারে অসাধ্য। আমাদের পক্ষে ইহা জানাই যথেষ্ট, যে পৃথিবী আধুনিক অবস্থায় সৃষ্ট হয় নাই, সূক্ষ্ম জগৎ হইতেই স্থূলজগতের উৎপত্তি, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিরাম নাই, ক্রমবিবর্ত্তন (Evolution) দ্বারা ইহা চিরদিন চালিত ও পরিবর্ত্তিত এবং পরিশেষে স্থূলজগৎ পুনরায় সূক্ষ্মজগতে পরিণত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইবে।

দর্শনশাস্ত্রমতে জগতের যাবতীয় পদার্থ, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলই পঞ্চমহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত। আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞান এই দার্শনিক মতের উপর পদাঘাত করতঃ সাহঙ্কারে উপদেশ দেয়, জগতে যে সোত্তর

প্রকার ভৌতিক বর্ত্তমান তাহা দ্বারাই যাবতীয় পার্থিব পদার্থ নিৰ্ম্মিত। এখন নবযুগের নব্যসম্প্রদায়বর্গ নববিজ্ঞানের পক্ষপাতী; যেহেতুক বিজ্ঞান যে সকল চাক্ষুস প্রমাণ দেয়, তাহা কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না. এজন্য তাঁহারা ভাবেন, দার্শনিকদিগের মতটা সৰ্ব্বৈব অনুমানসিদ্ধ ও কাল্পনিক। এখন জিজ্ঞাস্য, যে কপিলদেব যোগবলে জড়জগতের আদ্যন্তর অবগত হন, তাঁহারই মত কি মিথ্যা? আর যাঁহারা দুইটা বকযন্ত্র ও রিটর্ট (Retort) লইয়া পরীক্ষাগারে কতকগুলি পদার্থ বিশ্লিষ্ট করতঃ তথাকথিত ভৌতিক পদার্থ আবিষ্কার করেন, তাঁহাদেরই মত কি মহাসত্য? যে স্থূলদর্শী জড়বিজ্ঞান পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যস্তরটী অনুশীলন করিয়া ও ঐকদেশিক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া কতকগুলি ঐকদেশিক সিদ্ধান্ত করে, তাহারই কথা অখণ্ডনীয় জ্ঞান করা উচিত? আর যে দর্শন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া এতদিন জগতে ঐ সকল মহাসত্য প্রচার করে, তাহাই কি একেবারে মিথ্যা ও ভ্রমসঙ্কুল জ্ঞান করা উচিত? তবে দর্শন ও বিজ্ঞানের বিবাদ কি প্রকারে ভঞ্জন করা উচিত?

তত্ত্ববিদ্যা উপদেশ দেয়, জড়পদার্থের প্রকৃতি বস্তুতঃ সপ্তধা; তন্মধ্যে আমরা কেবল ইহার বাহ্যস্তরটী বুঝিতে পারি এবং অন্যান্য স্তর আদৌ বুঝিতে পারি না। অতএব যে দর্শন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া পদার্থের আদ্যন্তর বর্ণন করে, তাহা কদাচ অবিশ্বসনীয় হইতে পারে না এবং যে বিজ্ঞান জড়পদার্থের বাহ্যস্তর মাত্র অনুশীলন করে, তাহার কথাও একমাত্র বিশ্বসনীয় হইতে পারে না।

সত্যবটে. অসাধারণ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ বলে ভৌতিক পদার্থগুলি বিজ্ঞান কর্ত্তৃক জগতে আজ আবিষ্কৃত এবং কি প্রকারে উহাদের সংযোগে ও বিয়োগে রাসায়নিক আকর্ষণের তারতম্য বশতঃ বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ উৎপাদিত, তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরূপিত; কিন্তু আজকাল অনেক রাসায়নিক পণ্ডিতের বিশ্বাস, যেমন জড়জগতের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলি এক মহাশক্তির রূপান্তর বা বিকার, সেইরূপ জগতের যাবতীয় ভৌতিক পদার্থও কোন এক মহাভূতের রূপান্তর মাত্র। তাঁহারা সেই মহাভূতকে প্রোটিল (Protyle) নামে অভিহিত করেন। দর্শনপ্রতিপাদিত মহাভূত পৃথিবীকে

প্রোটল বলা যাইতে পারে। ইহাতেই দর্শন ও বিজ্ঞানের বিবাদ কিয়ৎ পরিমাণে ভঞ্জন করা যায়।

মহাত্মাগণ বলেন, প্রত্যেক কল্পে বা জীবপ্রবাহে পঞ্চমহাভূতের মধ্যে এক একটী মহাভূত ইহার বাহ্যরূপে জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। এখন চতুর্থ কল্প প্রবর্ত্তিত ; এখন পঞ্চ মহাভূতের ভিতর চারিটী মহাভূত জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং পঞ্চম মহাভূত আকাশ এখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় নাই। জড়বিজ্ঞানও অনুমানবলে আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং ইহাকে ইথার (Ether) নামে অভিহিত করে। এই আকাশের গুণাগুণ বুঝিতে পারিয়া যোগসিদ্ধ মহাত্মারা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। সূর্য্যের সুষুম্নাদি যে সাত প্রকার রশ্মি বর্ত্তমান, উহারা আকাশের উপাধি এবং উহাদের দ্বারাই জড়-শক্তি জড়বস্তু সংযোগে জড়জগতে প্রকাশিত। সকলেই আকাশকে শূন্য জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা অনন্তগুণে গুণান্বিত। অনন্ত মহা-কাশ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত বা অভিব্যাপ্ত। পরমাণু হইতে অগণ্য নক্ষত্র মণ্ডল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আকাশ সমভাবে বর্ত্তমান। লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত গ্রহনক্ষত্রগণ আকাশ দ্বারাই পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ ও সর্ব্ব প্রকারে আকৃষ্ট। সূর্য্য আকাশ দ্বারাই পৃথিবীকে আলোকিত করে ও জীবসমূহে পূর্ণ করে। এইরূপ তত্ত্ববিদ্যা নানা কথার উল্লেখ করে ; কিন্তু স্থূলদর্শী বিজ্ঞান উহাদিগকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেয় এবং উহাদিগকে আদৌ বুঝিতে পারে না। তবে আমরাই বা কি প্রকারে বিজ্ঞানের কথায় কর্ণপাত করিয়া দর্শনের কথা একেবারে অবিশ্বাস করি ?

যে জড়বিজ্ঞান দর্শনের উপর উপহাস ও বিদ্রূপ করে এবং যাহার উপর লোকের বিশ্বাস এখন ক্রমশঃ বদ্ধমূল, সেই বিজ্ঞান কি প্রকারে সৃষ্টি-রহস্যোদ্ভেদ করে, তাহা এস্থলে বর্ণনা করা আবশ্যক। ইহার মতে এই জড়জগৎ কতকগুলি অনাদি অবিনশ্বর ভৌতিক পদার্থ দ্বারা বিরচিত। ঐ সকল ভৌতিক পদার্থের পরমাণুরাশি কতকগুলি অন্তর্নিহিত অবিনশ্বর জড়শক্তির সংযোগে ও বিয়োগে, সংঘট্টনে ও বিঘট্টনে, আকর্ষণে ও বিকর্ষণে বিভিন্নরূপে পুঞ্জীকৃত, রূপান্তরিত, পরিবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হওয়ায় জড় জগ-তের যাবতীয় পদার্থ নির্ম্মিত ও বিরচিত। কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া

এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চলিত, তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই এবং কতকাল এইরূপ চলিবে তাহারও কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই। এই প্রক্রিয়াবলে জড়জগৎ সাম্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিষম, বিমিশ্র ও জটিল অবস্থায় পরিণত।

বিজ্ঞান অনুমান করে, কল্পনাতীত যুগ পূর্ব্বে বাষ্পময় ব্রাহ্মাণ্ড ঘূর্ণায়মান। তৎকালে যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ বাষ্পাকারে অনন্ত আকাশে অভিব্যাপ্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ঘূর্ণনহেতু বাষ্পরাশি স্থানে গাঢ় ও স্থানে তরল হয়। গাঢ়াংশের বেগাতিশয্য বশতঃ তরলাংশ উহার পশ্চাৎ-পদ হয় এবং ক্রমশঃ বিযুক্ত হইয়া উহা হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। অনন্তর তরলরাশি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ঘূর্ণনবশতঃ গাঢ় রাশিকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এইপ্রকারে সূর্য্য ও গ্রহগণ উৎপন্ন এবং গ্রহগণ সূর্য্যের পুত্রস্বরূপ। এক একটী তরল রাশি হইতে আবার যাহারা বিচ্ছিন্ন হয়, তাহারা উহার পরিধিক্ষেত্রে উপগ্রহরূপে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। এইপ্রকারে চন্দ্রাদি উপগ্রহগণ উৎপন্ন।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ যতই আকাশে বিকীর্ণ হইয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, ততই উহার বাহ্যস্তর কঠিন হইয়া দুগ্ধসরের ন্যায় জমাট বাধিয়া যায় এবং অভ্যন্তরীণ তরল পদার্থও গাঢ় হইতে থাকে। ইহাতেই পৃথিবীর ব্যাস ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। উপরিস্থিত বায়ুর ভারবশতঃ পৃথিবীর পৃষ্ঠস্তর উহার ব্যাসসঙ্কোচন অনুসরণ করে। পৃষ্ঠস্তরটী সকল স্থানে সমভাবে সঙ্কুচিত হয় না; সে জন্য স্থলবিশেষে স্থানচ্যুতি ও ব্যতিক্রম ঘটিয়া নিম্নতল ক্ষেত্রগুলি উৎপাদন করে। ভূপৃষ্ঠে বায়ুবিলীন বারিবাষ্প শীতলতাপ্রযুক্ত জলরূপে পরিণত হইয়া নিম্নতলক্ষেত্রগুলি অধিকার করে এবং উহাদিগকে ক্রমশঃ সাগরাদিতে পরিণত করে। বৃষ্টিপাতে উচ্চস্থানগুলি ধৌত হইয়া নিম্নস্থল অধিকার করে এবং ভূপৃষ্ঠের উপর উহা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া যায়। জলোৎপত্তির পর পৃথিবীতে জীবও উৎপন্ন। এখন কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া উপরোক্ত ঘটনাবলি সংঘটিত, তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই।

এ স্থলে জগৎ-বিখ্যাত পণ্ডিতবর হারবর্ট স্পেনসার সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদে প্রবৃত্ত হইয়া কি লিখিয়া যান, তাহার উল্লেখ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

The ultimate mystery continues as great as ever. The problem of existence is not solved ; it is simply removed further back. The Nebular hypothesis throws no light on the origin of diffused matter and diffused matter as much needs accounting for as the concrete matter. The genesis of an atom is not easier to conceive than the genesis of a planet. Nay, indeed so far from making the universe a less mystery than before, it makes it a greater mystery.

"চরমরহস্য যেমন তেমনি রহিয়া গেল। জীবনের কূটপ্রশ্ন মীমাংসিত হইল না। কেবলমাত্র ইহাকে পশ্চাতে প্রক্ষেপ করা হইল মাত্র আকাশব্যাপ্ত বিক্ষিপ্ত ভৌতিকপদার্থ কোথা হইতে আসিল, নেবুলার মত উহার প্রকৃত কারণ দেখাইতে পারে না। যৌগিক পদার্থ ও বিক্ষিপ্ত পদার্থের কারণ নির্দ্দেশ করা সমভাবে অত্যাবশ্যক। একটী গ্রহের উৎপত্তি যেরূপ রহস্যময়, একটী পরমাণুর উৎপত্তিও তেমনি রহস্যময়। যথার্থ বলিতে কি, আমি যাহা লিখিলাম, তাহাতে সৃষ্টি রহস্যোদ্ভেদ না করিয়া উহাকে আরও রহস্যময় করিলাম।"

যাহা হউক, এই স্থলেই জড়বিজ্ঞানের সকল দর্প চূর্ণ। ইহার এত আস্ফালন ও এত অভিমান, সকলই আজ পণ্ড ও বৃথা। যে বিজ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল প্রভায় আজ পাশ্চাত্য জগৎ দীপ্যমান, সেই বিজ্ঞান আজ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের নিকট নিষ্প্রভ ও নিরুত্তর। এখন জিজ্ঞাস্য, বিজ্ঞান যে বিষয়টী ভালরূপ বুঝিতে পারে না এবং যাহা বুঝিবার জন্য ইহার সহস্র চেষ্টা বিফল সে বিষয়ে দর্শন যাহা উপদেশ দেয়, বিজ্ঞান তাহা কেন খণ্ডন করিতে ও এক তুড়িতে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পায়? কতকগুলি ঐকদেশিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান যে সকল ঐকদেশিক সিদ্ধান্ত করে, তাহাদের সহিত দর্শনপ্রতিপাদিত সত্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় বলিয়া বিজ্ঞান যে দর্শনের সকল কথাই উড়াইয়া দিবে, তাহা কেমন করিয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করা যায়? অতএব দর্শনের কথা আমাদের সম্যক শিরোধার্য্য।

যে ধনশালী বিজ্ঞান দীনদরিদ্র দর্শনের উপর নানা বিষয় লইয়া উপহাস

করে, সেই বিজ্ঞানের দর্প চূর্ণ দেখিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলে, যে "সভ্যতাভিমানী জড়বিজ্ঞান্! তুমি যে বাহ্যসভ্যতাবৃদ্ধির প্রলোভন দেখাইয়া লোকবর্গকে নিজ কুহকে মোহিত কর, তুমি তাহা লইয়াই চিরদিন ব্যস্ত থাক; কেন তুমি জীবনের কূটপ্রশ্ন মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাও? ওদিকে তোমার বুদ্ধি আদৌ স্ফূরিত হইবে না। তুমি সামান্য বকযন্ত্রাদি লইয়া চিরদিন বাল্য-লীলায় ব্যাপৃত থাক, ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ; আর জীবনের গভীর চিন্তায় কদাচ মনোভিনিবেশ করিও না, উহাতে কিছুমাত্র সারবত্তা নাই।"

পরিশেষে বক্তব্য, অধ্যাত্মবিজ্ঞান, দর্শন ও জড়বিজ্ঞানের মতে সৃষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করা গেল বটে; কিন্তু রহস্য উদ্ঘাটিত হইল না এবং মনও সন্তোষ লাভ করিল না। মানবমন যেরূপ অসম্পূর্ণ, তাহাতে এ বিষয়ে আমাদের সকল চেষ্টাই বৃথা। যাহা হউক, এবিষয়ে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কথাই আমাদের শিরোধার্য্য করা আবশ্যক।

মানব সৃষ্টি।

যে মানব আজ সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, তিনি কোন্ যুগে উদ্ভূত, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য। এতদর্থে অসাধারণ অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষণ ও পরিশ্রমের গুণে ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভ্রূণতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞান-শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া মানবতত্ত্ব রচিত; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে এখনও মানবতত্ত্ব যথার্থ মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

খ্রীষ্টধর্ম্ম মতে আদাম ও ঈভ মানবজাতির আদিপুরুষ এবং ছয় সহস্র বৎসর হইল, তাঁহারা সৃষ্টিকালে ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণই খ্রীষ্টধর্ম্মের এই সামান্য উপকথায় বিশ্বাস করিতে পারে; কিন্তু আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞান এ কথায় হাস্য সম্বরণ করে না। সকল দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস, পৃথিবীস্থ যাবতীয় উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু ও মানবজাতি পরমপিতা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট। এ কথার উপরও উচ্চবিজ্ঞান উপহাস করিয়া থাকে। একজন সামান্য কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাদি লইয়া ঘট প্রস্তুত করে, সেইরূপ কি ঈশ্বর এ জগতে আসিয়া ও বিবিধ উপাদান

লইয়া এক.এক জাতির এক একটী স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি করেন? বিজ্ঞান বলে, ইহা অপেক্ষা অজ্ঞতার কথা, মূর্খতার কথা আর কি হইতে পারে? এ সকল উপকথা জ্ঞানজগতে আর শোভা পায় না। এই বিংশশতাব্দীর অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানালোকের মধ্যে অশিক্ষিত মূর্খ লোকেরাই খ্রীষ্টধর্ম্মের ঐ সকল অলীক উপকথায় বিশ্বাস করে মাত্র।

বিজ্ঞানের মতে জীবজগতের ললামভূত মানব নিকৃষ্ট জন্তুর ক্রমবিবর্ত্তনে এ জগতে আবির্ভূত এবং তিনি লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করতঃ আধুনিক আকার ধারণ করেন। বৃক্ষশাখারূঢ় বানর তাঁহার পিতামহ; কিন্তু তাঁহার পিতা বহুপূর্ব্বে পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইয়া যান। ভূধরশায়ী কঙ্কালরাশি অনুসন্ধান করিয়াও এখনও তাঁহার পিতার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বিবর্ত্তবাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে মানবের অতীত যতই কেন নিকৃষ্ট বা হেয় হউক না, তাঁহার ভবিষ্যৎ ততোধিক সমুজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত। যিনি অধমাধম বানর হইতে উদ্ভূত, তিনি আজ বুদ্ধিবলে জীবরাজ এবং কিছুদিন পরে তিনি দেবরাজ হইবেন।

পাঠক! যে দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া তুমি আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান কর, আধুনিক উন্নতবিজ্ঞান আজ কি না সেই মানবকে বানরোদ্ভূত বলিয়া প্রতিপাদন করে। অহহ! মানবজাতির কিরূপ অবমাননা ও কিরূপ লাঞ্ছনা! স্বর্গের যে সকল দেবগণ শাপভ্রষ্ট হইয়া মানবরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত, বিজ্ঞান আজ তাঁহাদিগকে বানরোদ্ভব বলিতে সাহসী! ওহে ডারউইনপ্রমুখ পণ্ডিতগণ! তোমরা আজ জ্ঞানজগতের অধীশ্বর। তোমাদের নিকট সমগ্র জগৎ নতশির। মানবের স্থূলদেহ সম্বন্ধে জীবজগৎ হইতে যে সকল প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া তোমরা ঐ সকল সত্যে উপনীত, তাহা অনেক স্থলে অখণ্ডনীয় বটে; কিন্তু তিনটী যৎসামান্য কথা তোমাদের স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। (১) জীবজগতে যাবতীয় জীবের গঠনপদ্ধতি সমান বলিয়া দেহ সম্বন্ধে বানর ও মানবের এত সৌসাদৃশ্য দেখা যায়; (২) মানব মনটী কদাচ নিকৃষ্টজীবোৎপন্ন হইতে পারে না; এতদ্সম্বন্ধে উভয়ের ভিতর বিস্তর পার্থক্য; (৩) কেবল স্থূলদেহ লইয়াই মানব নহে। অতএব

যে বিজ্ঞান কেবল মানবের স্থূলদেহ অনুশীলন করিয়া ঐরূপ অপরূপ সিদ্ধান্ত করে, তাহার কথায় কর্ণপাত করা কি আমাদের কর্ত্তব্য ?

তত্ত্ববিদ্যামতে ত্রিবিধ বিবর্ত্তনে আধুনিক মানব সৃষ্ট। বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট মানবের ভৌতিক দেহে কালবশতঃ যেমন বিবর্ত্তন সংঘটিত, সেইরূপ আধ্যাত্মিক মানবে ও জ্ঞানবিশিষ্ট মানবে একের অপকর্ষ ও অপরের উৎকর্ষ ক্রমশঃ সাধিত; অর্থাৎ তাঁহার বাহ্যদেহ যে পরিমাণে অঙ্গসৌষ্টব ও সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত, সেই পরিমাণে তাঁহার মনের জ্ঞানশক্তি ক্রমশঃ স্ফুরিত ও পরিবর্দ্ধিত, কিন্তু সেই পরিমাণে তাঁহার আত্মার আধ্যাত্মিকতা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত। দেহ ও মনের যেরূপ বিবর্ত্তন সংঘটিত, আত্মার সেইরূপ সঙ্কোচন সমুপস্থিত। আত্মার সঙ্কোচনবশতঃ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম এ কলিযুগে একপাদে পরিণত এবং জ্ঞানশক্তির স্ফূর্ত্তিবশতঃ জগতের সভ্যতা আজ বর্দ্ধনশীল।

এই ত্রিবিধ বিবর্ত্তন বশতঃ একমূর্ত্তি মানব বস্তুতঃ জগতে ত্রিমূর্ত্তিধারী। ত্রিমূর্ত্তি যথা (১) সূক্ষ্ম বা কারণ শরীর (২) লিঙ্গ শরীর (৩) স্থূল শরীর ; এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্থূল দেহরূপ চাক্ষুস মূর্ত্তিটী জড়বাদী জড়বিজ্ঞান অনুশীলন করে এবং অপর দুইটী মূর্ত্তির বিষয় ইহা আদৌ অবগত নহে ; এমন কি উহাদের অস্তিত্ব ইহা একেবারে অস্বীকার করে। একারণ বিজ্ঞানের যাবতীয় সিদ্ধান্ত ঐকদেশিক ও অসম্পূর্ণ।

বিষ্ণুপুরাণমতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা চতুর্ব্বিধ প্রজাসৃষ্টির জন্য চতুর্ব্বিধ দেহ ধারণ করেন, যথা জ্যোৎস্না, রাত্রি, অহঃ ও সন্ধ্যা। প্রথম রূপ হইতে অসুরগণ, দ্বিতীয় রূপ হইতে সুরগণ, তৃতীয় রূপ হইতে পিতৃগণ ও চতুর্থ রূপ হইতে মানবগণ সমুৎপন্ন। এখন পুরাণোক্ত এই সামান্য উপাখ্যানের ভিতর কিরূপ গূঢ় রহস্য নিহিত, তাহা ভেদ করা অতীব সুকঠিন। হিন্দুশাস্ত্রের নানাস্থলে যে সকল রূপক দেখা যায়, উহাদের অন্তঃপ্রবেশ করিয়া সত্যে উপনীত হওয়া এক প্রকার অসাধ্য। আদিপুরাণ যোগেশ্বরপ্রকটিত ; যোগেশ্বরগণই পৌরাণিক সত্য বুঝিতে সক্ষম।

মানবসৃষ্টি বর্ণন করিবার পূর্ব্বে মানবের বাসভূমি পৃথিবী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত, সৃষ্টিচক্রে সূক্ষ্মজগৎ ক্রমে স্থূলজগতে পরিণত এবং স্থূলজগৎ ক্রমে সূক্ষ্মজগতে উন্নীত। অতএব

যে পৃথিবী এখন সম্পূর্ণ স্থূল এবং যাহার অধিবাসিগণও সম্পূর্ণ স্থূল, উহা পূর্ব্বে সূক্ষ্ম থাকে এবং উহার অধিবাসিগণও সূক্ষ্মরূপধারী দেবতা থাকেন। এ কথার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না; একমাত্র শাস্ত্রই ইহার প্রমাণ।

তত্ত্ববিদ্যামতে স্থূল সূক্ষ্মের তারতম্যানুসারে পৃথিবী সম্বন্ধে সাতটী লোক উল্লিখিত; তন্মধ্যে আধুনিক পৃথিবী চতুর্থ। ইহাতে সূক্ষ্ম স্থূলকর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন হওয়ায় স্থূলের আতিশয্য প্রকটিত। প্রথম পৃথিবী অতীব সূক্ষ্ম; ইহাতে স্থূলের লেশমাত্র থাকে না। দ্বিতীয় তদপেক্ষা অল্প সূক্ষ্ম এবং ইহাতে স্থূলও ঈষন্মাত্র স্ফুরিত। তৃতীয়ে স্থূল সূক্ষ্ম সমভাবাপন্ন। চতুর্থ আধুনিক পৃথিবী কেবল স্থূলভাবাপন্ন। পঞ্চম ও ষষ্ঠে স্থূলের অবনতি ও সূক্ষ্মের উন্নতি ঘটে। সপ্তমে কেবল সূক্ষ্মের প্রাধান্য থাকে।

স্থূল (আধুনিক পৃথিবী)
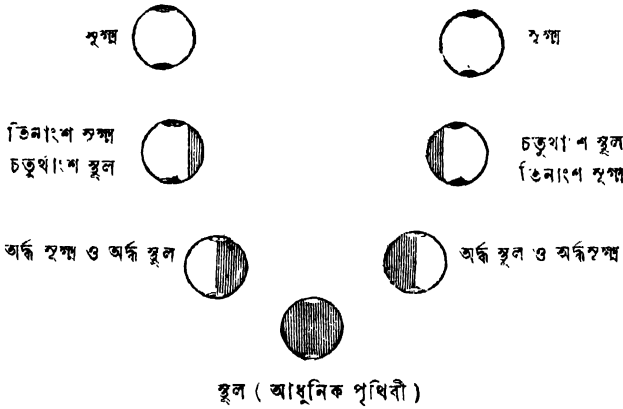
(বামদিকে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সূক্ষ্ম পৃথিবী কিরূপে স্থূলে পরিণত এবং দক্ষিণদিকে মহাপ্রলয়ের পুর্ব্বে স্থূল পৃথিবী কি প্রকারে সূক্ষ্মে উন্নীত, তাহা দেখান হইল)।

এই সপ্তলোকে সপ্ত জীবপ্রবাহ (Rounds) ধারাবাহিক রূপে প্রবর্ত্তিত এবং এক এক কল্পে এক এক জীবপ্রবাহ প্রবাহিত। এখন চতুর্থ বরাহ কল্প প্রবর্ত্তিত; এজন্য পৃথিবীতে চতুর্থ জীবপ্রবাহও প্রবাহিত। প্রত্যেক জীবপ্রবাহে বা কল্পে সপ্তমূলজাতি সমুৎপন্ন এবং এক এক মূলজাতি এক এক মন্বন্তরে আবির্ভূত। দুই মনুর আবির্ভাবের মধ্য অন্তরাল বা ব্যবহিত কালকে

মন্বন্তর বলা যায়। সেজন্য এখন সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকার সত্ত্বেও চতুর্থ জীবপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত। গীতায় উল্লিখিত—

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোকা ইমাঃপ্রজাঃ।

'সৃষ্টির আদিতে ভৃগুআদি সপ্ত ঋষিগণ ও চারি মনু আমারই প্রভাবে এবং আমার মানসপুত্র হইয়া এই লোক এবং সকল প্রজা সৃষ্টি করেন।' এস্থলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কেন সাত জন মনুর পরিবর্ত্তে চারি জন মনুর উল্লেখ করেন? এ পৃথিবীতে চতুর্থ জীবপ্রবাহ এখন প্রবর্ত্তিত; সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখরাবিন্দ হইতে চারি জন মনুর কথাও উল্লিখিত। এস্থলে কল্প ও মন্বন্তর এই দুইটী বাক্য লইয়া হিন্দুশাস্ত্রের সহিত তত্ত্ববিদ্যার বিস্তর মত-ভেদ দেখা যায়। সে বিষয় এখানে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রত্যেক মন্বন্তরে যে এক এক মূলজাতি আবির্ভূত, তাহা আবার সপ্ত শাখাজাতিতে বিভক্ত। এখন চতুর্থ জীবপ্রবাহের ভিতর (Fourth round) পঞ্চম মূলজাতি বর্ত্তমান। যে আর্য্যজাতি পৃথিবীর অনেক স্থলে বিস্তীর্ণ, সেই আর্য্যজাতিই পঞ্চম মূলজাতি। এই জাতিই জগতে অনেক দিন একাধিপত্য করিবে। ইহারা বৈবস্বত মনু বংশীয় বা আদম জাতীয় (Adamic Race)। ইহাদের বুদ্ধিশক্তি সম্যক স্ফুরিত।

সকলেই জানেন, আধুনিক পৃথিবী দুই মহাদ্বীপে বিভক্ত, পূর্ব্ব মহাদ্বীপ ও পশ্চিম মহাদ্বীপ। তন্মধ্যে পূর্ব্ব মহাদ্বীপ এসিয়া, ইউরোপ, ও আফ্রিকায় এবং পশ্চিম মহাদ্বীপ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিভক্ত। হয়ত কেহ কেহ শুনিয়া থাকিবেন, এই সকল মহাদেশ লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে গভীর সমুদ্রে নিমগ্ন থাকে এবং যে স্থলে আজ মহাসমুদ্র মহাশব্দে উত্তালতরঙ্গে তরঙ্গায়িত, সে স্থলে বিস্তৃত ভূভাগ থাকে। আধুনিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবী কত ভৌতত্বিক পরিবর্ত্তন দ্বারা পরিবর্ত্তিত, তাহা অসম্পূর্ণ ভূতত্ত্ব এখনও নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হয় নাই, কেবল উহার আভাস মাত্র পায়।

তত্ত্ববিদ্যামতে এক এক মন্বন্তরে এক এক মূলজাতি লইয়া পৃথিবী নব নব মহাদ্বীপে পরিণত। যথা:—

(১) দেবভূমি—সুমেরু।

(২) হাইপরবোলিয়া—পুষ্কর।
আধুনিক এসিয়ার উত্তরাংশ (তৎকালে চিরবসন্ত বিরাজমান)।

(৩) লিমুরিয়া—শ্বেতদ্বীপ।
ম্যাডাগাস্কার হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(৪) আটলাণ্টিস—অতল।

(৫) আধুনিক পৃথিবী—জম্বুদ্বীপ।

আধুনিক পৃথিবী বা জম্বুদ্বীপের মহাসাগর লবণাক্তজলে পূর্ণ। অন্যান্য মন্বন্তরে ইহা কিরূপ জলীয় পদার্থে পূর্ণ, তাহা আমরা জানি না। জড় বিজ্ঞানই বলে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ইহা তরল অঙ্গার জলে (Liq. Carbonic Acid) পূর্ণ থাকে। তবে কেন তুমি শাস্ত্রোক্ত সুরাদি সপ্ত সমুদ্রের কথা শ্রবণে হাস্য সম্বরণ কর না? ক্ষীরসমুদ্র, দধিসমুদ্র, সুরাসমুদ্র প্রভৃতি সপ্তসমুদ্র প্রকৃত ক্ষীর, দধি, সুরা প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকে না; কিন্তু মন্বন্তরে মন্বন্তরে পৃথিবীর মহাসাগর যেরূপ জলীয় পদার্থে পূর্ণ, তাহাই শাস্ত্রে রূপকভাবে উল্লিখিত।

উপরে যে পঞ্চ পৃথিবীর কথা উল্লিখিত, উহার এক এক মহাদ্বীপে এক এক মূলজাতি মন্বন্তরে মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়া সংসারিক লীলা প্রদর্শন করে এবং তাহাদের কাল পূর্ণ হইলে, ভূগর্ভস্থ সংকর্ষণাদি অগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হইয়া বা জলপ্লাবনে প্লাবিত হইয়া তাহারা মহাদ্বীপের সহিত কালগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। এখন তাহাদের কোনরূপ স্থায়ী নিদর্শন পাওয়া যায় না। সমুদ্রের তলদেশ ভূতত্ত্ব দ্বারা এখনও পর্য্যালোচিত হয় নাই।

পঞ্চমূলজাতির মধ্যে প্রথম দুই জাতিতে দৈবীপ্রকৃতি অধিক পরিমাণে ও মানবিক প্রকৃতি অত্যল্পভাবে স্ফুরিত এবং শেষোক্ত তিনজাতিতে দৈবীপ্রকৃতি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মানবিক প্রকৃতি বলবতী। প্রথমে দেবরূপী মনুপুত্রগণের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম আকাশরূপী মূর্ত্তি বহির্দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত; তৎকালে তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতাও সম্যক স্ফুরিত। পরে কালবশে প্রকৃতির পরিণাম বশতঃ যতই স্থূলত্ব বর্দ্ধিত, ততই তাঁহাদের বাহ্যদেহ স্ফুরিত, বিকশিত ও সৌন্দর্য্যশালী এবং আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম দেহও ততই ক্রমসঙ্কুচিত। এই প্রকারে তদীয় দেহ বিভিন্ন চর্ম্মাবরণে (Coats of Skin) আবৃত

হইলে, তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা ক্ষয়প্রাপ্ত, এবং তৎপরিবর্ত্তে আধিভৌতিকত্ব সম্যক বর্দ্ধিত। পঞ্চমূলজাতি পঞ্চগ্রহকর্ত্তৃক বা গ্রহাধিষ্টিত লোকপাল কর্ত্তৃক পালিত ও রক্ষিত। প্রথম জাতি সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক, দ্বিতীয় জাতি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক, তৃতীয় জাতি শুক্র কর্ত্তৃক, চতুর্থ জাতি চন্দ্র কর্ত্তৃক ও পঞ্চম জাতি বুধ কর্ত্তৃক পালিত।

তত্ত্ববিদ্যামতে চন্দ্রলোকের তেজ পৃথিবীতে সংক্রামিত হওয়ায় ইহা নব বলে বলীয়ান হয় এবং চন্দ্রলোকস্থ পিতৃদেবগণই প্রকৃত মানবসৃষ্টি করেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রারম্ভে প্রথম মূলজাতি বহির্ষদ পিতৃগণের ছায়া হইতে সমুৎপন্ন। ইহারা সূক্ষ্মরূপী দেবমানব এবং ইহাদিগকে আধুনিক ত্রিমূর্ত্তিধারী মানবের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মরূপ জ্ঞানকরা যাইতে পারে। এই দেবমানব সুমেরু মহাদেশে উদ্ভূত; এজন্য প্রায় সকল দেশে একপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত, যে দেবভূমি উত্তরে। দ্বিতীয়জাতিও দেবরূপী মনশূন্য এবং এই দুই জাতির দেহ কোনরূপ বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুশোভিত হয় না। এই দুই জাতি অমর ও অযোনিসম্ভব। তাঁহাদের যোগবল সহজাত বলিয়া হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র প্রভৃতি অধিকাংশ দেবতার ধ্যানমগ্নরূপ কল্পিত; সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধদেবের ও জৈনধর্ম্মে তীর্থঙ্করদিগের ধ্যানমগ্ন রূপ কল্পিত।

এখন ত্রিমূর্ত্তিধারী মানবের বাহ্যস্থূলদেহ কিরূপে স্ফুরিত ? পূর্ব্বে পৃথিবীতে মহামৎস্যরূপ দীর্ঘকায় মৎস্য আবির্ভূত; উহাদের কতকগুলি বংশধর প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া মহাকূর্ম্ম ও মহাবরাহে পরিণত। উহাদেরই বংশধর কালক্রমে অসুররূপী মানবে ক্রমবিবর্ত্তিত। এই অসুররূপী মানবই তৃতীয় মূল জাতি। ইহারা লিমুরিয়া মহাদেশে উৎপন্ন। এই জাতিতে মানবমন সৃষ্ট হওয়ায়, স্থূল মানবদেহ ও সূক্ষ্মরূপের মিলন সংঘটিত। এই সময় হইতেই মানব জগতে ত্রিমূর্ত্তিধারী।

শাস্ত্রে মানবমনসৃষ্টি বিষয়ে একটী অদ্ভুত রহস্য আছে। যখন দেবরূপী মানব জগতে আবির্ভূত, তৎকালে সূর্য্যলোকস্থ অগ্নিসত্ত্বপিতৃগণ, সনকাদি কুমারগণ ও নারদাদি দেবগণ মানবমন সৃষ্টি করিয়া প্রজাবৃদ্ধি করিতে আদিষ্ট কিন্তু তাঁহারা সকলে প্রজাবৃদ্ধি করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন এবং পরিশেষে তাঁহারাই মর্ত্ত্যে আগমন

করিতে বাধ্য হন। যখন তৃতীয় মূলজাতির বাহ্যদেহ বিভিন্ন চর্ম্মাবরণে আবৃত হইয়া অধিক স্ফুরিত, এবং মস্তিষ্কও অল্পাধিক স্ফুরিত, তখন উপরোক্ত দেবগণ মানবমন সৃষ্টি করেন। মানবমন সৃষ্টির সহিত ইহাতে জ্ঞানশক্তি স্ফুরিত হইতে আরম্ভ হয় এবং সেই সঙ্গে মানবের পূর্ব্বতন আধ্যাত্মিকতার হ্রাস হইতে থাকে। বাইবলমতে জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদনে সমগ্র মানবজাতির যে পতন উল্লিখিত, তাহাতেও মানবের উপরোক্ত আধ্যাত্মিক অধঃপতন জানায়। অনেকে এ সকল কথা শাস্ত্রের অলীক উপকথা মনে করেন। কিন্তু যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ যোগবলেই ঐ সকল মহাসত্য প্রাপ্ত হন এবং প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এ সকল কথার উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্রের অনেকস্থলে এরূপ লিখিত, স্বর্গের দেবগণ শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যে আবির্ভূত। এ সকল কথার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। অতএব শাস্ত্রের কথা অন্ধবিশ্বাসের সহিত আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

তৃতীয় মূলজাতি প্রথমে উভলিঙ্গ, পরে একলিঙ্গ হইয়া আধুনিক মানবের ন্যায় স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত। এই স্থলেই দেবরূপী অযোনিসম্ভব মানব প্রকৃত যোনিসম্ভব হন। লিঙ্গভেদের পরই এই জাতিতে জ্ঞানশক্তি স্ফুরিত হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক অধঃপতন আরম্ভ হয়। এই পতনবশতঃ সকলদেশে যোনিসম্ভব মানব অপবিত্র এবং প্রত্যেক ধর্ম্ম তাঁহাকে নিজ নিজ সংস্কারানুসারে পবিত্র করিয়া লয়। ইহার জন্যই খৃষ্টধর্ম্ম স্বপ্রভু যীশুখৃষ্টের অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত প্রচার করে। এই জাতি হইতেই মানবের অঙ্গসৌষ্ঠব ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। এ জাতি ত্রিনয়নবিশিষ্ট; কিন্তু জ্ঞানশক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে তৃতীয় নয়নটী ক্রমশঃ অপগত হইতে আরম্ভ হয়। এ জাতি সমুদ্রগর্ভস্থ অগ্নি দ্বারা বিনষ্ট।

চতুর্থ মূলজাতি আট্‌লাণ্টিস মহাদ্বীপে আবির্ভূত। ইহারাই শাস্ত্রে অসুরাদি নামে অভিহিত। জম্বুদ্বীপবাসী মানবের সহিত তুলনায় ইহারা দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী। ইহারা বাক্যকথন ভাষা প্রস্ফুরিত করে, এজন্য আদিম ভাষাকে রাক্ষসীভাষা বলে। ইহারা সভ্যদেশোচিত শিল্পাদি প্রচলিত করিয়া সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হয়। ইহারা গোধুমাদির ব্যবহার প্রচলিত করে।

ইহারা জলপ্লাবন দ্বারা বিনষ্ট এবং আটলাণ্টিস মহাদ্বীপ এখন সমুদ্রগর্ভে। এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে দৈত্যরাজ বলিও পাতালে নিবদ্ধ।

আধুনিক আর্য্যজাতি পৃথিবীর পঞ্চম মূলজাতি এবং বহুকাল অতীত হইল এ জাতি পৃথিবীতে আবির্ভূত। ইহারা বৈবস্বত মনুবংশীয় বা আদমজাতীয়। পূর্ব্বপুরুষদিগের তুলনায় ইহারা খর্ব্বাকার, ক্ষীণকায়, অথচ অধিক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। ইহাদের আয়ুবলও অল্প, কিন্তু জ্ঞানশক্তি অধিক স্ফুরিত এবং ইহারা অধিক চতুর। ইহাদের বংশাবলি জম্বুদ্বীপের অধিকাংশ স্থল অধিকার করিতেছে। এ জাতির আধিভৌতিকত্ব যে পরিমাণে বর্দ্ধিত ও স্ফুরিত, ইহাদের আধ্যাত্মিকতা সেই পরিমাণে অপগত। পৃথিবীতে ইহাদেরই আধি-পত্য এখন সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ।

এ স্থলে বক্তব্য, যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে পৃথিবীর বাহ্যস্তর যেমন পরিবর্ত্তিত, ইহার স্থাবরজঙ্গমাদি যাবতীয় উদ্ভিজ্জজীবাদিও সেই সঙ্গে পরিবর্ত্তিত। যে সময়ে মানব দীর্ঘকায়, অন্যান্য জীবজন্তুও দীর্ঘকায়; যখন মানব ক্ষুদ্রকায়, অন্যান্য জীবজন্তুও ক্ষুদ্রকায়। সকল অবস্থায়, সকল সময়ে ও সকল স্থলে সকলের আন্তরিক প্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকায়, সর্ব্বত্র সার্ব্বজনিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত। যুগে যুগে বা মন্বন্তরে মন্বন্তরে ভৌতিক-নিয়মাবলিরও পরিবর্ত্তন সংঘটিত। সে জন্য আধুনিক মানব উচ্চমস্থণপ্রস্তর যুগ বা ভৌতত্ত্বিক তৃতীয় যুগের মানব হইতে বিভিন্ন। সে জন্য যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তোমায় শিক্ষা দেয়, যে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে স্বর্গীয় দেবগণ সশরীরে মর্ত্ত্যে আগমন করিতেন, সে সকল উপহাসের কথা নয়, সে সকল মূর্খতার কথা নয়। সকলের ইহা ভালরূপ জানা আবশ্যক, যে হিন্দুশাস্ত্রে কেবল এই কলিযুগের তিন বা চারি সহস্র বৎসরের কথা উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু ইহাতে যুগ যুগান্তর, কল্প কল্পান্তরের কথা উল্লিখিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যত অধিক উন্নতিসাধন হইবে, পাশ্চাত্য মূর্খেরা হিন্দুশাস্ত্রের ততই যথার্থ গৌরব বুঝিতে পারিবেন এবং ইহার যথার্থ সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। এখন তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে অসার অপদার্থ পৌত্তলিকতা জ্ঞানে ঘৃণা করুন।

জগতে মৈথুন ধৰ্ম্ম প্রবর্ত্তন।

ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, লিমুরিয়া মহাদ্বীপে যে তৃতীয় মূলজাতি উৎপন্ন, উহারা প্রথমে উভলিঙ্গ, পরে একলিঙ্গ হইয়া আধুনিক্ মানবের ন্যায় স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত। উহারা জগতে অসুর, দানব ও দৈত্য নামে খ্যাত। এ জাতির চতুর্থ শাখাজাতিতে স্ত্রীপুরুষ বিভক্ত। এ জাতি শুক্রগ্রহ কর্ত্তৃক পালিত; এজন্য পুরুষের বীর্য্যের নাম শুক্র। এ জাতির পূর্ব্বে মানব দেবরূপে অযোনি-সম্ভব এবং স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হইবার পরই তিনি যোনিসম্ভব এবং জগতে আধুনিক মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত।

এখন উপরোক্ত মতটী কতদূর প্রমাণসিদ্ধ, তাহা বলা যায় না। থিওসফি-ক্যাল পুস্তকে ঐ মতটী দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। এখন আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞান এ বিষয়ে কিরূপ মতামত প্রকাশ করে, তাহারও অনুসন্ধান লওয়া উচিত। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ; ইহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, পৃথিবীতে কোন্ যুগে স্ত্রীপুরুষ উৎপন্ন হইয়া আধুনিক সন্তানোৎপত্তিপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য। খৃষ্টধর্ম্ম এ সমস্যাটী এককথায় খণ্ডন করে। ইহার মতে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টিকালে আদি মানব আদামের একখণ্ড পঞ্জরাস্থি লইয়া আদি স্ত্রী ঈভকে সৃজন করেন। যেমন ধর্ম্ম, তেমনি উহার ব্যবস্থা। বিবর্ত্তবাদী পণ্ডিতদিগের নিকট এই মতটী হাস্যোদ্দীপক মাত্র; তাঁহারা ইহাকে কদাচ গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

জীবতত্ত্ব পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে মৈথুনধর্ম্ম জীবজগতে কেবল উৎকৃষ্ট জন্তুদিগের ভিতর দৃষ্ট হয়; তদ্ভিন্ন অনেক নিকৃষ্ট জন্তু এ সুখে একেবারে বঞ্চিত। তাহারা অমিশ্রসংযোগ বা মুকুলজন্ম দ্বারা সন্তানোৎপাদন করে। জীবজগৎ পর্য্যালোচনা করিলে, আরও বুঝিতে পারা যায়, যে অনেক জীব স্ত্রীপুরুষে আদৌ বিভক্ত হয় নাই এবং উহারা উভলিঙ্গ; উহাদের দুই প্রকার জননেন্দ্রিয় একাধারে মিলিত।

বিজ্ঞানের মতে মানবও একসময়ে উভলিঙ্গ ছিলেন; সেজন্য পুরুষজাতিতে স্তনযুগল ও জরায়ু এখন অস্ফুটভাবে বর্ত্তমান এবং সময়বিশেষে ও স্থল-বিশেষে প্রকৃতি পূর্ব্বানুকরণে উভলিঙ্গ মানব উৎপাদন করে। কিন্তু বিজ্ঞান

এখনও যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই, যদ্দারা ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কোন্ সময়ে মানবাদি উৎকৃষ্ট জন্তুগুলি যৌননির্ব্বাচনের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন জননেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পুংজাতি ও স্ত্রীজাতিতে বিভক্ত এবং সেই সঙ্গে জগতে আধুনিক সন্তানোৎপত্তিপ্রথা প্রতিষ্ঠিত।

স্ত্রীপুরুষের জননেন্দ্রিয়ের পার্থক্য পর্য্যালোচনা করিলে, আমাদের স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে অল্পদিন হইতে চলিল, জগতে স্ত্রীপুরুষের প্রভেদ হইয়াছে। দেখ, পুরুষজাতির অণ্ডকোষের সন্মুখভাগে যে সীবন দেখা যায়, তাহাই স্ত্রীজাতিতে লিপ্ত না হওয়ায় অপত্যোৎপাদনের দ্বারদেশ হয়। স্ত্রীজাতিরা অণ্ডকোষ (ovary) বস্তিদেশের অভ্যন্তরে স্থিত; কিন্তু পুরুষজাতিতে উহা (testicle) বহির্ভাগে স্থিত। স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশের নাসিকারূপ ক্লাইটরিসটী (clittoris) বর্দ্ধিত হইয়া পুরুষজাতির জননেন্দ্রিয় প্রস্তুত করে। স্ত্রীজাতির মূত্রনিঃসরণদ্বার ঐ ক্লাইটরিসের ঠিক নিম্নদেশে অবস্থিত; কিন্তু পুরুষজাতিতে উহা জননেন্দ্রিয়ের মস্তকে স্থিত এবং মূত্রনালীটী জননেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া যাওয়াতে উহার নিম্নদেশে সীবন পড়ে। শরীরের অন্য কোন স্থলে প্রকৃতিদত্ত সীবন দেখা যায় না। ইহাতে বোধ হয়, যতকাল মানব জগতে আবির্ভূত, উহার শেষভাগে তিনি স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত। আরও দেখা যায়, সন্তান বর্দ্ধিত হইবার জন্য স্ত্রীজাতিতে যে জরায়ু আছে, তাহা পুরুষজাতিতে এখন অতি অস্ফুটভাবে বর্ত্তমান। ইহাতেও আমাদের স্থিরসিদ্ধান্ত করা উচিত, যে মানব এক সময়ে উভলিঙ্গ ছিলেন এবং পৃথিবীতে তাঁহার আবির্ভাবের অনেক পরে তিনি স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হন। বোধ হয়, চারি পাঁচ লক্ষ বৎসর হইল, এরূপ বিভাগ হইয়াছে।

জীবজগৎ অনুশীলন করিতে করিতে আরও বুঝিতে পারা যায়, মেরুদণ্ডীয় জীবদিগের মধ্যে অধিকাংশ মৎস্যজাতি উভলিঙ্গ এবং যে সরীসৃপজাতি মৎস্যজাতির ক্রমবিবর্ত্তনে উদ্ভূত, তাহাদের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন। যাহা হউক, এককালে জীবজগতের উৎকৃষ্ট জীবগুলি যে উভলিঙ্গ ছিল, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে সুদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান পাঠ করিতে করিতে অনেকে হাস্যসম্বরণ করেন না। সুদ্যুম্ন রাজা ইলাবৃতবর্ষে মৃগয়া করিতে গিয়া স্ত্রীত্ব

প্রাপ্ত হন এবং বুধের ঔরষে তাঁহার পুরোরবা পুত্র উৎপন্ন হয়। অতঃপর তিনি মহাদেবের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া এক মাস স্ত্রীলোকের কার্য্য এবং এক মাস পুরুষের কার্য্য করেন। বিজ্ঞানের মতে তিনিও উভলিঙ্গ মানব এবং শারীরবিধানশাস্ত্র এরূপ উভলিঙ্গ মানবের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে।

মহাভারতের একস্থলে উল্লিখিত, দক্ষপ্রজাপতি দ্বাপরযুগে জগতে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। যখন তাঁহার পুত্রগণ প্রজাবৃদ্ধি করিতে অস্বীকৃত হন, তখন তিনি ষাটী কন্যা উৎপাদন করতঃ উহাদের দ্বারাই প্রজাবৃদ্ধি করান। উহাদেরই গর্ভে দৈত্য, দানব, তির্য্যককুল, পক্ষিজাতি ও মানবজাতি উৎপন্ন। এখন দ্বাপরযুগ ৮৬৪০০০ বৎসর; ইহাতে অনুমান করা উচিত, ৪।৫ লক্ষ বৎসর হইতে চলিল, মৈথুনধর্ম্ম জগতে প্রবর্ত্তিত।

শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, দেবাসুরদিগের সাগরমন্থনকালে, যখন ধন্বন্তরি অমৃতভাণ্ড লইয়া উত্থিত হন, তৎকালে অমৃত পান করিবার জন্য দেব ও অসুরগণ মহাসমরে প্রবৃত্ত হন এবং বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে ছলনা করেন ও দেবগণকে অমৃত পান করাইয়া অমর করিয়া দেন। দৈত্য ও দানবগণ মোহিনীরূপদর্শনে বিমুগ্ধ হন এবং অমৃতপান করিতে বিস্মৃত হন। কিন্তু দেবতাগণ মোহিনীরূপে মুগ্ধ না হইয়া অমৃতপান করতঃ অমরত্বলাভ করেন। এখন জিজ্ঞাস্য, এই শ্রুতিমনোহর উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বিষ্ণু কেন মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া দৈত্যগণকে ছলনা করিতে গেলেন? পৌরাণিক উপাখ্যান মাত্রেই রূপকে পূর্ণ। এখন সেই রূপক ভেদ করিয়া উপাখ্যানের বৈজ্ঞানিক অর্থ অনুসন্ধান করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তত্ত্ববিদ্যার কথা স্মরণ করিলে, আমরা উপরোক্ত উপাখ্যানের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি। যে সূক্ষ্ম দেবরূপী মনুপুত্রগণ পৃথিবীতে প্রথম বিচরণ করেন, তাঁহারা অযোনিসম্ভব ও অমর; এখন তাঁহারা সূক্ষ্মজগতে অধিষ্ঠিত। মহর্লোকাদি যে সকল সূক্ষ্মজগৎ এই স্থূলজগতের অন্তরালে অবস্থিত, উহাতেই ঐ সকল দেবগণ বিরাজমান; তাঁহাদেরই স্থলে অসুররূপী মনুপুত্রগণ আধুনিক মানবের আদিপুরুষ স্বরূপ এ জগতে আবির্ভূত হন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হইয়া যোনিসম্ভব হন এবং দেবযোনি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। যে বস্তুতে যতই

স্থূলত্বের বিকাশ, সে বস্তু ততই নশ্বর। স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হইবার পর, যখন দৈত্যদিগের ভিতর জ্ঞানশক্তি ও কামপ্রবৃত্তি স্ফুরিত, তখন হইতেই স্থূলত্বের চরমবিকাশ আরম্ভ এবং সেই সঙ্গে দৈত্যগণও নশ্বরত্ব প্রাপ্ত। যে স্থলে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, মানবের আদিপুরুষ আদাম ও ঈভ সয়তানের প্রলোভনে নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন করায় মৃত্যুমুখে পতিত, সে স্থলে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে উপদেশ দেয়, বিষ্ণু মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানবের আদিপুরুষ দৈত্যগণকে ছলনা করতঃ নশ্বর করেন।

শাস্ত্রপাঠে আরও অবগত হওয়া যায়, মান্ধাতার পিতা যুবনাশ্ব রাজা নিশাকালে পুংসবন জলপান করতঃ গর্ভধারণ করেন। তিনিও বিজ্ঞানমতে উভলিঙ্গ মানব। এখনও কেহ কেহ উভলিঙ্গ মানব দর্শন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, অলীক পৌরাণিক উপাখ্যানের ভিতরও কেমন বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত, তাহা একবার সকলের ভাবা উচিত। যে শাস্ত্র আজ অনেকে অপাঠ্য বলিয়া ত্যাগ করেন, তাহার ভিতরও বৈজ্ঞানিক সত্য? "কিমশ্চর্য্যমতঃপরং"?

যুগধর্ম্ম।

নব্যযুগের নব সম্প্রদায়গণের এক বিশ্বাস, যে শাস্ত্রোক্ত চারিযুগ সর্ব্বৈব অলীক এবং ইহা হিন্দুধর্ম্মের একটা কুসংস্কার মাত্র। পাশ্চাত্য গুরুকুলের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদের মনে এই সংস্কার এতদূর বদ্ধমূল, যে পুস্তকে কলিযুগের কথা সামান্যরূপ লিখিত, তাঁহারা সে পুস্তকখানি দূরে প্রক্ষেপ না করিয়া নিরস্ত হন না। যাহা হউক, তাঁহারা কি কোথাও শ্রবণ করেন নাই, আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞানও প্রভৃত পর্য্যবেক্ষণাদি বলে ভূতত্ত্বাদি অনুশীলন করতঃ স্থিরসিদ্ধান্ত করে, যে লক্ষ লক্ষ বৎসর হইল পৃথিবী ও মানবজাতি সৃষ্ট এবং ইহা প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্ম্মের অলীক মতামতের মস্তকে পদাঘাত করে? যখন এ বিষয়ে বিজ্ঞানও লক্ষ লক্ষ বৎসর নির্দ্দেশ করে, তখন শাস্ত্রের কথা আমরা অমান্য করি কেন?

এখন যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া আমরা শাস্ত্র সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাই, সে বিজ্ঞান নিজে অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত। অতএব একমাত্র উহার প্রমাণ লইয়া শাস্ত্রের বিচার করা কি কর্ত্তব্য? যে শাস্ত্রের আদ্যন্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত, যে শাস্ত্র যোগসিদ্ধ, মহর্ষিমুখবিনিঃসৃত মহাসত্যে পূর্ণ, সে শাস্ত্রের সত্য সামান্য ভ্রমসঙ্কুল মানবরচিত বিজ্ঞানের সত্য দ্বারা বিচার করা কি উচিত? ইহাতে কি আমাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশিত হয় না? কিন্তু এখন শাস্ত্র অনেক স্থলে জঙ্গলে ও আগাছায় পূর্ণ; সে সকল পরিষ্কার করিয়া শ্যামল শস্যক্ষেত্র বাহির করা কি উচিত নয়? সেজন্য অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের কথা লইয়া ইহার বিচার করা উচিত। এখন শাস্ত্রের অধিকাংশস্থল কল্পনাদেবীপ্রসূত ও অতিরঞ্জিত, সেজন্য যে সমস্ত শাস্ত্র মিথ্যা ও অলীক, তাহা কদাচ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রের যে অংশটুকু আমরা অলীক ও কাল্পনিক বিবেচনা করি, তাহাই যথার্থ অলীক ও কাল্পনিক, তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য।

সৃষ্টির চতুর্যুগসম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা লিখিত, তাহা কদাচ অতিরঞ্জিত বোধ হয় না। ভূমণ্ডল ও মানবজাতির সৃষ্টিসম্বন্ধে জড়বিজ্ঞান এখনও যথার্থ মত প্রকাশ করিতে পারে নাই। সে স্থলে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যাহা নির্দ্দেশ করে, তাহাই অন্ধবিশ্বাসের সহিত আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

শাস্ত্রে চারি যুগসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত—

যুগ।	পরিমাণ।
সত্যযুগ	১৭২৮০০০
ত্রেতাযুগ	১২৯৮০০০
দ্বাপরযুগ	৮৬৪০০০
কলিযুগ	৪৩২০০০

অর্থাৎ দ্বাপরযুগ কলিযুগের দ্বিগুণ, ত্রেতাযুগ উহার তিনগুণ এবং সত্যযুগ উহার চতুর্গুণ। যুগধর্ম্মানুসারে মানব যেরূপ খর্ব্বকায়, তাঁহার আয়ুবল ও ধর্ম্মবল সেই পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত। সত্যযুগে চতুষ্পাদধর্ম্ম, একবিংশতিহস্ত পরিমিত দেহ ও মজ্জাগতপ্রাণ; ত্রেতাযুগে চতুর্দ্দশহস্তপরিমিত দেহ,

অস্থিগতপ্রাণ ও ত্রিপাদধর্ম্ম ; দ্বাপরযুগে সপ্তহস্তপরিমিতদেহ, রুধিরগতপ্রাণ ও দ্বিপাদধর্ম্ম ; কলিযুগে সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত দেহ, অন্নগতপ্রাণ ও একপাদধর্ম্ম।

এই অধ্যায়ে তত্ত্ববিদ্যামতে মানবসৃষ্টি যেরূপ বর্ণন করা গিয়াছে, তাহার সহিত শাস্ত্রোক্ত যুগধর্ম্মের কিছু প্রভেদ দেখা যায় না। যে মানব এখন খর্ব্বকায়, বামনরূপী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অল্লায়ু, শঠ ও চতুর, সে মানব পুরাকালে দীর্ঘকায়, অসুররূপী, রাক্ষসরূপী, দীর্ঘায়ু, সরল ও ধর্ম্মিষ্ঠ ; যে মানব এখন জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হইয়া আধিভৌতিক উন্নতির জন্য ব্যগ্র, সে মানব পুরাকালে যোগবলে বলীয়ান হইয়া অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যগ্র ; যে মানব এখন যোনিসম্ভব ও নশ্বর, সে মানব পুরাকালে অযোনিসম্ভব, দেবরূপী ও অমর ।

এখন জিজ্ঞাস্য, যথার্থই কি মানব প্রাচীনকালে দীর্ঘকায় ছিলেন এবং যুগ ধর্ম্মে তাঁহার দেহ খর্ব্ব হওয়ায় তাঁহার আয়ুবল হ্রাস প্রাপ্ত ? জড়বিজ্ঞান ভূধরশায়ী কঙ্কালরাশি পর্য্যালোচনা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করে, পুরাকালে মহা-কূর্ম্ম, মহাহস্তী, পতত্রবিশিষ্ট গোধা প্রভৃতি বৃহদাকার জীবজন্তু পৃথিবীতে আবির্ভূত। এই সকল প্রাকৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গের সহিত জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য প্রকৃতি মানবকেও যে সেই পরিমাণে দীর্ঘকায় করেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে লিমুরিয়া ও আটলাণ্টিস্ মহাদ্বীপে দীর্ঘকায় অসুর ও দৈত্যগণ আবির্ভূত, তাহা এখন সমুদ্রগর্ভে। ভূবিদ্যা এখনও সমুদ্রগর্ভ অন্বেষণ করে নাই। এজন্য বিজ্ঞান এখনও দীর্ঘকায় মানবসম্বন্ধে যথার্থ নিদর্শন প্রাপ্ত হয় নাই।

জীবজগতের ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, যে জীব বৃহদাকার, উহার আয়ু-বলও ততোধিক এবং যে জীব খর্ব্বকায়, উহার আয়ুর্বলও সেই পরিমাণে অল্প। ইহাতে বোধ হয়, যুগধর্ম্মানুসারে মানব যে পরিমাণে খর্ব্বকায়, তাঁহার আয়ুর্বল সেই পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত। অতএব এই কলিযুগে যদি তাঁহার আয়ু শত বৎসর হয়, দ্বাপর যুগে ইহা দুইশত বৎসর হওয়া অসম্ভব নয়, কিম্বা ত্রেতাযুগে তিনশত বৎসর হওয়া অসম্ভব নয়।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সূক্ষ্ম জগৎ যে পরিমাণে স্থূলজগতে পরিণত, মানবদেহও সেই পরিমাণে সূক্ষ্মরূপ হইতে স্থূলরূপে পরিণত এবং সেই সঙ্গে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আধিভৌতিকত্ব সম্যক স্ফুরিত।

এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত, যুগধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মের এক একটী পাদ নষ্ট এবং এই কলিযুগে ধর্ম্মের একটী মাত্র পাদ অবশিষ্ট, তাহাও আবার ভগ্নাবস্থায়। কলিযুগসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে যাহা উল্লিখিত, তাহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য। কলিযুগের বিবরণের সহিত আধুনিক মানবসমাজের অবস্থা তুলনা করিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, এখন পাপস্রোত সংসারে কিরূপ খরতরবেগে বহমান, এখন জনসাধারণ কিরূপ ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, শঠ ও মিথ্যাবাদী।

সত্যযুগে মানব দেবরূপী এবং তদীয় দেহে মজ্জা স্ফুরিত ; তজ্জন্য তাঁহার প্রাণও মজ্জাগত। তৎকালে মহামৎস্য, মহাকূর্ম্ম, মহাবরাহ ও নৃসিংহ পৃথিবীতে আবির্ভূত ; এজন্য শাস্ত্রে বিষ্ণুর ঐ সকল অবতার সত্যযুগে উক্ত। ত্রেতাযুগে মানবদেহ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয় এবং উহাতে অস্থি সম্যক স্ফুরিত হয় ; এজন্য ত্রেতায় তাঁহার প্রাণ অস্থিগত। তৎকালে অসুর ও দৈত্যগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত। এজন্য শাস্ত্রে বিষ্ণুর বামন অবতার ও দৈত্যদিগের বলিরাজা উক্ত। দ্বাপরযুগে মানবদেহে রুধির সম্যক স্ফুরিত হয় এবং উহা বিভিন্ন চর্ম্মাবরণে আবৃত হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় ; এজন্য তৎকালে তাঁহার প্রাণ রুধিরগত। এই কলিযুগে তিনি অন্নগতপ্রাণ ও শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া খর্ব্বাকার, ক্ষীণবল ও অল্পায়ু।

এই চতুর্যুগনির্দ্দেশে শাস্ত্রকারদিগের আর একটী গূঢ়রহস্য দেখা যায়। হিন্দুজাতি ভারতবর্ষে যতকাল আসিয়াছেন, সেই কালকে তাঁহারা সৃষ্টির যুগানুসারে চারিযুগে বিভক্ত করেন। এজন্য জাতীয় সত্যযুগে মান্ধাতা প্রভৃতি অধীশ্বরগণ ভারতে রাজত্ব করেন ; জাতীয় ত্রেতাযুগে পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হন ; জাতীয় দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব অবতার লন এবং জাতীয় কলিযুগে ম্লেচ্ছ রাজাদিগের রাজ্য ভারতে বিস্তৃত হয়। ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা হিন্দুজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে যেরূপ কাল নিরূপণ করেন, জাতীয় চতুর্যুগ নির্দ্দেশে উহার সহিত কোনরূপ অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। অতএব নবযুগের নব্যসম্প্রদায়গণ শাস্ত্রোক্ত চতুর্যুগের উপরোক্ত দুই প্রকার অর্থ করিয়া দেশীয়শাস্ত্র ও পাশ্চাত্যগ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইবেন।

এখন জড়বিজ্ঞান পৃথিবীর যুগসম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করে—

(১) আদিযুগ বা অমসৃণ প্রস্তরযুগ।
(২) প্রথমযুগ বা অধঃমসৃণ প্রস্তরযুগ।
(৩) দ্বিতীয়যুগ বা মধ্যমসৃণ প্রস্তরযুগ।
(৪) তৃতীয়যুগ বা উচ্চমসৃণ প্রস্তরযুগ।
(৫) চতুর্থ বা মানবযুগ।

ইহাদের পরিমাণ লইয়া নানামুনির নানামত প্রচলিত; তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহা হউক, বিজ্ঞান সত্যের আভাস পাইতেছে বটে, কিন্তু এখনও ইহা অনেক পশ্চাৎপদ।

বিবর্ত্তবাদ।

জ্ঞানজগতে এখন দুই প্রকার বিবর্ত্তবাদ প্রচলিত ; (১) দার্শনিক প্রাচ্যবিবর্ত্তবাদ (২) বৈজ্ঞানিক প্রতীচ্যবিবর্ত্তবাদ। কপিলাদি মহর্ষিগণ যে সংখ্যমত প্রাচ্যজগতে প্রচার করেন, তাহাই দার্শনিক বিবর্ত্তবাদ এবং ডারউইনপ্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্যজগতে যে বিবর্ত্তবাদ (Theory of Evolution) প্রচার করেন, তাহা বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ। এই অধ্যায়ে সৃষ্টিরহস্য নামক প্রবন্ধে সাংখ্যমতের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যান দেওয়া গিয়াছে। এখন বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদের বিষয় কিছু লেখা যাউক।

বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ উনবিংশশতাব্দীর জ্ঞানজগতের একটী সুমহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই উৎকৃষ্ট মত প্রচার করিয়া জ্ঞানজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। পাশ্চাত্যজগতে ইহার এত অধিক প্রতিপত্তি, যে আজকাল যাহা ইহার বিরুদ্ধ বা অনভিমত, তাহা অসত্যজ্ঞানে সচরাচর পরিত্যক্ত হয়।

এই শ্রেষ্ঠমত উপদেশ দেয়, যে জড়জগৎ, উদ্ভিজ্জজগৎ, জীবজগৎ, সমাজজগৎ ও জ্ঞানজগৎ প্রভৃতি যাবতীয় জগতের যাবতীয় পদার্থ ক্রমবিবর্ত্তনে বা ক্রমবিকসনে কালক্রমে উদ্ভূত ও স্ফুরিত। রোমের ন্যায় সুবিশাল মহানগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় না। প্রাকৃত হউক, অপ্রাকৃত হউক, কৃত্রিম হউক, অকৃত্রিম হউক, বস্তুমাত্রেই একদিনে, একরূপে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট বা উদ্ভাবিত

হয় নাই। কিন্তু উহা যুগে যুগে অল্পে অল্পে, ক্রমশঃ অননুভূতভাবে রূপান্তরিত হইয়া পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করতঃ আধুনিক আকার বা রূপ ধারণ করে। দেখ, সর্ষপকণাবৎ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে কি প্রকারে প্রকাণ্ড শাখাপল্লবসংবলিত সুবিশাল বটবৃক্ষ কালসহকারে উৎপন্ন! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হয়, সেই বীজ বা বীজোৎপন্ন ক্ষুদ্রবৃক্ষ নিঃশব্দে ও অবিরামে অন্তঃনিহিত শক্তিবলে বাহ্যজগৎ হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণ পূর্ব্বক দেহস্থ যন্ত্র সংযোগে উহাদিগকে জৈবনিক ধাতুতে পরিণত করতঃ স্বদেহ পোষণ ও বর্দ্ধন করে এবং কালক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষবিশেষে পরিণত হয়। এস্থলে বটবৃক্ষটী ক্ষুদ্রবীজের ক্রমবিবর্ত্তনে উদ্ভূত।

সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার বা বস্তু ক্রমবিবর্ত্তনে উৎপন্ন। প্রকৃতি-পুস্তক অধ্যয়ন করিলে, আমরা সবিশেষ অবগত হই, যে মানব বল, জীবজন্তু বল, উদ্ভিজ্জ বল, সকলই বটবৃক্ষের বীজের ন্যায় সামান্য জীবাণু বা জীবকোষ হইতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সাধারণ আকার বা দেহ ধারণ করে। এই যে অণুবীক্ষণদৃষ্ট স্ত্র্যণু ও পুমণু একত্রিত হইবার পর উহারা জরায়ুগর্ভে ভ্রূণরূপে আবির্ভূত হইয়া মাতৃ শোণিত প্রাপ্তে স্বদেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ফুরণ করতঃ দশ মাসে হস্তপরিমিত দেহে বর্দ্ধিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয় এবং পুনরায় এ সংসারে আহারের সহিত বাহ্যজগতের পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বদেহ পোষণ ও বর্দ্ধন করতঃ কালক্রমে সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত অশেষ সৌন্দর্য্যশালী দেহে পরিণত হয় এবং সেইসঙ্গে মস্তিষ্কের স্ফূর্ত্তির সহিত অগাধোদ্ভাবিনীশক্তি-বিশিষ্ট বুদ্ধিও বিকসিত হয়; এই যে সংস্কৃত দেবভাষা যাহার লালিত্যে ও মাধুর্য্যে সকলের মন সম্যক মোহিত, যাহার ব্যাকরণঘটিত নিয়মাবলি সংদর্শনে আজ জগৎ বিমুগ্ধ, সেই ভাষা কি একদিনে সৃষ্ট বা উদ্ভূত? কত কত অগাধবুদ্ধি-শালী পণ্ডিতগণ আজীবন প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়া উহার অবয়ব পোষণ ও বর্দ্ধন করেন, বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষে উহাতে কত কত নূতন ভাব ও সত্য কালক্রমে আনীত হয়, তাহা কি কেহ নিরূপণ করিতে পারেন? এই যে একখণ্ড মিষ্টান্ন, যাহার উপাদানসমষ্টি প্রস্তুত করিতে সহস্র লোক যুগপৎ নিযুক্ত, যাহা ভোজন করিয়া তোমার রসনা পরিতৃপ্ত হয় এবং যাহা পাঁচজন

বন্ধু বান্ধবকে ভোজন করাইয়া তোমার মন পরিতৃপ্ত হয়, তাহাও কি একদিনে উদ্ভাবিত? কত কত লোকের অগাধ উদ্ভাবনা শক্তি ইহাতে ব্যয়িত হয়, তাহা কি কেহ নিরূপণ করিতে পারেন? যাহা হউক, এস্থলে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, এ জগতের যাবতীয় বস্তু ক্রমবিবর্ত্তনে জাত ও উদ্ভুত।

কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বিবর্ত্তবাদ দ্বারা নির্দ্দেশ করেন, মানব ও অন্যান্য জীবজন্তু কি প্রকারে ক্রমবিবর্ত্তনে এ জগতে আবির্ভূত! এত কাল মানবধর্ম্ম সকল দেশে প্রচার করিয়া রাখে, যে মানব ও যাবতীয় জীবজন্তু জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বর কর্তৃক স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্ট। এখন বিজ্ঞান বিবর্ত্তবাদ দ্বারা সেই ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট সাধারণ মতের মস্তকে পদাঘাত করে। ইহার মতে সমুদ্র গর্ভস্থ একখণ্ড প্লোটোপ্ল্যাসম নির্ম্মিত মনিরা নামক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম জীব কোটী কোটী বৎসর ব্যাপিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতিজগতের অসংখ্য অবস্থায় পতিত হওয়ায় পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে করিতে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবজন্তু উৎপাদন করে।

জীবতত্ব নির্দ্দেশ করে, যে প্রথম জীব মনিরা (Monera) হইতে সৃষ্টির চরম পরিণতি মানব পর্য্যন্ত যতপ্রকার অমেরুদণ্ডীয় ও মেরুদণ্ডীয় জীবজন্তু দেখা যায়, উহাদের শ্রেণীবিভাগ ও জাতিবিভাগ সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের সহিত এত অধিক ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান, যে একটী উৎকৃষ্ট জীব উহার অব্যবহিত নিকৃষ্ট জীবের ক্রমবিবর্ত্তনে উদ্ভুত হওয়া ব্যতীত অন্য প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। উভচর জন্তু জলচর মৎস্যের ক্রমবিবর্ত্তনে ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত; উভচর জন্তু একদিকে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে করিতে পক্ষি-জাতিতে পরিণত এবং অপর দিকে অশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্তন্যপায়ী জীবে পরিণত। এইরূপ আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ যাবতীয় জীবজন্তুর উৎপত্তিকারণ নির্দ্দেশ করে।

কোন কোন বিবর্ত্তবাদী পণ্ডিত বলেন, মূলসৃষ্টি অচেতন পদার্থ এবং এক-মাত্র অচেতন পদার্থের ক্রমবিবর্ত্তনে, চেতন ও অচেতন সর্ব্ববিধ পদার্থ উৎপন্ন। অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মতে মূলসৃষ্টি দ্বিবিধ, অচেতন ও চেতন; অচেতনের ক্রমবিবর্ত্তনে অচেতন পদার্থ ও চেতনের ক্রমবিবর্ত্তনে চেতন পদার্থ উদ্ভুত।

বেদান্ত ·তে জীব সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান ; ইহাতে বোধ হয়, একমাত্র অচেতন পদার্থের ক্রমবিবর্ত্তনে অচেতন ও চেতন দ্বিবিধ '.ার্থ উৎপন্ন ।

এস্থলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিবর্ত্তবাদের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা আবশ্যক। ইহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাচ্যবিবর্ত্তবাদ দেখায়, কি প্রকারে সূক্ষ্মবুদ্ধি বা অতীন্দ্রিয়বস্তু ক্রমশঃ কলুষিত ও অধোগত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বস্তুতে পরিণত ; আর প্রতীচ্য বিবর্ত্তবাদ দেখায়, কি প্রকারে একখণ্ড স্থূল জৈবনিক পদার্থ অসংখ্য অবস্থায় পতিত হইয়া ক্রমবিবর্ত্তন দ্বারা অসংখ্য জীব উৎপাদন করে। প্রথমটী স্থূলজগতের আদ্যন্তর সূক্ষ্ম জগতের বিষয় সসীম মানবমন দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাই নির্দ্দেশ করে এবং দ্বিতীয়টী কেবল স্থূলজগতের যাবতীয় জীবজন্তু কি প্রকারে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক আকার ধারণ করে, তাহাই স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে। প্রথমটী যোগবলে বা অগাধ যুক্তি বলে প্রাপ্ত, আর দ্বিতীয়টী অপরিসীম পর্য্যবেক্ষণাদি বলে প্রাপ্ত। প্রথমটীর সাপক্ষে প্রমাণ দেওয়া যায় না, আর দ্বিতীয়টীর সাপক্ষে বিস্তর চাক্ষুস প্রমাণ দেওয়া যায়। প্রথমটী কস্মিন্ কালে খণ্ডিত হইবার নয়, আর দ্বিতীয়টী কালে খণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেণ, প্রথমটী কেবল অনুমানসিদ্ধ, এবং দ্বিতীয়টী চাক্ষুস প্রমানের উপর প্রতিষ্ঠীত অতএব দ্বিতীয়টী কদাচ খণ্ডিত হইবে না এবং প্রথমটী কালে লুপ্ত হইয়া যাইবে। যাহা হউক, দার্শনিক বিবর্ত্তবাদ অস্মদ্দেশেই প্রচারিত, অতএব ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান গৌরবের বিষয় হওয়া উচিত। যতদিন হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্ম ভারতে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন সাংখ্যমতও সম্যক আদৃত হইবে।

জীবন সংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন

ও

যৌননির্ব্বাচন।

এই সংসারের যে দিকে আমরা নেত্রপাত করি, সেইদিকেই দেখিতে পাই কেবল সমরানল অনুক্ষণ প্রজ্জলিত ও প্রধূমিত। মানব মানবের সহিত, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সহিত, একজাতি অপর জাতির সহিত চিরদিন সমরে লিপ্ত। এসংসারে সকলেই স্বজীবনরক্ষায়, স্বোদরপূরণে ও স্বকীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে তৎপর; কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নয়, কেহ কাহার প্রতি দয়া ও মমতা দেখায় না; সকলেই স্বোদ্দেশ্যসাধনে ব্যগ্র ও অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া স্বীয় ইষ্টসাধনে ইচ্ছুক। এ সংসারে একপ্রকার জীব অন্যপ্রকার জীবকে হত্যা করিয়া তদীয় মাংসে স্বীয় উদর পূরণ করে; বলবান দুর্ব্বলকে, হিংস্র অহিংস্রকে, ক্রূর অক্রূরকে অনুক্ষণ নষ্ট করে; মনুষ্য মৎস্যকে, মৎস্য কীটাণুকে, কীটাণু পুনরায় মনুষ্যকে ভক্ষণ করে। জগতের চতুর্দ্দিকে অহঃরহ কেবল সমরানল প্রদীপ্ত। এই সমরানলে প্রত্যহ কত কোটী কোটি জীব প্রাণাহুতি প্রদান করে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। হে দয়াময় জগদীশ! তোমার দয়ার রাজ্যে একি ভীষণ দৃশ্য আমাদের নয়নপথে অনুক্ষণ পতিত! হে শান্তিপ্রিয় জগদীশ! কোথায় তোমার বিশ্বরাজ্য শান্তিময় হইবে, না কোথায় অনন্তকাল ব্যাপিয়া অনন্ত সমরানল প্রজ্জলিত ও প্রধূমিত! হা হতবিধে! তোমার এ কি বিড়ম্বনা! আমরা এক মুহূর্ত্ত সংগ্রাম ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারি না।

এখন জিজ্ঞাস্য, সংসারে এরূপ ভীষণ সমরানল কেন চিরপ্রদীপ্ত? কেন সর্ব্বত্র এমন জীবহত্যা ও জীবহিংসা, কেন এমন জাতিবিদ্বেষ ও জাতিহিংসা? গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে, আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, সংসারের প্রকৃত মঙ্গলসাধনের জন্যই প্রকৃতিদেবী স্বয়ং এত নিষ্ঠুর ও নির্ম্মমভাবে এমন জীবনসংগ্রাম সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচালিত করেন। ইহা দ্বারা প্রত্যেক জাতির দুর্ব্বল জন্তুগুলি অন্য জাতির বলবান জন্তু কর্ত্তৃক কবলিত হওয়ায় প্রত্যেক

জাতির বলবান জন্তুগুলিই জীবন সংগ্রামে জয়ী হয় এবং উৎকৃষ্ট সন্ততিবর্গ উৎপাদন করতঃ স্বজাতির ক্রমোন্নতি সাধন করে; ইহা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধিশক্তি ও বলবীর্য্য সম্যক স্ফুরিত হওয়ায়, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পশ্চাৎপদ করতঃ নিজের উন্নতি সাধন করেন। এই প্রকারে জীবনসংগ্রাম দ্বারা প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রমোন্নতি সাধন হয়। অবনতির দিকে প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত অধিক প্রবল, যে যদি উপরোক্ত প্রকার সার্ব্বজনিক উন্নতির উপায় সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাকিত, সৃষ্টি শীঘ্রই লয়প্রাপ্ত হইত।

এই প্রকারেই জীবনসংগ্রাম দ্বারা জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত। ইহাতে প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক জীবজন্তুর বুদ্ধিশক্তি ও বলবীর্য্য সম্যক স্ফুরিত। জীবন-সংগ্রামের এত শোণিতপাত, এত জীবহত্যা, এত যন্ত্রণা, এত রোদন ও এত কষ্টরাশির মধ্যে মঙ্গলময় ঈশ্বর সংসারের যে কত মঙ্গল সাধন করেন, তাহা আমরা কি বুঝিব? অশেষ দুঃখানলের মধ্যে প্রকৃত সুখসলিল বিতরণ করা, অশেষ ঝঞ্ঝাবাতে শান্তিবারি অভিসিঞ্চন করাই মঙ্গলময়ের বাঞ্ছা।

আমরা অনুক্ষণ যে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত, প্রকৃতিজগৎ, জীবজগৎ ও সমাজজগতের যত প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গের সহিত আমরা জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে ভীষণ সংগ্রামে ব্যাপৃত, ইহাতে আমাদের বুদ্ধিশক্তি কত উদ্রিক্ত, বলবীর্য্য কত স্ফুরিত, কলিকালোচিত শঠতা ও প্রবঞ্চনায় আমরা কত নিপুণ, তাহা সকলের ভাবা উচিত। এই জীবনসংগ্রামের অনুকরণে আধুনিক সভ্যজগতে প্রতিযোগিতা এত অধিক আদরনীয়া। আজকাল সংসারে যিনি পাঁচ জনের চক্ষে ধূলিপ্রদান পূর্ব্বক যতই স্বার্থসিদ্ধি করিতে সমর্থ, তিনি ততই জীবন-সংগ্রামে জয়ী, তাঁহার সর্ব্বত্র ততই সম্মান ও সমাদর।

এখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও যৌননির্ব্বাচন এই দুইটী মহাশব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য। ডারউইনপ্রমুখ আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই দুই মহাশব্দ ব্যবহার করিয়া জীবতত্ত্বের অনেক রহস্য মীমাংসা করেন।

প্রকৃতিজগৎ বল, জীবজগৎ বল, যে স্থলে যে বিষয়ের যেরূপ অনাটন, অভাব ও প্রয়োজন হয়, সে স্থলে সে বিষয়ের সেই অনাটন, অভাব ও প্রয়োজন ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে অনাটন পূরণ করাই প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ

নিয়ম। দেখ একটী বৃক্ষশাখা অনাতপে পতিত হইয়া ভালরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারিতেছে না; কিছুদিন পরে দেখিতে পাইবে, যে দিকে বর্দ্ধিত হইলে সূর্য্যালোক পাওয়া যায়, উহা সেই দিকেই বর্দ্ধিত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য, বৃক্ষশাখাকে কে সেই দিকে বর্দ্ধিত হইতে শিক্ষা দেয়? বৃক্ষ ত অচেতন পদার্থ; উহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারে যে ঐদিকে বর্দ্ধিত হইলে সূর্য্যালোক পাওয়া যায়? এস্থলে প্রকৃতি স্বয়ং উহার অনাটন পূর্ণ করিয়া দেয়।

জীবজগতে আর একটী প্রধান নিয়ম দেখা যায়, জীবগণের চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন নূতন অবস্থায় অবস্থিতির জন্য উহারা অবস্থোপযোগী শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে শিক্ষা করে। এরূপ পরিবর্ত্তন না ঘটিলে উহারা কদাচ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া জগতে স্থায়ী হইতে পারে না। যেমন সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তনই যুগধর্ম্ম, সেইরূপ যুগপরিবর্ত্তনে যাহারা অবস্থা বৈষম্যে পতিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সক্ষম হয়, তদীয় বংশধরেরা জীবজগতে উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিতে পারে; আর যাহারা সে বিষয়ে অসমর্থ হয়, তাহারা ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনে প্রয়োজনানুসারে জীবের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির যে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা প্রকৃতি স্বয়ং ঘটাইয়া দেয় এবং জীবজগতে উহাকে স্থায়ী করিয়া দেয়। প্রকৃতির এই প্রক্রিয়াটী প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সম্পাদিত, এরূপ বলা উচিত; এস্থলে প্রকৃতি স্বয়ং পছন্দ করিয়া ঐরূপ পরিবর্ত্তন ঘটায়। দেখ, জলচর হংস জাতির পাদদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি চর্ম্মলিপ্ত; জলে থাকিতে থাকিতে সন্তরণ দিয়া আহার অন্বেষণের জন্যই প্রকৃতি ঐরূপ ঘটাইয়া দেয়। কিন্তু স্থলচর হংসজাতির এরূপ আবশ্যকতা হয় না; এজন্য উহাদের অঙ্গুলিগুলিও চর্ম্মলিপ্ত নয়। এস্থলে জনসাধারণ বলিয়া থাকে, পরমেশ্বর হংসজাতিকে জলচর করিবার জন্য উহার অঙ্গুলিগুলি চর্ম্মলিপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু উন্নত বিজ্ঞান একথার উপর উপহাস করে।

মনে কর, যে দেশে এখন হস্তী বর্ত্তমান, সেই দেশ ভৌতত্ত্বিক পরিবর্ত্তন দ্বারা অল্প পরিমাণে জলমগ্ন হইয়া গেল। এই নূতন অবস্থায় স্থায়ী হইবার

জন্য হস্তীদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি স্বতঃ কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়। তৎপরে যদি সেই দেশ মহাসমুদ্রে পরিণত হয়, হস্তীগুলিও কালক্রমে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে করিতে জলহস্তীতে পরিণত হয়। এস্থলে প্রকৃতি স্বয়ং পছন্দ করিয়া উহাদের অবস্থোপযোগী পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়। যে প্রক্রিয়া বলে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

সেইরূপ লিঙ্গভেদ বশতঃ জীবদেহে যে সকল অনাটন উপস্থিত হয়, তাহাও স্বতঃ পূর্ণ হয়। এস্থলে অনাটন পূরণ যৌননির্ব্বাচনে ঘটে। পুরুষ জাতীয় কোকিলের কলকণ্ঠ স্ত্রীজাতীয় কোকিলের মনমুগ্ধ করিবার জন্যই স্ফুরিত। ময়ূরগণ ময়ূরীগণকে মোহিত করিবার জন্যই নৃত্য করিতে দক্ষ এবং উহাদের পুচ্ছদেশ এত অলঙ্কৃত। এই দুই স্থলে লিঙ্গভেদ বশতঃ ঐরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় বলিয়া উহা যৌননির্ব্বাচনে সম্পাদিত বলা উচিত। সকল দেশের স্ত্রীজাতির কোমলতা, শ্মশ্রুদেশে কেশরাহিত্য প্রভৃতি স্ত্রীজাতিসুলভ গুণগুলি যৌননির্ব্বাচনে স্ফুরিত।

ডারউইনপ্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে জীবজগতে সর্ব্বকর্ত্তৃত্বপদে ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বপদে আরূঢ় করেন। তাঁহারা ঈশ্বর মানুন, বা না মানুন, তাঁহারা বলেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই জীবজগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিজাতির সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্য বটে, তাঁহারা বলিতে পারেন না, কি প্রকারে অজৈবনিক পদার্থ সর্ব্বপ্রথমে জৈবনিক পদার্থে বিশেষিত হয়; কিন্তু তাঁহাদের মতে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবজন্তু একখণ্ড প্লটোপ্ল্যাসমের ক্রমবিবর্ত্তনে কোটী কোটী বৎসর ব্যাপিয়া পরিবর্ত্তন দ্বারা ক্রমোন্নত হইয়া আধুনিক শ্রেণিগত প্রভেদ ও উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই জীবজগতের ক্রমবিবর্ত্তনের মূলাধার।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural Selection) ও যৌননির্ব্বাচন (Sexual Selection) এই দুইটী শ্রুতিমনোহর সুবৃহৎ শব্দ। এখন জিজ্ঞাস্য, বস্তুতঃ ইহারা কি মহাশক্তি? ইহারাই কি অসংখ্য জীবজাতি সৃজন করে? পুরাকালে নাস্তিকগণ যেমন এক প্রকৃতির দোহাই দিয়া ঈশ্বর মানিতেন না, আজকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ঐ দুই মহাশব্দের দোহাই দিয়া ঈশ্বর মানেন না। সকলেই ত জানেন, প্রকৃতি স্বয়ং অন্ধ ও চিৎশক্তিরহিত। একটা অন্ধ শক্তির

অন্ধক্রিয়ার উপর এই বিশ্বপ্রপঞ্চের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ আরোপ করা কি যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত? জড়বাদি পণ্ডিতদিগের ইহা একটী মহৎ ভ্রম, যে তাঁহারা অন্ধ প্রকৃতির স্কন্ধে চিৎশক্তির কার্য্য অর্পণ করেন।

এস্থলে সাংখ্যকার পুরুষ বা চিৎশক্তির অবতারণা করিয়া যথার্থ মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রে অন্ধপঙ্গুর ন্যায় উল্লিখিত। প্রকৃতি অন্ধ ও পুরুষ পঙ্গু; গন্তব্যপথে যাইতে উভয়েই অসমর্থ। কিন্তু যখন পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরূঢ় হয়, তখন পঙ্গু অন্ধকে যথার্থ পথে পরিচালিত করে। সেইরূপ বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারে অন্ধ জড়প্রকৃতি পুরুষ বা চিৎশক্তি দ্বারাই চালিত।

দেখ, বিশ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু হইতে সুবিশাল সূর্য্য অবধি প্রত্যেক বস্তুতে যে চিৎশক্তি বা ঐশ্বরিক বুদ্ধি নিহিত, যাহার গুণে ভৌতিক শক্তিগুলি যাবতীয় ভৌতিক পদার্থকে কয়েক সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত করে এবং যাহার গুণে বিশ্বসংসারে এমন সার্ব্বজনিক সামঞ্জস্য দেদীপ্যমান, সেই চিৎশক্তি সকলের মূলাধার এবং অন্ধ জড় প্রকৃতি তাহার উপাদান মাত্র। তবে কেন সকলে বিজ্ঞানোল্লিখিত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন রূপ মহৎবাক্যে ব্যামোহিত হন? নবোত্থিতে নববিজ্ঞান যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া লোকের মনে ঈশ্বরবিশ্বাস ক্রমশঃ মন্দীভূত করিতে প্রয়াস পায়, তন্মধ্যে ইহা একটী উহার সর্ব্বপ্রধান উপায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

মানবধর্ম্ম।

ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, ইহা লইয়া আজকাল সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের ভিতর বিস্তর বাদানুবাদ চলিত। ইংরাজী প্রতিবাক্য (Religion) লইয়া ইহার অর্থ করিতে গেলে, ইহার ভিতর যে বিশ্বোদার ভাব নিহিত, তাহা আদৌ ব্যক্ত করা হয় না। পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞানোন্নতির সহিত ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত ভাব ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত। তথায় পার্থিব জ্ঞানের যত উন্নতি সাধিত, ইহা ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান হইতে তত বিভিন্ন। তথায় ঐহিক সমাজবন্ধন ও পারত্রিক মঙ্গলসাধনই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, সপ্তম দিবসে ধর্ম্মমন্দিরে পাঁচ জনে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করাই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু প্রাচ্য জগতে ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত ভাব জ্ঞানোন্নতির সহিত ক্রমশঃ বিস্তারিত ও প্রসারিত। তথায় পার্থিব জ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞানের ভিতর অত্যল্প প্রভেদ এবং যে পরিমাণে পার্থিব জ্ঞানের উন্নতি সাধিত, তাহা কেবল ধর্ম্মভাবের স্ফূর্ত্তিতে প্রযুক্ত। তথায় ধর্ম্ম অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুবিমল জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া ইহার বিশ্বোদার ভাব চিরদিন সম্যক ব্যক্ত করে। যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম; যে বস্তুর যে গুণ, তাহাই উহার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অবিনশ্বর জীবাত্মার প্রধান গুণ, অর্থাৎ ইহার প্রধান গুণই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আত্মার সর্ব্বপ্রধান আধার ও সহায়। ধর্ম্ম অনন্তকাল ইহার সাথের সাথী। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন, সামাজিক ও পারিবারিক মঙ্গল সাধন, শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল সাধন, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক মঙ্গল সাধন প্রভৃতি মানবজীবনের সকল প্রকার মঙ্গল সাধনই প্রাচ্য জগতে ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম আমাদের জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মের উপর, সমাজের প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির উপর স্বীয় অনুশাসন পূর্ণভাবে চালায়। ধর্ম্ম আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক সুখের উপায় স্বরূপ এবং ভবপারাবারে আমাদের এক মাত্র কাণ্ডারী।

জগতের ইতিহাসে মানবধর্ম্ম দ্বারা সুমহৎ কার্য্য সম্পাদিত। এক ধর্ম্মই মানবকে পরিবারবর্গে বেষ্টিত ও সমাজবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে লোকালয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে শিক্ষা দেয়। যে জাতীয় সাধনার গুণে তিনি আজ জগতের জীবরাজ, ধর্ম্মই সে বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায়। সত্য বটে, কলি-যুগ বর্দ্ধনের সঙ্গে আধুনিক সভ্যজগতে ধর্ম্মের তাদৃশ সমাদর নাই এবং ইহার পরিবর্ত্তে জ্ঞানের আধিপত্য ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার জাতীয় জীবনে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি একমাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংঘটিত হয়। ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প, আলেখ্যবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, কৃষিকর্ম্ম, জাতীয়তা, দেশাচার, রাজনীতি, সমাজনীতি, দিগ্বিজয় প্রভৃতি সকল বিষয়ে ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র চালক। এমন কি, ধর্ম্মের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি এবং ইহার অবনতিতে সমাজের অবনতি সর্ব্বত্র সংঘটিত হয়।

আধুনিক ধর্ম্মবিজ্ঞান উপদেশ দেয়, ধর্ম্ম মানবহৃদয়ে স্রষ্টা ঈশ্বরের জ্ঞান প্রস্ফুরিত করে, আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে তাঁহাকে অশেষ গুণের পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ দেখায় এবং সংসাররূপ মহাদাবানলে দগ্ধীভূত মানবহৃদয়ে সান্ত্বনাবারি অভিষিঞ্চন করে। ধর্ম্ম সকল দেশে মানবপরিবারকে সুপ্রণালীতে গঠিত করিয়া মানবহৃদয়ে নানা পারিবারিক ভাব স্ফুরণ করে এবং মানবসমাজকে সুপ্রণালীতে ও সুশৃঙ্খলতায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহার জাতীয় উন্নতি সাধনে সম্যক সাহায্য করে। ধর্ম্ম আবার লোকের বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ সমাজে বিষম অনর্থপাত আনয়ন করে। ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে নানাদেশ পূর্ব্বে কিরূপ নর-কণ্ঠ বিনিঃসৃত শোণিতপ্রবাহে প্লাবিত, তাহা ভাবিলে এখনও শরীরে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়। সেইরূপ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সভ্য ইউরোপ-খণ্ডে ধর্ম্মাত্মাগণ ভিন্নমতাবলম্বী বিপক্ষবর্গের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কিরূপে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণাহুতি প্রদান করেন, বা চিরজীবন কারাগারে কিরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহা ভাবিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে সমাজে যাহা কিছু সংঘটিত, তাহা আপাত দর্শনে বিষম অনিষ্টকর হইলেও, পরিণামে উহাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। দেখ, ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে একজাতি অন্য জাতির সংঘর্ষে

আনীত হওয়ায়, পরস্পরের কত জাতীয় উন্নতি সাধিত হয়! ধর্ম্মজীবন মহাত্মাগণ অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধীভূত হইয়া লোকবর্গকে কিরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যান! সেই ভীষণ সমরানল, সেই ভীষণ নরহত্যা, সেই ভীষণ যন্ত্রণারাশির ভিতরও ধর্ম্ম স্বীয় সুবিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করতঃ সকলকে সুখের পথ, শান্তির পথ ও উন্নতির পথ দেখাইয়া দেয়।

পৃথিবীতে যতপ্রকার ধর্ম্ম মানবসমাজে প্রচলিত দেখা যায়, তন্মধ্যে বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, মুসলমান, হিন্দু ও জড়োপাসনা প্রধান। ইহাদের ভিতর কোন না কোন ধর্ম্ম আজকাল কোন না কোন দেশে মানবমন অধিকার করিয়া আছে। আবার প্রত্যেক ধর্ম্ম যৎসামান্য মত-ভেদ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। চিরকালই ধর্ম্মজগতে ধর্ম্মের মতামত লইয়া ঘোরতর বিবাদ-বিসম্বাদ প্রচলিত। এক ঈশ্বরের রাজ্যে এক প্রকার ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য সকল দেশের ধর্ম্মাত্মাগণ সবিশেষ প্রয়াস পান; এমন কি, তাঁহারা পুরাকালীন সহস্র সহস্র ধর্ম্মগ্রন্থ নষ্ট করিয়া মানবের জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার সম্যক লুণ্ঠন করেন এবং শত শত দেবালয় ভগ্ন করিয়া পূর্ব্বতন ধর্ম্মের সমূলোচ্ছেদ সাধন করিতে চেষ্টা পান; কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। এ জগতে কেহই এক ধর্ম্ম স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট পৃথিবীতে ধর্ম্মসম্বন্ধে একমত হওয়া অসম্ভব। যেমন জীবজগতে এমন ঘোরতর জীবসংগ্রামসত্ত্বেও বিভিন্ন-জাতীয় অসংখ্য জীব বর্ত্তমান, সেইরূপ ধর্ম্মজগতেও মতামত সম্বন্ধে এত বিবাদ বিসম্বাদসত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্ম্ম পৃথিবীতে চিরদিন বর্ত্তমান।

শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে সৃষ্টির সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে সনাতন অকৃত্রিম ধর্ম্ম জগতে প্রাদুর্ভূত ছিল; নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা ও যোগাভ্যাসই ইহার প্রধান অঙ্গ। পরে কলিযুগে মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ ও কৃত্রিম জ্ঞানশক্তির প্রবলতাবশতঃ সংসারে কৃত্রিমধর্ম্ম প্রবল হয়। যে সকল ধর্ম্ম লোকবিশেষকর্ত্তৃক প্রচারিত, তাহাই কৃত্রিমধর্ম্ম; এজন্য খ্রীষ্টাদি কৃত্রিম ধর্ম্মের আজকাল এত প্রাদুর্ভাব ও এত প্রতিপত্তি। ইহাদের অত্যাচারে সনাতন অকৃত্রিম ধর্ম্ম এখন সকল দেশে লুপ্তপ্রায়। এই সকল ধর্ম্ম ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, আমাদের স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, প্রত্যেক ধর্ম্মে দুইটী রূপ বিদ্যমান, একটী ইহার ব্যক্তরূপ (Exoteric form), অপ-

রটী ইহার অব্যক্ত রূপ (Isoteric form)। ইহার অব্যক্ত রূপটী সেই প্রাচীনকালের যোগেশ্বরপ্রকটিত অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত সনাতন অকৃত্রিম ধর্ম্ম। ইহা চিরদিন গূঢ় ও অপরিবর্ত্তনশীল এবং মহাত্মাগণের ভিতর নিবদ্ধ। ধর্ম্মের ব্যক্ত রূপটী সাধারণপ্রচলিত ধর্ম্মবিষয়ক মতামতের সমষ্টি মাত্র এবং ইহা চিরদিন পরিবর্ত্তনশীল, কালোচিত ও দেশোচিত। ধর্ম্মের অব্যক্ত রূপই সকল ধর্ম্মের আদ্যন্তর এবং ইহা যোগেশ্বরপ্রকটিত। গঙ্গোত্রীনিঃসৃত গঙ্গোদকের ন্যায় ইহা চিরদিনই পবিত্র ও বিশুদ্ধ; কিন্তু কালক্রমে মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ ইহা সকল দেশে কলুষিত হইয়া যায়। ধর্ম্মের অব্যক্ত রূপই সকল দেশে ইহার ব্যক্তরূপের আকরস্বরূপ। অজ্ঞ জনসাধারণের বিদ্যাবুদ্ধি যেরূপ বিকশিত, তাহারা যেরূপ সদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, যোগেশ্বরগণ চিরদিন তাহাদিগকে তদনুরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা যাগযজ্ঞ বুঝিতে সক্ষম, তখন যোগেশ্বরগণ তাহাদিগকে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করান। যখন তাহারা মায়াতীত পরব্রহ্মের মায়ারূপ দেখিতে ব্যগ্র, যোগেশ্বরগণ তাহাদিগকে ত্রিমূর্ত্তি বা লৌকিক ঈশ্বর দেখান। এইরূপে ধর্ম্মের ব্যক্তরূপটী চিরকালই পরিবর্ত্তিত দেখা যায়। বশিষ্ঠ, অঙ্গিরস, ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ, ঋষভদেব, কপিলদেব, জরথুস, হারমিজ, মুষা, কনফুউসাস্, বুদ্ধদেব, ঈষা, শঙ্করাচার্য্যদেব, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি যাবতীয় মহাত্মাগণ জগতে সময়োচিত ও দেশোচিত ধর্ম্মমত প্রচার করেন। তদ্ভিন্ন সংসারে ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিবার উপায়ান্তর নাই।

যেমন জ্ঞানজগতে মধ্যে মধ্যে অসাধারণ ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাত্মা কবিবর বা পণ্ডিতবর আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানের সম্যক উন্নতি সাধন করেন, সেইরূপ ধর্ম্মজগতেও মধ্যে মধ্যে এক এক মহাত্মা আবির্ভূত হন এবং দুন্দুভিস্বরে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করতঃ ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া যান। তাঁহারা সকলেই সময়োচিত ও দেশোচিত ধর্ম্মমত প্রচার করেন। যে ধর্ম্মমত সাধারণে বুঝিতে সক্ষম, তাহাই সকলের নিকট আদরণীয় হয় এবং তাহাই সমাজে স্থায়ী হয়। এজন্য যাঁহারা দেশকাল বুঝিয়া ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাঁহারাই সংসারে পূজ্য হন এবং তাঁহাদের দ্বারাই জগৎ সবিশেষ উপকৃত হয়।

আবার প্রত্যেক মানবধর্ম্মকে অন্য প্রকারে বিশ্লিষ্ট করিলে, আমরা

বুঝিতে পারি যে, ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম ও বৈশেষিক ধর্ম্ম। সকল ধর্ম্মের মৌলিক সাধারণ বিশ্বাস ও মতামতের সমষ্টিকে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলা উচিত। ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা এবং চুরি করা মহাপাপ ইত্যাদি ধর্ম্মের সাধারণ মতামত প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অন্তর্গত। যাবতীয় ধর্ম্ম ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও ইহাদের অন্তর্গত প্রাকৃতিক ধর্ম্ম এক প্রকার ও এক সমতলক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। মানবপ্রকৃতি যেমন সকল দেশে অপরিবর্ত্তনীয়, প্রাকৃতিক ধর্ম্মও সেইরূপ সকল দেশে অপরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু ইহা সকল দেশে বৈশেষিক ধর্ম্মের সহিত অপরিহার্য্যরূপে জড়িত ও মিশ্রিত। এমন কি, বৈশেষিক ধর্ম্মের প্রবলতাবশতঃ প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রত্যেক মানবধর্ম্মে লুপ্ত-প্রায়। কিন্তু ধর্ম্মের বৈশেষিক অংশটী দেশ বিশেষে ও জাতি বিশেষে উদ্ভূত। এই অংশ লইয়াই এক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের সহিত চিরদিন বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত। জাতীয়তা রক্ষা করিয়া স্বজাতিকে অন্য জাতি হইতে বিশিষ্ট রাখিবার জন্য সকল দেশের জনসাধারণ কেবল বৈশেষিক ধর্ম্মপালনে সমধিক ব্যগ্র। এ বিষয়ে প্রকৃতি স্বয়ং সকলকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।

প্রাকৃতিক ধর্ম্ম।

প্রাকৃতিক ধর্ম্মের স্বরূপ ভালরূপ বুঝিতে হইলে, মানবের প্রকৃতি কিরূপ, তাঁহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিশেষত্ব কি, তিনি সমাজবদ্ধ ও পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া কিরূপ সুখদুঃখে দিনযাপন করেন, ইত্যাদি নানাবিষয় পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য।

এ জগতে মানব শরীরের গঠন, উপাদান ও ক্রিয়া সম্বন্ধে অন্যান্য জীবের সমতুল্য হইলেও মস্তিষ্কের অধিক স্ফূর্ত্তির জন্য তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে উহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহারা সকল বিষয়ে প্রকৃতিদত্ত নৈসর্গিক জ্ঞানকর্ত্তৃক চালিত। কিন্তু মানবের জ্ঞানশক্তি যে পরিমাণে স্ফুরিত, তাঁহার নৈসর্গিক জ্ঞান সেই পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত। তাঁহার মস্তিষ্কের বাহ্যস্তর যতোধিক স্ফুরিত, তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্নায়ুগ্রন্থি সেই পরিমাণে

অপগত। অসভ্য মানবের ঘ্রাণশক্তি যতদূর তীক্ষ্ণ, সভ্য মানবের ততদূর নহে।

অন্যান্য জীব প্রকৃত্যনুযায়ী সহজজ্ঞানে চালিত হইয়া সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সাম্যাবস্থায় অবস্থিত। উহাদের সুখের ভাগ যেমন অল্প, দুঃখের ভাগও তেমনি অত্যল্প। বিজ্ঞানের মতে আদিম অবস্থায় মানবও নৈসর্গিক জ্ঞান কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সাংসারিক সুখ দুঃখের বৈষম্যে পতিত না হওয়ায় প্রাকৃতিক সাম্যাবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেন। পরে বহুকাল ব্যাপিয়া জাতীয় সাধনার গুণে তাঁহার মানসক্ষেত্রে নৈসর্গিকজ্ঞানখর্ব্বকারিণী জ্ঞানশক্তি উদ্ভূত হয়। এই জ্ঞানশক্তি অনুশীলন করিয়া তিনি অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকিতে আরম্ভ করেন। এই স্থলেই তাঁহার সভ্যতার সূত্রপাত হয় এবং এই সময় হইতেই তিনি প্রকৃতিদেবীর কোপানলে পতিত হইয়া সংসার সমুদ্রের সুখদুঃখ-রূপ মহাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হন। যে সকল আপদবিপদ ও রোগশোক দ্বারা তিনি অহরহঃ নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম ভাবে প্রপীড়িত হন, সে সকল প্রকৃতিদেবীর ক্রোধ সম্ভূত জানিবে। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, একটী অশেষ প্রীতিপদ সুকুমার সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবে, অথচ উহার মাতাকে তজ্জন্য কতই না দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়? এই বিষয় লইয়া অনেকে দয়াময় ঈশ্বরে দোষারোপ করেন; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা বলেন, অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকাই ঐরূপ যন্ত্রণাভোগের প্রধান কারণ।

মানব প্রকৃতিদেবীর বিদ্রোহী সন্তান। তন্নির্দ্দিষ্ট সহজ পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি ভ্রমসঙ্কুল কৃত্রিম জ্ঞানবলে এ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির অভিলাষী। তাঁহার সভ্যতাবর্দ্ধনই প্রকৃতিদেবীর সহিত মহা সংগ্রামসঙ্ঘটন। যে কালসময়ে তিনি প্রকৃতিদেবীর কোপানলে পতিত, যে সময়ে তিনি দুর্ব্বল, অসহায় ও নিরুপায় হওয়ায় প্রকৃতি কর্ত্তৃক পদে পদে দলিত, সেই কালসময়ে বুদ্ধিশক্তিই তাঁহার একমাত্র সহায়। এই বুদ্ধিশক্তি বলে তিনি পুরাকাল হইতে ধর্ম্মরূপ কল্পবৃক্ষের সুশীতল অনাতাপে থাকিয়া সংসারের বিপদ আপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিক্ষা করেন। যথার্থ বলিতে কি, ধর্ম্মই তাঁহাকে সংসারের অশেষ বিপদ রাশির মধ্যে প্রকৃত সুখের পথ প্রদর্শন করে। ভবসাগরে ধর্ম্মই তাঁহার পোতদীপস্বরূপ, স্বীয় সুবিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া

প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে তাঁহাকে সুখবন্দরে লইয়া যায়। ধর্ম্মই অসহায় পতিত মানবের উদ্ধারসাধনকর্ত্তা। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম মতে ঈষা মানবের পরিত্রাতা; কিন্তু বিজ্ঞানের মতে এতদিন ধর্ম্ম তাঁহার পরিত্রাতা ছিলেন; এখন বিজ্ঞান ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে জ্ঞানশক্তিকে তাঁহার পরিত্রাতা স্বরূপ দেখায় এবং শত মুখে ধর্ম্মের নিন্দাবাদ ঘোষণা করে।

এ জগতে মানব ব্যষ্টিভাবে অতি দুর্ব্বল ও অসহায় জীব; কিন্তু সমষ্টি-ভাবে তিনি প্রভূত শক্তির আধার। তিনি সমাজবদ্ধ হইয়া সমবেত-চেষ্টা দ্বারা ও জাতীয় সাধনার গুণে স্বকীয় অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে শিক্ষা করেন। ইহার বলে তিনি চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক শত্রুবর্গকে পরাস্ত করিতে সচেষ্ট হন, নিকৃষ্ট জীবজন্তুগণকে স্বায়ত্ত করিয়া উহাদের দ্বারা স্বকীয় সুখ-বর্দ্ধন করাইয়া লন এবং স্থলবিশেষে অমিতবিক্রমশালিনী রহস্যময়ী প্রকৃতি-দেবীর শক্তিবিশেষকে স্বপ্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত করিতে শিক্ষা করেন। জনসমাজে বসবাসই তাঁহার এতাদৃশ সুখভোগ ও জাতীয় উন্নতিসাধনের মূলীভূত কারণ। যে জাতীয় সাধনার গুণে তিনি এ জগতে এতদূর উন্নতি লাভ করেন, ধর্ম্মই তাহার প্রধান উপায় স্বরূপ এবং যে সমাজের নিকট তিনি স্বীয় উন্নতির জন্য এতদূর ঋণে আবদ্ধ, সেই সমাজের বন্ধনই ধর্ম্মের এক মহৎ উদ্দেশ্য।

আবার মানব সমাজবদ্ধ হওয়া অবধি পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া লোকা-লয়ে বসবাস করেন। অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিবার লইয়াই এক এক সমাজ গঠিত। সামাজিক অসংখ্য সম্বন্ধ নিরূপণ করতঃ উহাদিগকে সুশৃঙ্খলতার সহিত চালনা করা যেমন প্রাকৃতিক ধর্ম্মের একটী মহৎ কর্ত্তব্য, সেইরূপ পারিবারিক অসংখ্য সম্বন্ধ নিরূপণ করতঃ উহাদিগকে সুশৃঙ্খলতার সহিত চালনা করাও ইহার আর একটী মহৎ কর্ত্তব্য। এ কারণে অতি পুরাকাল হইতে ধর্ম্ম সকল দেশে বিবাহাদি সংস্কারগুলি স্বহস্তে পরিচালন করে এবং সমাজের পারিবারিক গঠনপদ্ধতি অটুট রাখিবার জন্য সর্ব্বত্র নানাবিধ অবশ্য প্রতিপাল্য রীতিনীতি স্থাপন করে।

এখন মানবের মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানবমনকে বিশ্লিষ্ট করিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তিন

প্রকার প্রবৃত্তি লইয়া মানবমন গঠিত, যথা (১) স্বার্থ প্রবৃত্তি, (২) পরার্থ প্রবৃত্তি (৩) বুদ্ধিবৃত্তি। ইহাদের মধ্যে স্বার্থপ্রবৃত্তিগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বা মানবরিপু এবং পরার্থ প্রবৃত্তিগুলি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি। স্বার্থ প্রবৃত্তিগুলি অযথা চরিতার্থ হইলে, আত্মসুখ বর্দ্ধন হয় বটে, কিন্তু উহাতে সমাজের প্রভূত অমঙ্গল সাধিত হয়; এ জন্য ইহারা সামাজিক মানবের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। আবার পরার্থ প্রবৃত্তিগুলি যত অধিক চালিত হয়, সমাজের তত মঙ্গল সাধিত হয়; এ জন্য ইহারা সামাজিক মানবের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। এখন দেখা যায়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি মানবহৃদয়ে যত অধিক বলবতী, ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি ততদূর নয়। সাধারণতঃ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অনেকস্থলে উহার নিকট পরাভব স্বীকার করে। এখন জিজ্ঞাস্য, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি কেন মানবহৃদয়ে এত বলবতী? বিজ্ঞান ইহার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করে। প্রথমতঃ স্বার্থ প্রবৃত্তিগুলি দেহযাত্রানির্ব্বাহ, সংসারযাত্রানির্ব্বাহ ও বংশবৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রকৃতি স্বয়ং উহাদিগকে মানবহৃদয়ে বলবতী করিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ সমধিক অনুশীলন বশতঃ উহারা হৃদয়ে এখন এত বলবতী; এজন্য মানব নিকৃষ্ট জন্তু অপেক্ষা অধিক কামপরায়ণ। তৃতীয়তঃ নিকৃষ্ট জীবোৎপন্ন মানব চিরকাল ঐ সকল স্বার্থ প্রবৃত্তিগুলি সম্যক চরিতার্থ করেন বলিয়া উহারা এখন তদীয় হৃদয়ে এত বলবতী। তিনি জগতে মৎস্যকূর্ম্মাদি রূপে বিচরণ করুন বা মানবরূপে বিচরণ করুন, সকল অবস্থায় তাঁহাকে স্বার্থ প্রবৃত্তি সম্যক চরিতার্থ করিতে হয়। কিন্তু যতদিন হইতে তিনি সমাজবদ্ধ হইয়া লোকালয়ে বসবাস করেন, ততদিন পরার্থ প্রবৃত্তিগুলি সমাজের মঙ্গলের জন্য, স্বজাতির উন্নতির জন্য তদীয় হৃদয়ে অঙ্কুরিত ও ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়াছে; এজন্য ইহারা এখনও তাদৃশ বলবতী হয় নাই।

এখন মানব সংসারে এরূপ অবস্থায় অবস্থিত, যে তিনি স্বার্থপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া সকল বিষয়ে স্বার্থপর হইলেও পরার্থ প্রবৃত্তি চালনা করিয়া জনসমাজে বসবাস না করিলে তাঁহার একদণ্ড চলে না; অতএব তাঁহার স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তিতে অনুক্ষণ বিরোধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইহাদের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া তাঁহাকে সংসারে সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য ধর্ম্ম ও

ধর্ম্মশাস্ত্র বিরচিত। সুতরাং ধর্ম্মবিজ্ঞান উপদেশ দেয়, সমাজের উপযোগিতানুসারে স্বার্থপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করতঃ উহাদের অযথা চরিতার্থতা নিবারণ করিয়া পরার্থ প্রবৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তি দ্বারা জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা এবং বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া উহাদের ভিতর পরস্পর সামঞ্জস্য স্থাপন করাই প্রাকৃতিকধর্ম্মের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, ধর্ম্মসম্বন্ধে বিজ্ঞান যাহা উপদেশ দেয়, তাহাই কি অমোঘ সত্য? ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি কি সামাজিক মানবে সমাজের মঙ্গলের জন্যই অঙ্কুরিত ও ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়াছে? সমাজে বসবাস করিবার জন্যই কি ইহাদের একমাত্র প্রয়োজন? তদ্ভিন্ন কি ধর্ম্মের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই? ইহাতে বোধ হয়, বিজ্ঞানের মতে ধর্ম্ম কেবল আমাদের ঐহিক ক্ষণস্থায়ী ভাব মাত্র; ইহজীবন নষ্ট হইলে, ইহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেবলমাত্র সমাজের মঙ্গলের জন্য যে ধর্ম্মকর্ম্ম আবশ্যক, সে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার কি প্রয়োজন? যদি জনসাধারণের মনে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়, যে ধর্ম্ম কেবল সমাজের জন্য আবশ্যক, বল দেখি, কোন্ ব্যক্তি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন বা ইহাতে মন প্রাণ সমর্পণ করেন? যাহা হউক, বিজ্ঞানের কথায় আমাদের মন কিছুমাত্র প্রবোধ মানে না; অতএব অধ্যাত্মবিজ্ঞান এ বিষয়ে কিরূপ নির্দ্দেশ করে, তাহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ইহার মতে যুগধর্ম্মানুসারে মানবের আধ্যাত্মিকতা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি এ কলিযুগে এত বলবতী এবং সেই সঙ্গে তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি এত নিস্তেজ। ইহার মতে ধর্ম্ম তাঁহার জীবাত্মার চির সহচর ও অনন্তকাল ব্যাপিয়া সাথের সাথী এবং ইহার অবিনশ্বর ভাব।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।

(হিতোপদেশ)

"যে ধর্ম্ম মৃত্যুর পর আত্মার অনুগমন করে, সেই ধর্ম্মই ইহার এক মাত্র প্রকৃত বন্ধু। তদ্ভিন্ন অপরাপর যাবতীয় বস্তু শরীরের সহিত নাশ প্রাপ্ত হয়।"

ধর্ম্ম মানবের ক্ষণবিধ্বংসী ঐহিক সামাজিক ভাব নহে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান বলুক, পাশ্চাত্য ধর্ম্মবিজ্ঞান বলুক, যে যাহাই বলুক না কেন, উহাদের কথায় আমাদের কর্ণপাত করা আদৌ উচিত নয়। উহারা আমাদের সাম্া-

ত্মিক ও বাহ্যসম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া, যে সকল সিদ্ধান্ত করে, তাহা ত সর্ব্বৈব ঐকদেশিক ও আংশিক।

আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে ধর্ম্মই আমাদের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন; ইহাই আমাদিগকে অনন্তকাল ধারণ করিয়া থাকে। যে জীবাত্মা পরব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ত্রিগুণাত্মিকা মায়াদ্বারা কিছুদিনের জন্য এ জড়-দেহে নিবদ্ধ, যে জীবাত্মা যুগধর্ম্মানুসারে ক্রমশঃ কলুষিত ও অধঃপতিত, সেই জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতা স্ফূর্ত্তির জন্য ধর্ম্মই ইহার প্রধান সহায়। যে জীবাত্মা ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করায় কর্ম্মফলানুসারে মন, শরীর ও বাহ্যজগতের সহিত বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ও তজ্জন্য অশেষ সুখ দুঃখের ভাগী, সেই জীবাত্মাকে এ সংসারে যথার্থ সুখের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য ধর্ম্মই ইহার প্রধান সহায়। যে জীবাত্মা কর্ম্মফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য, সাত্ত্বিকভাবের স্ফূর্ত্তি দ্বারা ইহার কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করতঃ ইহাকে নির্ব্বাণোন্মুখ করি-বার জন্য ধর্ম্মই ইহার প্রধান সহায়। ধর্ম্মই জীবাত্মাকে প্রকৃত শ্রেয় দেখাইয়া দেয় এবং ইহাকে প্রকৃত পথের পথিক করে। ধর্ম্মই জীবাত্মাকে অনন্ত উন্ন-তির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করাইয়া দেয়। অতএব আধ্যাত্মিকতার স্ফূর্ত্তি দ্বারা জীবাত্মার প্রকৃত উন্নতিসাধন করাই প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা উচিত। যে যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ দ্বারা স্থূলদেহের স্থূলত্ব বিনাশ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণ করা যায়, এমন যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? অন্যান্য ধর্ম্ম কেবল অসার নিরাকারো-পাসনা উপদেশ দিয়া ও ঈশ্বরোদ্দেশে কতকগুলি ভক্তিব্যঞ্জক বাক্যসমন্বয় উচ্চা-রণ করাইয়া আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু তাঁহাতে তাদৃশ ফললাভ হয় না।

আত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তির পর, মানবমনের উৎকর্ষসাধনই প্রাকৃতিক ধর্ম্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। মানব সমাজবদ্ধ ও পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া লোকালয়ে বসবাস করায় তিনি স্বজাতি ও স্বজনবর্গের সহিত বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই সকল বিবিধ সম্বন্ধবশতঃ তাঁহার মনে অনুক্ষণ বিবিধ উৎকৃষ্ট ভাব উদিত হয়।

ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, সৌভ্রাত্র, দয়া ও দাক্ষিণ্যাদি যে সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্মভাব সমাজে বসবাসের জন্য একান্ত আবশ্যক এবং যাহা অনুশীলন করিয়া তিনি প্রভূত ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, ধর্ম্ম উহাদের প্রকৃত অনুশীলন-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া মানবমনে উহাদের সম্যক স্ফূর্ত্তি করিতে চেষ্টা পায় এবং প্রত্যেক ভাবকে বিমল বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দের উৎস করিয়া দেয়।

এখন নিরাকার ঈশ্বরে ঐ সকল সদ্‌গুণ আরোপিত করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার উপাসনা কর, অথবা ভক্তিভাবে তাঁহার সাকার প্রতিমূর্ত্তির পূজা ও অর্চ্চনা কর, উভয় প্রকার আরাধনায় তোমার ভক্তিবৃত্তি সম্যক স্ফুরিত হয়। কিন্তু হৃদয়ের অন্যান্য ভাবশিক্ষা কোন অলৌকিকগুণসম্পন্ন মহাপুরুষের দৃষ্টান্তানুসারে চরিত্রগঠন করিলেই হয় না। এ বিষয়ে ঈশ্বর যদি স্বয়ং মানবরূপে সংসারে আবির্ভূত হইয়া সাংসারিক লীলা প্রদর্শন করেন এবং ঐ সকল ভাবের পূর্ণ অভিনয় করেন, তাঁহার লীলাপাঠে বা শ্রবণে আমাদের যেরূপ ভাবশিক্ষা হয়, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। ইহারই জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণন করাইয়া আমাদিগকে ভাববিষয়ে যেরূপ শিক্ষা দেয়, তাহা ধর্ম্মজগতে অতুলনীয় এবং তাহা অন্যান্য ধর্ম্ম ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে না।

যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মানবহৃদয়ে স্বভাবতঃ বলবতী, যাহাদের দুর্নিবার্য্য বেগবশতঃ মানব সদা বিপথে চালিত হন এবং যাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় সমাজধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তাহাদের বশীকরণ ও দমন প্রাকৃতিক ধর্ম্মের তৃতীয় উদ্দেশ্য। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড়রিপু যে কেবল সমাজের অপকারী, তাহা নহে; ইহারা মানবকে সদা পাপপঙ্কে লিপ্ত করায় এবং জীবাত্মার অধোগতি আনয়ন করে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ। (গীতা)

"কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী নরকের দ্বারস্বরূপ; ইহারা জীবাত্মার নাশ সাধন করে; অতএব ইহাদিগকে সদা পরিত্যাগ করিবে।"

উপরোক্ত মানবরিপুগুলি দমন করিবার জন্য ধর্ম্ম সকল দেশে নানাবিধ উপদেশ দেয়, নানাবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করে, এমন কি উহাদের

সমূলোৎপাটনের জন্য নিবৃত্যাদি মার্গ সৃষ্টি করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কলিযুগ বর্দ্ধনের সঙ্গে উহারা এখন আরও বলবৎ। যাহা হউক, প্রাকৃতিক ধর্ম্মের এই উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে সকল ধর্ম্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মানা উচিত। বল দেখি, পাঠক! রিপু দমনের জন্য, ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য হিন্দুধর্ম্ম যতদূর উপদেশ দেয়, যতদূর ক্রিয়াযোগের ব্যবস্থা দেয়, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়? যোগসাধন, তপশ্চরণ প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গগুলি শাস্ত্রে উপদিষ্ট, সে সকল ক্রিয়াযোগ কি অন্যান্য ধর্ম্ম একবার স্বপ্নেও ভাবিতে পাবে? অন্যান্য ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য কেবল কতকগুলি অসার মৌখিক উপদেশ দেয় মাত্র এবং ইহাতে অধিকাংশস্থলে উপদেশ ও ক্রিয়ার বিরোধই উপস্থিত হয়। যাহা এক কর্ণদ্বারা শ্রুত হয়, তাহা অপর কর্ণ দ্বারা নিঃসৃত হইয়া যায় মাত্র। পরন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নানা সদুপদেশ দেয় বটে, কিন্তু উহাদিগকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত করিবার জন্য সেই সঙ্গে নানা ক্রিয়াযোগের ব্যবস্থা করে; তাহাতেই লোকের উত্তমরূপ সুশিক্ষা হয়।

শরীরের স্বাস্থ্যবর্দ্ধন ও দীর্ঘায়ুলাভ প্রাকৃতিক ধর্ম্মের চতুর্থ উদ্দেশ্য। ইহার জন্য ধর্ম্ম নানাদেশে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে এবং উপবাসাদি ব্রতপালনে সকলকে প্রোৎসাহিত করে। যেমন মানবজীবনের সুখ শরীরের স্বাস্থ্যের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে, ধর্ম্মও সেইরূপ যাহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য ইহা সবিশেষ সচেষ্ট। ইহা ধর্ম্মের আদৌ অনধিকার চর্চ্চা নহে।

যে পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া লোকালয়ে বসবাস করায় দুর্ব্বল অসহায় মানবের অনন্ত সুখ বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই পরিবারের গঠন ও সংরক্ষণ প্রাকৃতিক ধর্ম্মের পঞ্চম উদ্দেশ্য। জাতীয় জীবনের প্রথম অবস্থায় যে মানব মাতার সহিত নিরুপায় শৈশবকালে একমাত্র পরিচয় পান, সেই মানবকে ধর্ম্ম পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি যাবতীয় স্বজনবর্গের সহিত ভালরূপ পরিচিত করায় এবং চিরদিন পরিবারবর্গে বেষ্টিত করিয়া একত্র বসবাসের জন্য তদীয় হৃদয়ে বিবিধ পারিবারিক ভাব সম্যক স্ফুরণ করে। ইহারই জন্য পিতামাতা পুত্রকন্যার জন্য অপত্যস্নেহে এতদূর পরিপ্লুত, পুত্রকন্যা পিতামাতার প্রতি এতদূর ভক্তিমান, ভ্রাতায় ভ্রাতায় এতদূর সদ্ভাব ও প্রণয় এবং দম্পতির ভিতর

এতদূর প্রেম ও ভালবাসা বৰ্দ্ধিত। এই পারিবারিক সংস্থান অটুট রাখিবার জন্য ধর্ম্ম সকলদেশে পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য ভালরূপ নির্দ্দেশ করে এবং পরিবার মধ্যে ব্যভিচারে যে কত মহাপাতক ও মহাপাপ, তাহাও ইহা ভালরূপ নির্দ্দেশ করে। এই উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে হিন্দুধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানিতে হয়। বল দেখি, জগতে হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় কোন্ ধর্ম্ম পারিবারিকভাব এতদূর স্ফুরণ করে এবং স্ত্রীপুত্র ব্যতীত অন্যান্য স্বজনবর্গ লইয়া এতদূর ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করিতে শিখায়?

যে সমাজে বসবাস দরুণ মানবের এতদূর জাতীয় উন্নতি সাধিত, যে সমাজে বসবাস ব্যতীত তাঁহার উপায়ান্তর নাই, সেই সমাজের বন্ধন ও পরিচালন প্রাকৃতিক ধর্ম্মের ষষ্ঠ উদ্দেশ্য। এই সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্ম্ম স্ব স্ব সমাজে একপ্রকার ঈশ্বরোপাসনা বা দেবারাধনাপদ্ধতি চালিত করিয়া জনসাধারণকে এক পথের পথিক করে। ইহারই জন্য ধর্ম্ম বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে, পরলোক সম্বন্ধে, ঐহিক সুখদুঃখের কারণসম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ মতামত প্রচার করিয়া জনসাধারণের সরল বিশ্বাসকে একপথে চালিত করে। ইহারই জন্য ধর্ম্ম মানবজীবনের বিবাহাদি অত্যাবশ্যকীয় ঘটনা সম্বন্ধে এক প্রকার সংস্কার ও আচারব্যবহার প্রচালিত করিয়া সমাজ মধ্যে যথেচ্ছাচার নিবারণ করতঃ একদেশস্থ বা কয়েক দেশস্থ যাবতীয় লোককে একরজ্জুতে আবদ্ধ করে এবং সুশৃঙ্খলতার সহিত মানবসমাজকে চালায়। ইহারই জন্য ধর্ম্ম সমাজস্থ সকল লোকের ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে চরিত্রগঠনোদ্দেশে কতকগুলি অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়মাবলি ও রীতিনীতি প্রচারিত করে। বিজ্ঞান বলে, ইহারই জন্য যে সকল কর্ম্ম সমাজের মহা অনিষ্টকর এবং যাহা সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইলে সমাজধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সেই সকল কর্ম্মকে ধর্ম্ম সকলদেশে মহাপাপ নামে অভিহিত করে এবং চিরদিনের জন্য উহাদিগকে অভিশপ্ত করে? সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম সমাজের অশেষ কল্যাণকর, যাহাদের অনুষ্ঠানে সমাজের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও উন্নতিসাধন হয়, সেই সকল কর্ম্মকে ধর্ম্ম সকলদেশে মহাপুণ্য আখ্যা প্রদান করে এবং সকলকে উহাদের অনুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত করে।

এই উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে হিন্দুধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয়। বল দেখি, পাঠক! কোন্ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় স্বসমাজকে এত

নিগড় বন্ধনে আবদ্ধ করে? জাতিভেদাদি প্রবর্ত্তিত করিয়া ইহা রাজাধিরাজ হইতে পথের কাঙ্গাল পর্য্যন্ত সকলকে এক রজ্জুতে সমভাবে বাঁধে। বিবাহাদি বিষয়ে ইহা যে সকল সংস্কার ও রীতিনীতি চালিত করে, তাহাও জগতে অতুলনীয়।

মানববুদ্ধির অগম্য, জীবন ও বিশ্বসম্বন্ধে গূঢ় রহস্যগুলি সরল বিশ্বাস দ্বারা মীমাংসা করাই ধর্ম্মের সপ্তম উদ্দেশ্য। এ পৃথিবীর আদি কোথায়, অন্তই বা কোথায়, আমরা কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় বা যাইব ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে স্বতঃ উত্থিত হয়। এই সকল কূট-প্রশ্ন মীমাংসা করিবার জন্য আমরা আমাদের উন্নত মার্জ্জিত বুদ্ধি যতই কেন চালনা করি না, আমরা চিরদিন "যে তিমিরে, সেই তিমিরে" থাকি। যে স্থলে আমাদের বুদ্ধিশক্তি পরাস্ত, সে স্থলে আমাদের সরলবিশ্বাস বিজয়ী। ধর্ম্ম সরলবিশ্বাসে ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করাইয়া ঐ সকল অজ্ঞেয় বিষয়ে আমাদের স্বাভাবিক চিরপ্রদীপ্ত কৌতূহল-শিখা নির্ব্বাপিত করে। সকল ধর্ম্মের মূল-ভিত্তি কতকগুলি সরল বিশ্বাসের উপর প্রোথিত। ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস প্রায় সকল ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অষ্টম উদ্দেশ্য সুমহৎ ও মহোচ্চ। দুঃখময়, পাপময় ভবসংসারে ধর্ম্ম দুর্ব্বল ও অসহায় মানবের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু। তিনি কঠোরস্বভাবা প্রকৃতি দেবী কর্তৃক যে পরিমাণে প্রপীড়িত ও ক্লেশিত, তিনি সেই পরিমাণে ধর্ম্মরূপ মাতৃক্রোড় আশ্রয় করেন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া তিনি জগতের যাবতীয় বিপদ্ ও আপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিক্ষা করেন। যখন তিনি দুঃখসাগরে বা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হন, তখন ধর্ম্মই অমৃতবর্ষী হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধারসাধন করে। যখন তিনি রোগশোকে জর্জ্জরীভূত হন, তখন ধর্ম্মের অমৃতময়কাহিনী শ্রবণে আশ্বাসিত হইয়া তিনি সংসারের সকল জ্বালা ও যন্ত্রণা বিস্মৃত হন।

সর্ব্বাবাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দ্দিতোঽপি বা
স্মরন্মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ।
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম। (চণ্ডী)

"সর্ব্বপ্রকার ঘোর বিপদে পতিত হইয়া ও অশেষ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া যে ব্যক্তি আমার নাম লন, তিনি বিপদ হইতে স্বতঃ মুক্তিলাভ করেন। আমার নামের এমন মাহাত্ম্য, যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করেন, সিংহাদি হিংস্র জন্তুগণ, দস্যুগণ ও শত্রুগণ তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া পলায়ন করে।" বস্তুতঃ ধর্ম্মের এরূপ আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়াই আমরা দুঃখময় মানবজীবন অনায়াসে বহন করিতে শিক্ষা করি। ধর্ম্মধন প্রাপ্ত হইয়াই আমরা দুস্তর ভবসাগর অনায়াসে পার হই। ধর্ম্মই ভবসাগরে আমাদের ভেলাস্বরূপ।

এস্থলে তথা-কথিত অত্যুন্নত, অতিদর্পী বিজ্ঞান ধর্ম্মের উপর উপহাস্ করিয়া বলে, বিপদে পতিত হইয়া ঈশ্বরকে ডাকা কেবল দুর্ব্বল মনের প্রবোধ মাত্র। রোগগ্রস্ত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইলে, কাতরকণ্ঠে ভগবানের নাম লওয়ায় মনে সাহস বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু যন্ত্রণার কিছুমাত্র লাঘব হয় না। কিন্তু রীতিমত চিকিৎসা করাইবার জন্য উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞানের আশ্রয় লইলে সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দেখ, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই। তুমি রোরুদ্যমান হইয়া সহস্রবার ঈশ্বরকে ডাক না কেন, কঠোরস্বভাবা প্রকৃতিদেবী স্বীয় ভবিতব্য ঘটাইবেই ঘটাইবে; তবে কেন অনর্থক ঈশ্বরকে ডাকিয়া জিহ্বা অপবিত্র কর? মনে কর, বিজ্ঞানের কথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য এবং বিধাতৃবিহিত মার্গ উল্লঙ্ঘন করা আমাদের সাধ্য নয়; তথাচ আমাদের চতুর্দ্দিকে বিপদরাশি অনুক্ষণ এত ঘনীভূত, যে ঈশ্বররূপ আধার ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। বিজ্ঞানই বল, দর্শনই বল, যে যাহাই বলুক না কেন, যে যাহাই করুক না কেন, এস্থলে সকলের দর্প সম্যক চূর্ণ এবং এস্থলে সকলেই মানবের প্রকৃত বন্ধু ধর্ম্মের নিকট নতশির। বিজ্ঞান যতই কেন আস্ফালন করুক না, বিজ্ঞান অনেক সময়ে আমাদের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারে না। বিজ্ঞান এক মারাত্মক রোগের ঔষধ আবিষ্কার করে; কিন্তু প্রকৃতিদেবী বিদ্রোহী মানবকে শাস্তি দিবার জন্য অন্য উৎকট রোগরূপ মহাবজ্র তদীয় শিরে আঘাত করে। যখন বিসূচিকাবিষ ক্ষীণবীর্য্য হইয়া আইসে, উগ্রবীর্য্য প্লেগ সংসারে দেখা দেয়। অতএব যে স্থলে বিজ্ঞান তাঁহার দুঃখবিমোচনে অসমর্থ, সে স্থলে বিপদভঞ্জন মধুসূদনই তাঁহার একমাত্র বন্ধু।

এই মৃত্যুময় ভবসংসারে নিষ্ঠুর কাল স্বীয় করালবদন ব্যাদানপূর্ব্বক অহরহঃ সকল মানবকে গ্রাস করিতে উদ্যত। উহার বিভীষিকাময় মূর্ত্তি দর্শনে সমগ্র মানবজাতি সদা শঙ্কিত, সদা অস্থিরচিত্ত। আমরা জীবনকে যত অধিক ভালবাসি, মৃত্যুকে তত অধিক ভয় করিয়া থাকি। বিজ্ঞানের মতে মৃত্যু প্রকৃতির অপরিহার্য্য নিয়তি বা পরিণাম বিশেষ। কিন্তু ধর্ম্ম মৃত্যু-রূপ বিষধরের বিষদন্ত ভগ্ন করিয়া দেয়। ধর্ম্মবল প্রাপ্ত হইয়া আমরা মৃত্যুকে অম্লানবদনে, সহাস্যবদনে, বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করি। পরলোক বা মানবের অন্ত ঘোরান্ধকারে আবৃত থাকিলেও, ধর্ম্ম স্বীয় সুবিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া পরলোককে আমাদের চক্ষে অনন্ত সুখের আগার স্বরূপ দেখায়, উহার দ্বার স্বরূপ মৃত্যুকে ধার্ম্মিকদিগের নিকট সহজ ও সুগম করিয়া দেয়; জনসাধারণকে ইষ্টপথে চালিত করিবার জন্য নরকের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া অধার্ম্মিকদিগের নিকট মৃত্যুকে ভীষণ হইতে ভীষণতর করে।

প্রাকৃতিক ধর্ম্মের এই সকল মহৎ উদ্দেশ্য সকল মানবধর্ম্মের মূলে বর্ত্তমান। তন্মধ্যে কোন কোন ধর্ম্ম ইহার কোন কোন উদ্দেশ্য অল্পাধিক পরিমাণে সংসাধন করে; জগতে এক মাত্র হিন্দুধর্ম্মই প্রাকৃতিকধর্ম্মের সকল উদ্দেশ্য-গুলি অধিক পরিমাণে সংসাধন করিতে চেষ্টা পায়। এজন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অধিক প্রশংসা করা উচিত।

বৈশেষিক ধর্ম্ম।

প্রত্যেক মানবধর্ম্মের অধিকাংশভাগ বৈশেষিক ধর্ম্মে পূর্ণ। বৈশেষিক মতামত, বৈশেষিক পূজাপদ্ধতি, বৈশেষিক রীতিনীতি লইয়াই বৈশেষিকধর্ম্ম বিরচিত। বৈশেষিক ধর্ম্মের মতামত লইয়াই এক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের সহিত চিরদিন বাক্‌বিতণ্ডায় বা বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত। জগতে যখন যে জাতি সামরিক বলে অগ্রগণ্য, তখন সে জাতি অন্য ধর্ম্মের বিলোপসাধন করিয়া স্বীয় বৈশেষিকধর্ম্ম প্রচারে ব্যগ্র।

যদ্যপি এক ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তর হইতে অনেক বিষয়ে মতামত গ্রহণ করে, তথাচ প্রত্যেক ধর্ম্মই জগতে বিভিন্ন ও বিশিষ্ট। ইহার বৈশেষিক অংশ যত অধিক

স্ফুরিত, ইহা অন্যধর্ম্ম হইতে তত অধিক বিভিন্ন। শাসনতন্ত্র যেমন স্বরাজ্যকে নানা প্রাকৃতিক চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া বিশিষ্ট রাখে, প্রত্যেক ধর্ম্মও সেইরূপ স্বসেবকমণ্ডলীকে জগতে বিশিষ্ট রাখিবার জন্য নানা বৈশেষিক মতামত ও আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করে।

মানবপ্রকৃতি সকলদেশে একরূপ হইলেও, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিভিন্ন। তাঁহার শারীরিক প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন, মানসিক প্রকৃতিও ততোধিক বিভিন্ন। আবার প্রত্যেক দেশের শিক্ষা ও দীক্ষা বিভিন্ন। এই সকল নানা কারণবশতঃ যাহা তোমার বিবেচনায় সত্য, আমার বিবেচনায় তাহা অসত্য। যাহা তোমার বিবেচনায় ধর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম, আমার বিবেচনায় তাহা অধর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম। এই প্রকারে পৃথিবীতে এক বিষয় লইয়া নানা মুনির নানা মত প্রচারিত হয় এবং জগতে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও একধর্ম্মান্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায় কালবশে উত্থিত হয়।

অনেকের বিশ্বাস, অতি প্রাচীনকালে একভাষী জগতে একপ্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল; এজন্য ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, ক্যাণ্ডিয়া, পারস্য, গ্রীশ প্রভৃতি পুরাতন সভ্যদেশের প্রাচীনধর্ম্মের আভ্যন্তর প্রায় একরূপ ও একপ্রকার মতামত প্রকাশ করে। কিন্তু কালবশে বিভিন্নদেশে বিভিন্ন ভাষা উত্থিত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ক প্রাথমিক মতামতের বিভিন্ন প্রকার অর্থ ও প্রত্যর্থ হওয়ায় বিভিন্ন মতামত জগতে প্রচারিত হয়। এই প্রকারেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন বৈশেষিকধর্ম্ম কালবশে উত্থিত হয়।

সমাজনেতৃবর্গের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে দেশে যেরূপ বিকশিত, তত্রত্য বৈশেষিকধর্ম্মও সেইরূপ পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়। যে সমাজের যেরূপ অনাটন ও অভাব এবং যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, সে সমাজের বৈশেষিকধর্ম্মও তদনুরূপ। প্রাকৃতিক ধর্ম্মের যে সকল মূল উদ্দেশ্য ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল উদ্দেশ্য যাবতীয় বৈশেষিকধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সম্পাদন করে; তজ্জন্য নানাবিষয়ে মতামত লইয়া উহাদের ভিতর এখন এত পার্থক্য দেখা যায়।

ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস প্রায় সকল ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; তথাচ এতৎসম্বন্ধেও প্রত্যেক ধর্ম্মে কিছু না কিছু ইতরবিশেষ দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম গুণাতীতঃ মায়াতীত পরব্রহ্ম বুঝে না; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইহারা মানবমনের প্রকৃত্যনুযায়ী সগুণ নিরাকার লৌকিক ঈশ্বর মানে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম গুণাতীত পরব্রহ্ম সম্যক বুঝে এবং এই মায়াময় জগতে তাঁহার মায়ারূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে এক ধর্ম্ম মানে এবং অপর ধর্ম্ম বুদ্ধদেবকে মানে। আবার ভূমণ্ডলে এমন অসভ্য মানবসমাজ আছে, যাহাদের ভাষায় ঈশ্বরের নাম আদৌ নাই এবং যাহারা একেশ্বর বুঝিতে পারে না।

প্রত্যেক ধর্ম্মে ঈশ্বরের এক এক লৌকিক প্রতিনিধি দেখা যায়; এতৎসম্বন্ধেও বিস্তর পার্থক্য বর্ত্তমান। খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈষাকে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র ও পতিত মানবজাতির একমাত্র পরিত্রাতা জ্ঞান করে। মুসলমানধর্ম্ম স্বপ্রবর্ত্তক মহম্মদকে ঈশ্বরের প্রিয় পয়গম্বর জ্ঞান করে। বৌদ্ধধর্ম্ম স্বপ্রবর্ত্তক বুদ্ধদেবকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া মান্য করে এবং তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে। হিন্দুধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণাদি অলৌকিকগুণসম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান করিয়া তাঁহাদেরই প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে।

উপাসনাপদ্ধতি বা পূজাপদ্ধতি লইয়াও সকল ধর্ম্মের ভিতর বিস্তর মতভেদ উপস্থিত। এমন কি, প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরও এতৎসম্বন্ধে কিছু কিছু ইতরবিশেষ দেখা যায়। নিরাকারবাদিগণ নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশে কতকগুলি বাক্যসমন্বয় উচ্চারণ করিয়া মনের ভক্তি প্রকাশ করেন। সাকারবাদিগণ তাঁহার সাকার প্রতিমূর্ত্তিকে পাদ্য ও অর্ঘ্যের সহিত পূজা করিয়া মনের অপার ভক্তি প্রকাশ করেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বসেবকদিগকে সপ্তম দিবসে গির্জ্জায় গিয়া ঈশ্বর ডাকিতে বলে। মুসলমানধর্ম্ম স্বসেবকদিগকে প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পাঠ করিতে বলে এবং সপ্তম দিবসে তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের জন্য মসজিদে একত্রিত করে। হিন্দুধর্ম্ম স্বসেবকদিগকে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে বলে এবং বৎসরের মধ্যে মধ্যে দেবোৎসব করাইয়া তাহাদিগকে আনন্দে উৎফুল্ল করায়। এইরূপ নানা ধর্ম্মাবলম্বিদিগের নানা উপাসনাপদ্ধতি জগতে প্রচলিত দেখা যায়।

পরলোক সম্বন্ধে ও প্রেতাত্মার মঙ্গলসাধনের জন্য প্রত্যেক ধর্ম্ম ভিন্ন

ভিন্ন মতামত ও ক্রিয়াকলাপ উপদেশ দেয়। নিরাকারবাদী খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম মৃত ব্যক্তিকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে উপদেশ দেয় এবং সমাধি নির্ম্মাণপূর্ব্বক পুত্রের পিতৃমাতৃঋণ পরিশোধ করায়। সাকারবাদী হিন্দুধর্ম্ম মৃতব্যক্তির অগ্নিতে সংকার করায় এবং প্রেতাত্মার মঙ্গলের জন্য পিণ্ডদান ও তর্পণ করায়। প্রায় সকল ধর্ম্মই স্বর্গকে সুখের আলয় ও নরককে দুঃখের ভীষণ আগার স্বরূপ দেখায় এবং সকলেই সমস্বরে উপদেশ দেয় যে, পুণ্যাত্মাগণ স্বর্গে বাস করেন এবং পাপাত্মাগণ নরকে বাস করে।

আবার প্রত্যেক ধর্ম্মের সামাজিক রূপটী ততোধিক বিভিন্ন। একদেশে এক ধর্ম্ম বিবাহাদি বিষয়ে এক প্রকার আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করে, অন্য দেশে অন্য ধর্ম্ম অন্য প্রকার আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করে। এমন কি, প্রত্যেকে ধর্ম্মের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা প্রদেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরও এ সকল বিষয় লইয়া ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়।

প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্গত সম্প্রদায়গুলির নানা বিষয়ে যে কত মতভেদ, তাহা এস্থলে বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং খ্রীষ্টজগতে প্রটেষ্টাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীকচার্চ্চদিগের ভিতর, মুসলমানজগতে সীয়া ও সুন্নীদিগের ভিতর, বৌদ্ধজগতে মহায়ন ও হীনায়নদিগের ভিতর এবং হিন্দু-জগতে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্তদিগের ভিতর যে কত মতভেদ, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। যেমন জীবজগতে শারীরিক গঠন সম্বন্ধে যৎসামান্য পার্থক্য লইয়া নানা জাতীয় জীব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ধর্ম্মজগতেও যৎসামান্য মতভেদ লইয়া নানা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। জগতে সকল বিষয়ে অনন্ত বৈচিত্র্য স্থাপন করাই প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য।

সকল দেশের জনসাধারণ বৈশেষিক ধর্ম্মের উপর অতীব শ্রদ্ধাবান; তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলি অতি যত্নের সহিত পালন করতঃ স্বধর্ম্মের বৈশেষিকত্ব বা স্বজাতির জাতীয়তা রক্ষণে একান্ত তৎপর। এমন কি, তাহারা সম্প্রদায় বিশেষের বৈশেষিক মতানুসারে চালিত হইয়া স্বসম্প্রদায়কে জগতে বিশিষ্ট রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায়।

মানবের ইহা স্বভাবসিদ্ধ, বাল্যকাল হইতে যেরূপ সংস্কার মনে বদ্ধমূল

হয়, তাহাই আজীবন বদ্ধবৎ থাকিয়া যায়; এজন্য সকলেই বাল্যকাল হইতে স্বধর্ম্মের প্রতি এত পক্ষপাতী হয়; এমন কি, উহার অনুশাসন কস্মিন্‌কালে পরিহার করিতে তাহারা সমর্থ হয় না। কিন্তু উত্তরকালে বিভিন্নরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কারও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং স্থলবিশেষে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় লোকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে।

ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি।

বিজ্ঞানের মতে জগতের যাবতীয় বস্তু, কি কৃত্রিম, কি অকৃত্রিম, কি প্রাকৃতিক, কি অপ্রাকৃতিক, সকলই ক্রমবিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত ও ক্রমবিকশনে বিকশিত হয়। সেইরূপ ইহার মতে মানবধর্ম্মও সকল দেশে মানবজাতির বুদ্ধিশক্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে ক্রমবিকশিত হয়; যুগ যুগান্তরে ইহা কতকগুলি স্তরের পর স্তর অতিক্রম করতঃ আধুনিক আকার ধারণ করে।

পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতি, কি বর্ব্বর, কি অসভ্য, কি অর্দ্ধসভ্য কি সভ্য, কি সুসভ্য, সকল জাতির ধর্ম্ম সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, ভালরূপ বুঝিতে পারা যায়, মানবধর্ম্ম কালসহকারে কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করতঃ ক্রমোন্নত হয়। বিজ্ঞানের মতে ইহাতে তিনটী প্রধান স্তর বর্ত্তমান; যথা, (১) জড়োপাসনা (২) পৌত্তলিকতা (৩) একেশ্বরবাদ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, অতি প্রাচীনকালে বা আদিম অবস্থায় সমগ্র মানবজাতি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ও অতি বর্ব্বর অবস্থায় অবস্থিত ছিল; পরে সমাজে জ্ঞানানুশীলনের আরম্ভ হওয়ায়, সভ্যতার সূত্রপাত হয় এবং জ্ঞানোন্নতির সহিত সভ্যতারও ক্রমোন্নতি হয়। এখন আদিম বর্ব্বর মানবের ধর্ম্ম কিরূপ, অথবা তাহার মনে ধর্ম্মভাব উদিত কি না, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ভীতি ও বিস্ময় হইতে মানবমনে ধর্ম্মভাব প্রথম উদ্ভূত বা প্রকটিত হয়। যেমন একটী দুগ্ধপোষ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু সামান্য কারণে ভীত হইয়া মাতৃক্রোড় আশ্রয় করে; সেইরূপ জাতীয় জীবনের অতি শৈশবাবস্থায় মানবও জগতের ভয়াবহ ঘটনাবলি সন্দর্শনে ভীত ও চমকিত

হইয়া ধর্ম্মরূপ মাতৃক্রোড় আশ্রয় করেন। সে সময়ে বুদ্ধিশক্তি তাদৃশ স্ফুরিত ও পরিমার্জ্জিত না হওয়ায়, তিনি কল্পনাবলে সকল বিষয়ের কাল্পনিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করতঃ নিজ দুর্ব্বল মনের প্রবোধ দেন। প্রকৃতিজগতে যে স্থলে তিনি কিছু অসাধারণত্ব দেখেন, সেই স্থলেই তিনি প্রথমে প্রাণিত্ব, পরে দানবত্ব, তৎপরে দেবত্ব কল্পনা করেন। বায়ু, মেঘ, আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, সর্প, বৃক্ষ, মহানদী প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার দুর্ব্বল অশিক্ষিত মনে ভীতি ও বিস্ময় উৎপাদন করে, উহাদের প্রকৃত কারণ-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুসারে তিনি উহাদিগকে দানব বা দেবতা জ্ঞান করেন এবং নিজ জীবনের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা জ্ঞানে উহাদের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ তিনি কতকগুলি মন্ত্রোচ্চারণ বা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন। এই প্রকারে জড়োপাসনা বা জড় পদার্থের পূজা জগতে প্রবর্ত্তিত হয়।

পরে জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে মানবমন উন্নতির পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, তিনি অসম্ভোচিত জড়োপাসনায় তৃপ্তিবোধ না করিয়া ধর্ম্মপথে আরও এক পদ অগ্রসর হন। পূর্ব্বে তিনি যে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটলে কল্পনাবলে দৈব-শক্তির বিকাশ উপলব্ধি করেন, এখন সেই বিশ্বাসে আরও বদ্ধমূল হইয়া শক্তির উগ্র ও সৌম্য ভাব দর্শনে দেবতারও উগ্র ও সৌম্য মূর্ত্তি কল্পনা করেন এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যদানে তাঁহার পূজা করিতে শিক্ষা করেন। এ অবস্থায় হৃদয়ের উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট মনোবৃত্তিগুলি দেববর্গে আরোপিত করিয়া তিনি উহাদের আলোকসামান্য সাংসারিক লীলা পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণন করেন এবং নিজ মনের উন্নতি সাধনের প্রার্থী হন। এ অবস্থায় তিনি লোকবিশেষের লোকাতিগগুণ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন এবং নিজ জীবনের আদর্শপুরুষ জ্ঞান করেন। এই প্রকারে জগতে পৌত্তলিকতা প্রবর্ত্তিত হয়।

তৎপরে কালসহকারে জ্ঞানের অশেষ উন্নতিসাধন হইলে, তাঁহার বুদ্ধি-শক্তি পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। তখন তিনি আরাধ্য দেবতাদিগের সদসৎ-গুণ দর্শনে পৌত্তলিকতায় বীতশ্রদ্ধ হন। তখন তিনি প্রকৃতি-জগতের ঘটনা-বলি সন্দর্শনে ভীত ও চমকিত না হইয়া সোৎসাহে উহাদের কারণপরম্পরার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং মনোবিজ্ঞান অনুশীলন করিতে করিতে যখন

তিনি বুঝিতে পারেন যে, জীবাত্মা বা মন তাঁহার যাবতীয় কর্ম্মের মূলীভূত কারণ, তখন তিনি নিজ মনের আদর্শে বহুসংখ্যক দেবতার পরিবর্ত্তে অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে চরাচর বিশ্বের এক মাত্র আদিকারণ জ্ঞান করেন। তখনই তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, একেশ্বরই জগতের প্রাণস্বরূপ, মনঃস্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা এবং তিনিই জগৎপাতা ও জগৎপিতা। তখনই তিনি তাঁহাকে জীবনের যাবতীয় সুখদুঃখের একমাত্র নিয়ন্তাজ্ঞানে ভক্তি ও প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া তাঁহাকেই নিরাকাররূপে উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই সঙ্গে পৌত্তলিকতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। যে সকল ধর্ম্মজীবন আত্মোৎসর্গী অশেষগুণশালী মহাত্মাগণ তাঁহাকে উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত উপদেশ দেন, তাঁহাদেরই বিরচিত শাস্ত্রানুসারে চালিত হইয়া তিনি নিজ জীবন গঠিত করেন এবং তাঁহাদিগকে মধ্যস্থ করিয়া ঈশ্বরের নিকট নিজ মুক্তি প্রার্থনা করেন। এই প্রকারে শ্রেষ্ঠ একেশ্বরবাদ ধর্ম্মজগতে প্রবর্ত্তিত হয়।

আধুনিক ধর্ম্মবিজ্ঞানের মতে মানবধর্ম্ম কালসহকারে জ্ঞানোন্নতির সহিত এই প্রকারে ক্রমোন্নতভাব ধারণ করে। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্ম স্পষ্ট উপদেশ দেয়, জগতে ধর্ম্মের ক্রমাবনতি দেখা যায় এবং কালভেদে ও যুগভেদে ধর্ম্মের ক্রমশঃ অধঃপতনই হয়। সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদবিশিষ্ট, সংসারে পাপের লেশমাত্র ছিল না এবং জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতা পূর্ণভাবে বিকশিত ছিল। এক এক যুগে ধর্ম্মের এক একটী পাদ নষ্ট হয়, জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় এবং সেই সঙ্গে সংসারে পাপরাশি প্রবেশ করে। পরিশেষে এই কলিযুগে ধর্ম্মের একটী মাত্র পাদ অবশিষ্ট, তাহাও আবার ভগ্নাবস্থায়; এখন সংসারে আধিভৌতিকত্বের পূর্ণবিকাশ এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্মের পরাজয় ও পাপের জয়। কেন এ কলিযুগে ধর্ম্মাত্মাদিগের এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা ও এত লাঞ্ছনা এবং পাপাত্মাদিগের এত সমৃদ্ধি, এত সম্মান ও এত ঐশ্বর্য্য ? শ্রীরাম, বুদ্ধদেব, ঈশা, শঙ্করাচার্য্য, মহম্মদ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাত্মাই এ সংসারে কষ্টরাশি বহন করেন। সংসারে পাপের স্রোত খরবেগে বহমান বলিয়া ধর্ম্মাত্মাদিগকে সময়ে সময়ে এত কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

এখন হিন্দুধর্ম্মের মত কতদূর সত্য, বা ধর্ম্মবিজ্ঞানের মত কত দূর সত্য, তদ্বিষয়ে বিচার করা আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয় মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে

আর একটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা উচিত। প্রাচীন কালে সমগ্র মানবজাতি অসভ্যাবস্থায় পতিত ছিল কি না? পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, পুরাকালে চীন, ভারতবর্ষ, মিসর, ক্যাণ্ডিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, পারস্ত, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি জনপদবর্গ সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হয় এবং উহাদের পূর্ব্বে মানবজাতি অসভ্যাবস্থায় অবস্থিত ছিল। ঋক্‌বেদাদি জগতের প্রাচীন গ্রন্থপাঠ করিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, আর্য্যজাতি যখন তাঁহাদের আদিম নিবাসস্থল হইতে বহির্গত হন, তখন তাঁহারা তৎকালোচিত সভ্যতাসোপানে আরূঢ় থাকেন। এই আর্য্যজাতির পূর্ব্বে কোন্ জাতি জগতে সভ্যতা লাভ করে, তাহার কোন নিদর্শন এখনও ইতিহাস প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্নতত্ত্ব এখনও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। অতএব পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত যে অখণ্ডনীয়, তাহাই বা আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? বিজ্ঞানজগতে আজ যে মত প্রবল হয়, অর্দ্ধশতাব্দী বাদ আবার সেই মতের বিস্তর খণ্ডন হইয়া যায়; সে স্থলে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যে একেবারে অভ্রান্ত, তাহা মনে করা আমাদের উচিত নয়।

লক্ষ লক্ষ বৎসর হইতে চলিল, মানবজাতি জগতে আবির্ভূত হইয়াছে; তন্মধ্যে বিগত তিন সহস্র বৎসর কেবল জাতিবিশেষ দেশবিশেষে সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হয়, আর এতকাল সমগ্র মানবজাতি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, এ কথাই বা আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ কেবল পঞ্চ সহস্র বৎসরের ঐতিহাসিক প্রমাণাদি সংগ্রহ করেন; তৎপূর্ব্বে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহারা আদৌ অবগত নন। সে স্থলে তাঁহাদেরই কথা গ্রাহ্য, আর ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা অগ্রাহ্য, তাহাই বা আমরা কি প্রকারে বলিতে পারি? ধর্ম্মশাস্ত্র স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, যুগভেদে মানবের শারীরিক ও মানসিক অবনতির সহিত তাঁহার সভ্যতারও অবনতি ঘটিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দীর্ঘকায় মনুপুত্রগণ বা দানব ও দৈত্যগণ তদানীন্তন পৃথিবীতে যে কিরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হন, তাহার কোন স্থায়ী চিহ্ন এখন নাই; তাঁহারা যে মহাদেশে আবির্ভূত হন, তাহা এখন জলধিগর্ভে। মহাভারতে লিখিত আছে, ময়দানব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ত রাজসূয় যজ্ঞের অত্যদ্ভুত সভাগৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং রামায়ণে লিখিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র বানরদ্বারা সাগর বন্ধন করান।

এ সকল কি শাস্ত্রের অলীক উপকথা, না ইহাদের ভিতর কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে? ইহাতে কি বুঝা যায় না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের দীর্ঘকায় মনুপুত্রগণ স্থপতিবিদ্যায় অসাধারণ নিপুণ ছিলেন? মিসরদেশের অত্যদ্ভুত পিরামিডগুলি যে সকল বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরে নিৰ্ম্মিত, তাহা মিসরদেশে পাওয়া যায় না, তাহা দূরদেশ হইতে আনীত হয়; অনেকের বিশ্বাস, ইহারাও আধুনিক খর্ব্বকায় মানব কর্তৃক রচিত নয়। যাহা হউক, কলিযুগে বিগত পঞ্চসহস্র বৎসর মানবসমাজের কৃত্রিম সভ্যতা যে বর্দ্ধনশীল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইতিহাস পাঠে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের সভ্যতার বিষয় আমরা কিছুই অবগত হই না। মানবের জাতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব এ বিষয়ে এখন সম্পূর্ণ নীরব।

কেহ কেহ বলেন, যে পাশ্চাত্য জগৎ এতকাল ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল ও অল্পদিন মাত্র জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তত্রত্য পণ্ডিতগণ স্বতঃ সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরাকালে সমগ্র জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এবং জগতে সভ্যতার ক্রমোন্নতি সংঘটিত হইতেছে; আর যে প্রাচ্যজগৎ পুরাকালে অত্যুন্নত ছিল ও এখন অবনত হইয়াছে, তত্রত্য পণ্ডিতগণ স্বতঃসিদ্ধান্ত করেন, জগতে সভ্যতার ক্রমাবনতি দেখা যায়। যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সত্য, না প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মত সত্য, তাহা কালে মীমাংসিত হইবে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যুগভেদে মানবের আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পাওয়াতে তাঁহার আধিভৌতিকত্ব ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল হয় এবং সেই সঙ্গে অশেষ পাপতাপ সংসারে প্রবিষ্ট হয়। এই প্রকারে তাঁহার ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ অপগত হইয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে এখন পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শাস্ত্রোক্ত কলিযুগ বর্ণনের সহিত ইহার অক্ষরে অক্ষরে মিলন দেখা যায়। এখন জনসাধারণ যেরূপ অধর্ম্মপরায়ণ, ধূর্ত্ত, শঠ ও মিথ্যাবাদী, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, কলিযুগ বর্দ্ধনের সঙ্গে অধর্ম্ম সংসারে এইরূপ বর্দ্ধনশীল। অতএব হিন্দুধর্ম্মের কথা যে আদৌ অমূলক নয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে বিজ্ঞানোক্ত ধর্ম্মের উন্নতি কোথায়? মানবের জাতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, বুঝিতে পারা যায়, এই কলিযুগে তাঁহার জ্ঞানশক্তি যেরূপ ক্রমবিকশিত হয়, ধর্ম্মবিষয়ক মতামতও সেইরূপ কালসহকারে পরিবর্ত্তিত ও ক্রমোন্নত হয়। কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মভাব উন্নত হয় নাই বরং ইহা আরও অবনত হইয়াছে।

অসভ্যাবস্থায় লোকে লৌকিক ঈশ্বর বুঝুক বা না বুঝুক, উহাদের প্রকৃতি সকলদিকে সরল ও বাৎসল্যরচিত থাকে; আবার সভ্যাবস্থায় লোকে ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণে মান্য করে ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতে চেষ্টা পায়, অথচ তাহারা অন্যজাতির বক্ষঃস্থলে পদার্পণ পূর্ব্বক শ্মশ্রুদেশোৎপাটনে সদা তৎপর হয় এবং প্রবঞ্চনায় ও শঠতায় সবিশেষ নিপুণ হয়। যাঁহারা মনে করেন, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে জগতে ধর্ম্ম উন্নতিশীল, তাঁহারা নেত্রোন্মীলন পূর্ব্বক সভ্যতম ইউরোপ সমাজ ভালরূপ নিরীক্ষণ করুন, বুঝিতে পারিবেন, সংসারে ধর্ম্ম ক্রমোন্নত, না ধর্ম্ম ক্রমশঃ জাহান্নমে পতিত হইতেছে? তবে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

কৃত্রিম সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে মানবসমাজের অবস্থা এখন যেরূপ, তাহাতে যে বেচারী ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি হন পদে পদে প্রতারিত; এখন যিনি সরল, তিনি হন মহানির্ব্বোধ; এখন যিনি মনের কথা খুলিয়া বলেন, তিনি হন পাগল; এখন যিনি লোকের চক্ষে ধূলি প্রদানে সমর্থ, তাঁহারই সর্ব্বত্র জয় জয়কার; এখন যে সমাজে অধর্ম্মরূপিণী নারীজাতির যতোধিক সম্মান, সে সমাজ তত সভ্যতাপথে অগ্রসর; এখন যে দেশে পার্থিব বিস্তার যত গৌরব ও উন্নতি, সে দেশ তত সভ্যতাসোপানে আরূঢ়। তবে হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ জড়োপাসনা হইতে একেশ্বরবাদ রূপ ধর্ম্মের যে ক্রমোন্নত অবস্থা নির্দ্দেশ করেন, তাহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুমোদিত নয়। ইহার মতে যে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা ও যোগাভ্যাস সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; তদ্ভিন্ন জড়োপাসনা, পৌত্তলিকতা ও আধুনিক একেশ্বরবাদ এ তিনই কলিযুগের অপকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং ইহারা ধর্ম্মের অবনত ভাব। কাল-ক্রমে মানব প্রকৃতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, ঐ সকল উপাসনাপদ্ধতি কলিযুগে প্রচলিত হইয়াছে। আধিভৌতিক উন্নতিসাধিকা জ্ঞানশক্তি যখন মানবমনে ঈষৎ স্ফুরিত, তখন তিনি জড়োপাসক; যখন সেই জ্ঞানশক্তি অর্দ্ধস্ফুরিত, তখন তিনি পৌত্তলিক; যখন ইহা সম্যক স্ফুরিত, তখন তিনি একেশ্বরবাদী। কিন্তু এই তিন অবস্থায় যুগধর্ম্মানুসারে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা বা প্রকৃত ধর্ম্মভাব বিশেষরূপে অপগত।

পণ্ডিতবর মোক্ষমুলার সাহেবও বেদের তথা-কথিত জড়োপাসনার মধ্যে অত্যুন্নত একেশ্বরবাদের পূর্ণ নিদর্শন পান; সে জন্য তিনিও বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি মতটী খণ্ডন করেন।

পাশ্চাত্য ধর্ম্মবিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের ক্রমোন্নতিতে আমাদের বুঝা উচিত যে, এই কলিযুগে জগতে মানবের বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে কি প্রকারে ধর্ম্মবিষয়ক মতামতের ক্রমোন্নতি সাধন হয়; আর হিন্দুশাস্ত্রের কথাপ্রমাণ সংসারে প্রকৃত ধর্ম্মভাব যে ক্রমশঃ হীন ও অবনত, তদ্বিষয়েও আমাদের কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত নয়। ইহা শাস্ত্রের অমোঘ সত্য যে, কলিযুগ বর্দ্ধনের সঙ্গে প্রকৃত ধর্ম্মভাব সংসারে ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ।

এই অখিল বিশ্বসংসার যাহার অত্যদ্ভুত রমণীয়তা ও কৌশল দর্শনে আমরা অনুক্ষণ চমৎকৃত হই, যাহা আমাদের অনন্তসুখের আগার, ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে, কে ইহার রচয়িতা, তাহা জানিবার জন্য আমরা চিরদিন কৌতূহলাক্রান্ত। যৎসামান্য বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে আমাদের মনে ঐ প্রশ্ন স্বতঃ উত্থিত হয়। কিন্তু ধর্ম্ম সকল দেশে ঐ প্রশ্ন মীমাংসার জন্য জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাইয়া আমাদের চিরপ্রদীপ্ত কৌতূহলশিখা নির্ব্বাপিত করে। এখন আমরা বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বর মানিয়া চলি এবং তাঁহারই নাম লইয়া ভবসংসারের নানা ঝঞ্ঝাবাতে উত্তীর্ণ হই। প্রায় সকল দেশের জনসাধারণ এখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহারই উপাসনা বা আরাধনা করে। আজ মানবধর্ম্মের কল্যাণে ঈশ্বরজ্ঞান আমাদের একরূপ প্রকৃতি-সিদ্ধ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এখন প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। ধর্ম্মের এই উৎকৃষ্ট মতটী এখন মানবসমাজ মাত্রেই প্রচলিত দেখা যায়। কেবলমাত্র নাস্তিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না এবং আজকাল জড়বাদী বিজ্ঞানের কল্যাণে সমাজে নাস্তিকমত ক্রমশঃ প্রবল। এস্থলে বক্তব্য, ধর্ম্ম সরল বিশ্বাসে ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা সর্ব্বত্র প্রচার করে, তাহাই নাস্তিকগণ মানেন না; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা অন্ধ প্রকৃতির শরণ লন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে এখন যেরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল, তাহা অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের সম্মত নয়। তাহাদের বিশ্বাস, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর জগতের অন্তরালে অবস্থিত হইয়া বা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া এ জগৎ সৃষ্টি করেন এবং কতকগুলি অখণ্ডনীয় ভৌতিক নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক ইহাকে পালন করেন; তিনিই আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখের একমাত্র নিয়ন্তা।

তাহাদের বিশ্বাসে তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বদয়াময়, সর্ব্বমঙ্গলময় ও সর্ব্বন্যায়পর। মানবমনে যে সকল উৎকৃষ্ট গুণ বর্ত্তমান, সে গুলি অনন্ত গুণিত হইয়া এখন তাঁহাতে আরোপিত। এইরূপে যে ঈশ্বরের উপর লোকের বিশ্বাস বহুকাল হইতে মানবসমাজে বদ্ধমূল, তিনি লৌকিক বা লোকপ্রখ্যাত ঈশ্বর।

এখন যে স্থলে জনসাধারণ লৌকিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে স্থলে অধ্যাত্মবিজ্ঞান পরব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে। পরব্রহ্ম ও লৌকিক ঈশ্বরের ভিতর প্রভেদ বিস্তর। যিনি পরব্রহ্ম, তিনি মায়াতীত ও গুণাতীত, তিনি অবিতর্ক্য, অপ্রজ্ঞাত ও অপরিমেয়; তিনি নিরাকারও নন, সাকারও নন; তিনি মানবমনের কদাচ ভাব্য হইতে পারেন না।

যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদ সঃ
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্

(উপনিষদ)

"যিনি নিশ্চয় মনে করেন, ব্রহ্মকে জানা যায় না, তিনিই তাঁহাকে জানেন। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে ব্রহ্মকে আমি জানি, তিনি বস্তুতঃ তাঁহাকে জানেন না। জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের বিশ্বাস, ব্রহ্মকে জানা যায় না। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই মনে করেন, তাঁহাকে জানিতে পারা যায়।"

আমরা এ মায়াজগতে মায়াজন্য মিথ্যাজ্ঞানে অভিভূত ও জড়িত; এজন্য আমরা সেই মায়াতীত পরব্রহ্ম আদৌ বুঝিতে পারি না। যুগধর্ম্মে আমাদের জীবাত্মা অধঃপতিত হওয়ায়, এখন ইহা পরব্রহ্ম বুঝিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। সত্যত্রেতাদ্বাপরযুগে দেবরূপী ও মানবরূপী মনুপুত্রগণ নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া যান। এখন এই অধঃপতিত কলিযুগে যুগধর্ম্মে বাধ্য হইয়া আমরা নির্গুণ পরব্রহ্মের স্থলে নিরাকার অথচ সগুণ লৌকিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। অতএব বলা উচিত, মায়াতীত গুণাতীত পরব্রহ্মকে সগুণ ঈশ্বররূপে ভাবিয়া আমরা তাঁহাকে আমাদের মায়াময় মনের ভাব্য করি এবং মনের উৎকৃষ্ট গুণাবলি তাঁহাতেই আরোপ করিয়া থাকি। ইহা ব্যতীত আমাদের পরব্রহ্ম ভাবিবার বা বুঝিবার উপায়ান্তর নাই।

খ্রীষ্ট ও মুসলমান জগতে যে লৌকিক ঈশ্বরে বিশ্বাস সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা যায়, তিনি মায়াতীত পরব্রহ্মের মায়ারূপ; হিন্দুজগতে যে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের

উপর লোকের বিশ্বাস বদ্ধমূল, তাঁহারাও মায়াতীত পরব্রহ্মের মায়ারূপ; বৌদ্ধজগতে যে বুদ্ধদেবকে জনসাধারণ ঈশ্বররূপে ভাবে, তিনিও পরব্রহ্মের মায়ারূপ। নিজ মনের প্রকৃত্যনুযায়ী ঈশ্বরকে ভাবিতে মানব সর্ব্বত্র সাধারণতঃ বাধ্য হন।

এখন ঈশ্বর মান বা পরব্রহ্ম মান, এ জগতের যে এক আদিকারণ বিদ্যমান, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত নয়। সেই আদিকারণ আমাদের নিকট যতই কেন অজ্ঞেয় হউক না, ইহা যে বর্ত্তমান, এমন কি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? ওহে নাস্তিকবাদি পণ্ডিতগণ! তোমরা যে একটা কেবল কথার কথা, তথা-কথিত প্রকৃতির দোহাই দিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার কর, বল দেখি, তোমাদের পূজ্যতম সেই প্রকৃতি কিরূপ শক্তি-শালিনী? চিৎশক্তি ব্যতীত অন্ধ জড়শক্তি দ্বারা কি এমন চৈতন্যময় জগৎ সৃষ্ট বা চালিত হইতে পারে? জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি বানর কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও অঙ্কিত বলা যেরূপ অসঙ্গত, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অনন্ত-কৌশলবিশিষ্ট, অনন্ত-বৈচিত্র্যবিশিষ্ট জগৎ জড়প্রকৃতির অন্ধশক্তি দ্বারা সৃষ্ট ও চালিত বলাও সেইরূপ অসঙ্গত। আমরা জগতের যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই ইহার অনন্ত কৌশল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সামঞ্জস্য, অনন্ত শৃঙ্খলা দেখিয়া আমরা অনুক্ষণ বিমুগ্ধ হই; এ সকল কি একটা অন্ধ জড়শক্তির ক্রিয়া হইতে পারে? যে চিৎশক্তির কণামাত্র পাইয়া আজ আমরা জগতের অধীশ্বর, সেই অনন্ত চিৎশক্তিই অনন্ত জগৎ ব্যাপ্ত।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ। (গীতা)

"আমিই অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমস্ত জগত অভিব্যাপ্ত; যাবতীয় পদার্থ ও জীব আমাতেই বর্ত্তমান; কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি।"

ঈশ্বর বা পরব্রহ্মের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য আমাদিগকে দূরদেশে যাইতে হয় না। মানবমনের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলেই, আমরা তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। যে জীবাত্মা দেহপিঞ্জরে নিবদ্ধ থাকিয়া আমা দিগকে আমিত্ব জ্ঞান প্রদান করে এবং দেহকে চৈতন্যময় করে, সেই জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি। (গীতা)

"যে সনাতন জীবাত্মা আজ জীবলোকে জীবনামে ব্যক্ত, ইহা আমারই অংশ এবং শরীরস্থ হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া ইহ সংসারে বিচরণ করে।"

এস্থলে কেহ কেহ বলেন, মন ও দেহ লইয়াই মানব; আবার জীবাত্মা কোথা হইতে আইসে? তবে জীবাত্মার প্রমাণ লইয়া কি প্রকারে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায়? এখন দেখা যাউক,জীবাত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে আমরা কিরূপ প্রমাণ পাই। সাধারণতঃ আমরা মন ও দেহের পৃথক অস্তিত্ব যেরূপ উপলব্ধি করি, মন ও আত্মার পৃথক অস্তিত্ব সেরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু সময়ে সময়ে আমরা উহাদের পৃথক অস্তিত্ব ভাল রূপ বুঝিতে পারি। যোগিগণ যোগবলে আত্মা ও মনের পৃথক সত্বা বুঝিতে পারেন। সমাধির অবস্থায় যখন তাঁহারা চব্বিশ তত্ত্বের সহিত মনের লয় সাধন করেন, তখন আত্মার ক্ষমতা স্ফুরিত হয়। এই প্রকারে তাঁহারা ভাল-রূপ বুঝিতে পারেন, আত্মা ও মন পৃথক বস্তু। যদি, ভণ্ড যোগীর কথায় বিশ্বাস না কর, সুষুপ্তির অবস্থায় মধ্যে মধ্যে এমন স্বপ্ন দেখা যায়, যাহা হুবহু সত্য ঘটনায় পরিণত হয়। এস্থলে সর্ব্বজ্ঞ আত্মা ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস প্রাপ্ত হয়। অতএব মানবমনের গভীরতম প্রদেশে আত্মা বর্ত্তমান এবং ইহার আকর স্বরূপ পরমাত্মাও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

যেমন একমাত্র গগনবিহারী সূর্য্য সকল জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত, সেইরূপ সেই পরমাত্মার চিৎশক্তি অখিলসংসারে প্রতিভাত ও প্রতিফলিত। যেমন একমাত্র আকাশ সমস্ত জগৎ অভিব্যাপ্ত, পরব্রহ্মও সেইরূপ অখিল জগৎ অভিব্যাপ্ত। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ," ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের একটী জলন্ত সত্য। বেদান্তদর্শনই এই মহাসত্য হিন্দুজগতে এতকাল প্রচার করে। জগতে এক হিন্দু ব্যতীত অপর কেহ এ কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় নাই। খৃষ্টাদি কৃত্রিম একদেশদর্শী ধর্ম্মগুলি ঈশ্বর সম্বন্ধে মহৎভ্রমে পতিত; তাহাদের মতে ঈশ্বর জগৎ হইতে ভিন্ন; তিনি অন্তরালে বসিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন ও পালন করেন।

বেদান্ত মতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বই পরব্রহ্মের রূপ। তিনি যে কেবল আকাশরূপে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান, তাহা নহে; তিনিই মায়াযোগে বর্দ্ধিত হইয়া এই মায়াময় স্থূল বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হইয়াছেন।

ঈশ্বরসম্বন্ধে জগতে দুইপ্রকার মত প্রচলিত দেখা যায়, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্ম ও বিশ্বকে পৃথক জ্ঞান করেন না; কিন্তু দ্বৈতবাদিগণ ঈশ্বর ও জগৎকে সম্পূর্ণ পৃথক জ্ঞান করেন। যেমন মানবমন ও মানবদেহ অবিভাজ্যরূপে সম্বদ্ধ, সংলগ্ন ও একত্রীকৃত, একের অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্ব ব্যতীত থাকিতে পারে না; সেইরূপ বিশ্ব ও ব্রহ্ম পরস্পর সম্বদ্ধ, সংলগ্ন ও একত্রীকৃত এবং উভয়েই এক পদার্থ। যেমন প্রলয়কালে স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্ব অব্যক্ত মূলপ্রকৃতিতে পরিণত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হয়, সেইরূপ সৃষ্টির পর চিৎশক্তিসম্পন্ন পরব্রহ্মও উহার যে অংশটুকু মায়াযোগে বর্দ্ধিত হইয়া সূক্ষ্ম বা স্থূল বিশ্ব প্রপঞ্চে পরিণত হয়, উহাতেই অন্তর্লীন থাকে। কিন্তু যদি কেহ এমন ভাবেন যে, তিনি বিশ্বের অন্তরালে বর্ত্তমান বা বিশ্ব হইতে পৃথকভাবে বর্ত্তমান, তিনি ব্রহ্মসম্বন্ধে মহৎভ্রমে পতিত হন। স্বভাবতঃ আমরা মনের অস্তিত্ব দেহ হইতে পৃথকভাবে অনুভব করি; সেজন্য আমরা সচরাচর ঈশ্বরকে জগৎ হইতে পৃথক জ্ঞান করি। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই জনসধারণের ভ্রমের প্রধান কারণ।

এখন আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞান ঈশ্বরসম্বন্ধে কিরূপ নির্দ্দেশ করে, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এত মহৎ উন্নতি, এত গৌরবান্বিত আবিষ্কার, এত অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানালোকের মধ্যে বিজ্ঞান ক্ষীণস্বরে ও করুণস্বরে উপদেশ দেয়, বিশ্বের আদিকারণ মানববুদ্ধির অগম্য; মানব কস্মিন্‌কালে স্বীয় সসীম বুদ্ধি চালনা করিয়া এ রহস্য মীমাংসা করিতে পারেন না। বিজ্ঞান পাকেপ্রকারে বিশ্বের অজ্ঞেয় আদিকারণ স্বীকার করে বটে; কিন্তু ইহা লৌকিক ঈশ্বরের উপর খড়্গহস্ত এবং উহাকে একতুড়িতে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পায়। যাহা হউক, বিজ্ঞানপ্রতিপাদিত বিশ্বের অজ্ঞেয় আদিকারণই আমাদের বেদান্তের পরব্রহ্ম।

বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, যখন বিশ্বের আদিকারণ আমাদের নিকট সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞেয়, তখন সেই আদিকারণ অন্বেষণ করিবার কি প্রয়োজন?

কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যে সকল অপরিবর্ত্তনশীল ভৌতিক নিয়মাবলি দ্বারা জগৎ পরিচালিত, উহাদেরই সম্যক অনুশীলন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। বিজ্ঞানের মতে বিশ্বসংসার কতকগুলি অপরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা চালিত হয় এবং জড় ও শক্তির ভিন্ন ভিন্ন সমবায়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়। ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা ঐ সকল সংঘটিত বলা আজকাল প্রকৃত মূর্খতার কর্ম্ম। লোকে অজ্ঞানতাবশতই ঈশ্বরকে সর্ব্বনিয়ন্তা জ্ঞান করে। এজন্য যে ধর্ম্ম লোকদিগকে ঐ সকল অসত্য শিক্ষা দেয়, সেই ধর্ম্মের উপর ও তৎপ্রতিপাদিত লৌকিক ঈশ্বরের উপর বিজ্ঞান আজকাল এত নারাজ।

খৃষ্টধর্ম্ম উপদেশ দেয়, মানব ঈশ্বরের প্রতিকৃতি অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছেন। (Man was made according to the image of God)। বিজ্ঞান সেই মত খণ্ডন করতঃ স্পর্দ্ধার সহিত বলে, ঈশ্বর মানবজাতি সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু মানবই নিজ মনের আদর্শে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞানের মতে ঈশ্বরজ্ঞান আমাদের স্বভাবসিদ্ধ বা সহজ জ্ঞান নহে। বাল্যকালে অন্যান্য সংস্কারের সহিত আমরা ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হই। শরীর রক্ষার জন্য আহার একান্ত আবশ্যক এবং যাবতীয় জীবজন্তু ও মানব ক্ষুধা সমভাবে বোধ করে; অতএব ক্ষুধা একটী সহজ বা নৈসর্গিক জ্ঞান। সেইরূপ পুত্রস্নেহ প্রাণিজগতে একটী সহজ জ্ঞান। কিন্তু মানব ব্যতীত অন্য কোন জীবজন্তু ঈশ্বরজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারে না। ভূমণ্ডলে এমন অনেক অসভ্য মানবসমাজ বর্ত্তমান,যাহাদের ভাষায় ঈশ্বরবাচক শব্দ আদৌ নাই। এজন্য বিজ্ঞানের মতে ঈশ্বরজ্ঞান আমাদের নৈসর্গিক জ্ঞান নহে। নৈসর্গিক জ্ঞানের পর বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার আমাদের মন অধিক পরিমাণে অধিকার করে। বাল্যকালে আমরা মাতৃভাষা শিক্ষা করি; সেজন্য মাতৃভাষার অনুশাসন আমাদের মনে যাবজ্জীবন প্রবল থাকে। সেইরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস বাল্যকাল হইতে মনে বদ্ধমূল হইয়া আসায় মাতৃভাষার ন্যায় ইহা মস্তিষ্কের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এজন্য সাংসারিক বিপদ আপদে পতিত হইয়া আমরা স্বতঃ ঈশ্বরকে ডাকিয়া থাকি। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে মানবমস্তিষ্ক যেরূপ স্ফুরিত, তাঁহার বুদ্ধিশক্তিও তদনুরূপ বিকশিত। এই উন্নত বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে ও সংসারের বিবিধ তাড়নায় তাড়িত হইয়া তিনি নিজের সুবিধার জন্য নিজ মনে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান উদ্ভাবিত করেন।

একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে বিজ্ঞান আরও নির্দ্দেশ করে, মানবের ইহা স্বভাবসিদ্ধ যে, জগতের কারণপরম্পরার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি নিজ মনের আদর্শে সকল বিষয়ে একমাত্র আদিকারণে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। যেমন আমরা জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলি বিবিধকারণসমুদ্ভূত হইলেও উহাদিগকে এক অদৃষ্ট হইতে উৎপন্ন জ্ঞান করি, সেইরূপ প্রাকৃতিক ঘটনাবলি বিবিধশক্তিসমুদ্ভূত হইলেও আমরা সমস্তই একেশ্বরে আরোপ করিয়া থাকি। দেখ, তোমার মন এক, এক আমিত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ। যখন তুমি সেই মন দ্বারা বিশ্বের আদিকারণ স্থির করিতে যাও, নিজ মনের আদর্শে তুমি স্বতঃ ভাবিয়া থাক, এ জগতের একজন সৃষ্টিস্থিতিসংহার কর্ত্তা বিদ্যমান। তোমার মনের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করাই তোমার স্বভাবসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত তোমার গত্যন্তর নাই। এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বতন দার্শনিকগণ জগতে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। বিজ্ঞানের মতে এই প্রকারেই একেশ্বরবাদ জগতে সমুত্থিত।

এইরূপ নানাপ্রকার নাস্তিকমত প্রচার করিয়া জড়বাদী জড়বিজ্ঞান ঈশ্বরের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস মন্দীভূত করিতে চেষ্টা পায়। রে জড়বিজ্ঞান! তোমার এ কি আস্পর্দ্ধা, যে তুমি বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরকেও এক তুড়িতে উড়াইয়া দিতে চাহ? যে করুণাময় পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিয়া নিরুপায়, অসহায় মানব এই পাপতাপপূর্ণ সংসারে অশেষ শান্তি ও সন্তোষের সহিত জীবন অতিবাহিত করেন, যে দয়াময় ঈশ্বর ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর নাই এবং যে দয়াময় ঈশ্বরকে তিনি জীবনের আদর্শ করিয়া ধর্ম্মপথে ও উন্নতির পথে অগ্রসর হন, সেই পরমেশ্বর হইতে তুমি তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা পাও? হায়! তোমার কি দুর্বুদ্ধি! তুমি মূলে ভ্রান্ত; কেবলমাত্র জড়জগৎ অনুসন্ধান করিয়া তুমি যে সকল ঐকদেশিক সিদ্ধান্ত কর, তাহা দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায় না বলিয়া, তুমি ঈশ্বর মানিতে চাহ না। কিন্তু তুমি জগতের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত। তোমার নাস্তিকবাদ দ্বারা সমাজের যে কত অমঙ্গল ঘটিবে, তাহা বর্ণনাতীত।

সত্য বটে, আধুনিক জড়বিজ্ঞান গগনভেদিরবে চীৎকার করে যে, ঈশ্বরজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের নৈসর্গিক জ্ঞান নহে; কিন্তু অধ্যাত্ম-

বিজ্ঞান এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করে। ইহার মতে এ মায়াজগতে অবিনশ্বর জীবাত্মা মানবমনের সহিত যেরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহাতে ইহার জ্ঞানশক্তির স্ফূর্ত্তির সহিতই ইহা আজকাল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের নৈসর্গিক জ্ঞান বলিয়া প্রতীয়মান হয় না বটে; কিন্তু ইহা মানবমনের পাপপুণ্য-জ্ঞানের ন্যায় একরূপ প্রকৃতিদত্ত বা নৈসর্গিক। অতএব বলা উচিত, ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান আমাদের বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার হউক, লোকপরম্পরায় চালিত হউক, ইহা আমাদের একপ্রকার নৈসর্গিক জ্ঞান। যখন ঈশ্বরে বা পরব্রহ্মে বিশ্বাস ব্যতীত এ সংসারে পতিত মানবের গত্যন্তর নাই, তখন এ বিশ্বাস আমাদের একরূপ প্রকৃতিসিদ্ধ বলা উচিত। চিরকালই মানবধর্ম্ম সকল দেশে আমাদিগকে ঐরূপ শিক্ষা দেয় এবং ঈশ্বরের সুমধুর নাম লইয়া আমরা চিরদিনই এই ভবার্ণব সুখে পার হই। অতএব তাঁহাকে আল্লা, খোদা, গড্, ঈশ্বর, হরি বা বুদ্ধ যে নামে ডাক না কেন, সকল নামে বিশ্বের সেই অজ্ঞেয় আদি কারণ বা পরব্রহ্মকেই ডাকা হয় এবং যথার্থ বলিতে কি, সকল ধর্ম্মই এক পথের পথিক।

এখন পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়টী মীমাংসা করা কাহারও সাধ্য নয়। তাঁহাকে সগুণ বা নির্গুণ ভাবে ভাব, অথবা তাঁহাকে সাকার বা নিরাকার ভাবে ভাব, তাঁহার যথার্থ রূপ নির্ণয় করা মানবের সম্পূর্ণ অসাধ্য। তাঁহাকে বিরাটমূর্ত্তিতে ভাব বা মানবমূর্ত্তিতে ভাব, তাঁহার যথার্থ রূপ নির্ণয় করা একেবারে অসাধ্য। আগম, নিগম, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মপুস্তক তাঁহার আদ্যন্ত ও স্বরূপ পায় নাই। ঈষা, মুষা, মহম্মদ, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কেহই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ পান নাই; সকলেই তাঁহাকে নিজ নিজ মনের প্রকৃত্যনুযায়ী ভাবিয়া যান। বেদে তিনি সচ্চিদানন্দ বলিয়া কথিত হন। পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ; তিনি মায়াতীত ও গুণাতীত, অথচ তিনি সংসারে মায়াযোগে স্বপ্রকাশ।

অদ্বৈতবাদী হিন্দুর নিকট পরব্রহ্ম নির্গুণ বা গুণাতীত; কিন্তু আধুনিক একেশ্বরবাদিদিগের লৌকিক ঈশ্বর সগুণ। তিনি মায়াময় মানবমনের আদর্শে ব্যক্ত। মানবমন সূক্ষ্ম ও নিরাকার হইলেও স্থূলদেহে নিবদ্ধ হওয়ায় দেহের

স্থূলগুণে গুণান্বিত। সেজন্য লৌকিক ঈশ্বর নিরাকার বটে; কিন্তু তিনি মনের ন্যায় অশেষগুণে গুণান্বিত। মানবমনে যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণ বর্ত্তমান, সে গুলিকে অনন্তগুণিত করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করা হয়। অতএব লৌকিক ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, দয়াময়, মঙ্গলময় ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত। তাঁহাদের চক্ষে ঈশ্বর সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত এবং সংসারের অসৎ গুণরাশি ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী সয়তানের অবতারণা করেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত হিন্দু, তিনি পরব্রহ্মে মানবোচিত কোন গুণ বা কোন ভাব দেখেন না; তিনি কেবল পরব্রহ্মের মায়ারূপ ত্রিমূর্ত্তিতে মায়াময় মানবমনের মায়াগুণ দেখেন।

আরও দেখ, পাশ্চাত্য জগতে ঈশ্বরে মানবের শ্রেষ্ঠ গুণাবলি আরোপিত হওয়ায় তাঁহার কি অপরূপ রূপ দেখান হয়! এমন কি, এরূপ করাতে তাঁহার বিশেষ অবমাননা করা হয়। তিনি দয়াময়, অথচ ন্যায়বান। যিনি দয়াময়, তিনি কিপ্রকারে ন্যায়বান হন? যিনি ন্যায়বান, তিনি সদা কঠোর; তিনি কি প্রকারে দয়াময় হন? দয়া ও ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম; ইহারা একাধারে অবস্থিতি করিতে পারে না। সেইরূপ তিনি সর্ব্বশক্তিমান, অথচ মঙ্গলময়। যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি মঙ্গলময় কোথায়? ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময় বলাতে তাঁহার প্রতি বিদ্রূপ করা হয়। যখন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই, তখন ঈশ্বর কিরূপে সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময় হন? যদি বল, ঐ সকল শ্রেষ্ঠগুণ ঈশ্বরে আরোপ ব্যতীত অন্য গুণ আমরা কোথায় পাইব? কিন্তু যাহাতে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, যাহাতে তাঁহার ঈশ্বরত্ব নষ্ট করা হয়, সে গুণ তাঁহাতে আরোপ করিবার কি প্রয়োজন? ওহে একেশ্বরবাদিগণ! তোমরা কি বুঝিতে পার নাই, যে তোমাদের অসম্পূর্ণ মনের কিঞ্চিৎ উৎকর্ষসাধনের জন্যই ঈশ্বরে কেবল অসম্পূর্ণ মানবমনের অসম্পূর্ণ গুণরাশি আরোপ কর? তোমরা স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের মঙ্গলের জন্যই বলপূর্ব্বক ঈশ্বরে ঐ সকল শিরোভূষণ অর্পণ কর মাত্র? এইরূপে বিজ্ঞান একেশ্বর সম্বন্ধে নানা মতামত প্রকাশ করে। যদি বিজ্ঞানের কথা সত্য হয়, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরব্রহ্মসম্বন্ধে এরূপ কোন দোষে দূষিত হয় নাই। সত্য বটে, এ ধর্ম্ম পরব্রহ্মের বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য সম্যক

বর্ণন করে, কিন্তু মানবমনের অসম্পূর্ণ গুণাগুণ তাঁহাতে আরোপ করিয়া তাঁহার কোনরূপ অবমাননা করে না। প্রকৃত হিন্দুর নিকট পরব্রহ্ম চির-দিন মায়াতীত ও গুণাতীত।

যাহা হউক, বিজ্ঞান ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহাই প্রচার করুক না কেন, এই পাপতাপপূর্ণ সংসারে ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত দুর্ব্বল, অসহায় মানবের গত্য-ন্তর নাই। ভবপারাবারে তাঁহার অন্য কোন সহায় নাই, অন্য কোন বল নাই। ভগবানই ভবসমুদ্রে তাঁহার একমাত্র কাণ্ডারী। জড়বিজ্ঞান জ্ঞান-শক্তির যতই কেন প্রশংসা ও ধর্ম্মের যতই কেন নিন্দাবাদ করুক না, কেবল-মাত্র জ্ঞানযোগে ও বুদ্ধিযোগে আমরা ভবসমুদ্র পার হইতে পারি না। ভব-পারাবারে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর আমাদের প্রকৃত বন্ধু। বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণ উক্তিতে বিশ্বাস করিলে আমরা মহৎভ্রমে পতিত হইব; ইহাতে আমাদের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হইবে এবং মানবজীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইব।

দেখ, এ সংসারে যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহাদের জীবন কত অকি-ঞ্চিৎকর ও কত অপদার্থ! তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, তাঁহারা জীবনের যথার্থ হিতাহিত বুঝিতে অসমর্থ। তাঁহারা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নিকৃষ্ট সুখে নিকৃষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন এবং আপনাদিগকে পশুতুল্য করিয়া ফেলেন। যে সকল দেবভাব বা স্বর্গীয়ভাব ধার্ম্মিকদিগের মনকে দেবতুল্য বা স্বর্গোপম করে, সে সকল উৎকৃষ্ট ভাবনিচয় তাঁহাদের মনে আদৌ স্থান পায় না; তাঁহাদের মন ক্রমশঃ অধঃপতিত হয় এবং মৃত্যুর পরও তাঁহাদের জীবাত্মা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সত্য বটে, রাজদণ্ড ভয়ে বা লোকলজ্জা ভয়ে তাঁহারা দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকেন; কিন্তু কোন-রূপ পুণ্যকর্ম্ম করিলে, আত্মায় যে বিমল, বিশুদ্ধ আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহা হইতে তাঁহারা চিরদিন বঞ্চিত থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহারা পরলোকে নিরয়গামী হউন বা না হউন, তাঁহাদের ইহজীবনই সর্ব্বপ্রকারে নরকতুল্য। সে ব্রহ্মা-নন্দ নাই, সে আত্মপ্রসাদ নাই; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সংসারের কতকগুলি জ্বালা ও যন্ত্রণা, কর্ম্মভোগ, আর নৈরাশ্যসাগরে নিমজ্জন। বিজ্ঞানের যে কথায় আমাদের এতদূর অনিষ্টসাধন হয়, সে কথায় কর্ণপাত করা কি আমা-

দের কর্ত্তা ? বিজ্ঞান নিজ নাস্তিক মত যতই কেন গগনভেদিরবে প্রচার করুক না, আমরাও সে সকল পাপ কথায় আদৌ কর্ণপাত করিব না।

ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ।

মানবধর্ম্মমাত্রেই এক এক জন সদ্গুরু, ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গম্বর বা অবতার সমধিক পূজ্য। খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈষাকে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র জ্ঞান করে এবং তাঁহাকে মধ্যস্থ করিয়া ঈশ্বরের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতে উপদেশ দেয়। মুসলমানধর্ম্ম স্বপ্রবর্ত্তক মহম্মদকে ঈশ্বরের প্রিয়পয়গম্বর জ্ঞান করে এবং তাঁহারই ব্যবস্থামতে চলিতে সকলকে উপদেশ দেয়। বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধদেবকে ঈশ্বর স্থানে পূজা করে এবং হিন্দুধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে। নিজ নিজ আরাধ্য মহাপুরুষকে প্রত্যেক ধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গম্বর বা অবতার বলিয়া মান্য করে। যে ধর্ম্ম দ্বৈতবাদী এবং জগৎ ও স্রষ্টাকে সম্পূর্ণ পৃথক জ্ঞান করে, সে ধর্ম্ম আরাধ্য মহাপুরুষকে প্রিয়পুত্র বা প্রিয়পয়গম্বর বলিয়া পূজা করে; আর যে ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদী এবং জগৎ ও স্রষ্টাকে আদৌ পৃথক জ্ঞান করে না, সে ধর্ম্ম আরাধ্য মহাপুরুষকে ঈশ্বর জ্ঞান করে বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান করে। ধর্ম্মজগতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ চিরদিন প্রচলিত বলিয়া ঈশ্বরের অবতার-পূজন সম্বন্ধে প্রত্যেক বৈশেষিক ধর্ম্মের এত মতভেদ দৃষ্ট হয়।

প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গম্বর ও অবতার এই তিনটী কথার তাৎপর্য্যে বিস্তর পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য প্রায় একরূপ। যখন ইহাদের কোন না কোনটী প্রত্যেক ধর্ম্মে দেখা যায়, তখন নিশ্চয়ই ইহাদের সম্যক আবশ্যকতা আছে। কঠোর আবশ্যকতাই সংসারে সকল কার্য্যের মূল। আবশ্যকতা ব্যতীত ইহারা কদাচ সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে না। মানব-মনের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে ইহাদের আবশ্যকতা সর্ব্বত্র সমভাবে অনুভূত হয়।

মানবমন সূক্ষ্ম বা অধ্যাত্মজগতের সহিত সম্বদ্ধ হইলেও, স্থূলমস্তিষ্কের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ; এমন কি, ইহা স্থূলমস্তিষ্ক হইতে সমুৎপন্ন। যুগ-

ধর্ম্মানুসারে ইহার অভ্যন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি প্রণষ্ট এবং বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিই সম্যক্ স্ফুরিত; এজন্য ইহা এখন সূক্ষ্মজগতের বিষয় আদৌ অবগত হয় না এবং স্থূলজগতের স্থূলজ্ঞানই লাভ করে। এই প্রকারে ইহার আধ্যাত্মিকত্ব এখন ক্ষয়প্রাপ্ত এবং তৎপরিবর্ত্তে ইহার স্থূলত্ব সম্যক পরিবর্দ্ধিত। সুতরাং এখন লোকে গুণাতীত, মায়াতীত পরব্রহ্ম আদৌ বুঝিতে পারে না; এমন কি, তাহারা নিরাকার সগুণ ঈশ্বর ভজনা করিয়াও প্রকৃত তৃপ্তি বোধ করে না। নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করিতে গেলেই, তাহারা মনের অধিকাংশভাগ শূন্যময় দেখে এবং বাধ্য হইয়া এক জন প্রিয়পুত্র, পয়গম্বর বা অবতারের আশ্রয় লয়। এ স্থলে তাহারা ঐ সকল মহাপুরুষকে স্থূলদেহধারী ঐশ্বরিক রূপ জ্ঞান করে এবং তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করিয়া তাঁহাদের আরাধনা করতঃ নিরাকার ঈশ্বর প্রাপ্তির অভিলাষ করে।

নিরাকার ভজনে তৃপ্তিবোধ হয় না বলিয়া লোকে এখন সাকার পূজন করিতে বাধ্য হয়।

> ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তচেতসাম্
> অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।
>
> (গীতা)

"যাহারা নিরাকার ভজনে রত, তাহাদের ঐরূপ ভজন অতি ক্লেশকর। এই স্থূলদেহ ধারণ করিয়া লোকে অতি কষ্টে নিরাকার ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়।"

খ্রীষ্টধর্ম্মের রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীকচার্চ্চ সম্প্রদায় ঈষার আলেখ্য ও মূর্ত্তি গির্জ্জায় কেন দেখায়? নিরাকার ভজন করিয়া লোকে তৃপ্তিবোধ করে না বলিয়াই উহারা ঐরূপ করিতে বাধ্য হয়।

প্রিয়পুত্র, পয়গম্বর বা অবতার মানাতে, প্রত্যেক বৈশেষিকধর্ম্ম প্রাকৃতিক-ধর্ম্মের একটী সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে। মানবধর্ম্মমাত্রেই একটা মহোচ্চ আদর্শ দেখাইয়া লোকবর্গকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় এবং তাহাদের মনের উন্নতি-সাধন করিতে চেষ্টা পায়। খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম সগুণ নিরাকার ঈশ্বরকে মানবের আদর্শস্বরূপ দেখায়; কিন্তু মানবমন সেরূপ নিরাকারোপাসনায় প্রকৃতরূপ তৃপ্ত না হওয়ায়, স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র বা প্রিয়-পয়গম্বর জ্ঞানে অলৌকিক ভক্তি ও সম্মান দেখায়, এমন কি তাঁহাদিগকে পূজ-

ঈশ্বর বা পয়গম্বর-ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে এবং তাঁহাদিগকে মধ্যস্থ করিয়া নিরাকার ঈশ্বর প্রাপ্তির অভিলাষ করে। বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে নির্গুণ পর-ব্রহ্মের স্থূলরূপ জ্ঞানে পূজা করে। সেইরূপ এক এক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক লোকবিশেষও স্বসম্প্রদায়স্থ লোকবর্গ কর্ত্তৃক সদ্‌গুরু জ্ঞানে পূজিত হন। ফলতঃ ঐ সকল মহাপুরুষদিগের প্রতি জনসাধারণের তাদৃশ অলৌকিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা না হইলে, তাহারা কি প্রকারে তাঁহাদিগের উপদিষ্ট ধর্ম্মামৃত পান করিয়া সকল বিষয়ে তাঁহাদের অনুসরণ করতঃ নিজ জীবনের উন্নতিসাধন করিতে পারে ? এ স্থলে তাঁহাদের উপর যাঁহার যত ভক্তি ও যত বিশ্বাস, তিনিও সেই পরিমাণে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন।

কেহ কেহ বলেন, যখন আমরা পরমপিতা পরমেশ্বরের সাধারণ পুত্র, তখন পিতার নিকট যাইবার জন্য মধ্যস্থ রাখিবার পুত্রের কি প্রয়োজন ? তবে কেন আমরা ঈষা, মহম্মদ প্রভৃতিকে মধ্যস্থ করিয়া ঈশ্বরারাধনা করি ? কাহারও সাহায্য না লইয়া আমরা স্বয়ং ঈশ্বরারাধনা করিব। কিন্তু মানবের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে সাধারণতঃ এরূপ হওয়া অসম্ভব। যদি নিরাকার ভজনা করিয়া মানবমন যথার্থ তৃপ্তিবোধ করিত, অথবা যদি নিরাকার ঈশ্বরে আন্তরিক প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শন করা যাইত, কোন দেশের কোন লোক ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গম্বর বা অবতারের আশ্রয় লইত না। নিরাকার ঈশ্বরকে স্থূলমনের সম্যক্ ভাব্য করিবার জন্য তাঁহার একটা স্থূলরূপের নিতান্ত প্রয়োজন। অগ্রে তাঁহার স্থূলরূপে অপার ভক্তি ও প্রেম প্রদর্শন কর, তবে তুমি বহু দিবসান্তে নিরাকার ভজনে উপযুক্ত হও। প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গম্বর ও অবতার এ তিনই নিরাকার ঈশ্বরের স্থূলরূপ মাত্র।

এখন দেখা যাউক, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গম্বর বা অবতার মানেন, তাঁহাদের মধ্যে কে সহজে ঈশ্বর লাভ করেন ? ইনি ঈশ্বরের প্রিয়-পুত্র বা প্রিয়পয়গম্বর, ইঁহাকে মানিলে লোকে সহজে ঈশ্বর পায় ? না ইনিই ঈশ্বর, এরূপ ভাবাতে তাহারা আরও সহজে ঈশ্বর পায় ? সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন, শেষোক্ত উপায়ে অতি সহজে ঈশ্বর পাওয়া যায়। প্রিয়পুত্র মান বা প্রিয়পয়গম্বর মান, তাহাতে ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিস্তর প্রভেদ থাকে ; কিন্তু অবতার পূজা করিলে, ঈশ্বর ও অবতারে কোনরূপ ভেদাভেদ

থাকে না। অতএব অবতার পূজা করিয়া হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা যে মহোচ্চ ভাব দেখায়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে অদ্বৈতবাদী হিন্দু নির্গুণ, নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের অস্তিত্ব বুঝিয়া সমগ্র জগৎ ব্রহ্মময় বলেন, তাঁহার নিকট তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম, তুমিও "তত্ত্বমসি, আমিও "সোঽহম্", তাঁহার নিকট সাকারপূজন পরব্রহ্মের কিছুমাত্র অবমাননা নহে এবং অবতার পূজনও তাঁহার নিকট পরব্রহ্মের অবমাননা নহে; বরং ইহাতেই তাঁহার ব্রহ্মভক্তি সম্যক স্ফুরিত ও প্রকাশিত হয়। যে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্মের মায়ারূপ ত্রিমূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহাকে তোমার মায়াময় স্থূলমনের সম্যক্ ভাব্য করে, সেই হিন্দুধর্ম্ম আবার তোমার আত্মার প্রকৃত মঙ্গলের জন্য, তোমার মনের সাত্ত্বিকভাবের স্ফূর্ত্তির জন্য, সেই পরব্রহ্মের বিশ্বপালক সাত্ত্বিকরূপ বিষ্ণুকে কয়েক অবতারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করায়; যেখানে অসাধারণ গুণের বিকাশ দেখে, সেইখানেই ঈশ্বররূপ দর্শন করতঃ তাঁহাকেই মানবজীবনের আদর্শ স্বরূপ দেখায়; তৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মজীবনের অনুকরণে লোকবর্গকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রাম ও কীর্ত্তিকলাপ কবির সুললিত কণ্ঠে গান করায়।

এখন জিজ্ঞাস্য, লোকবর্গকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য বা ধর্ম্মজগতের উন্নতির জন্য, ঈশ্বর স্বয়ং জগতে অবতীর্ণ হন কি না? মানবের জাতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, আমাদের স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যখন সংসারে ধর্ম্মের লোপ ও অধর্ম্ম প্রবল হয়, তখনই এক এক জন ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্ম-জগতে মহৎ আন্দোলন করেন ও নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন। তাঁহারাই ধর্ম্ম জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন এবং স্বজীবনে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় দেখাইয়া জনসাধারণকে যথার্থ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া যান। অবনতির দিকে প্রকৃতি এত অধিক প্রবণা, যে মধ্যে মধ্যে এরূপ ধর্ম্মাত্মার আবির্ভাব ব্যতীত জগতে ধর্ম্মোন্নতি হইবার আশা নাই।

কয়েকটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া এই বিষয়টী সমর্থন করা আবশ্যক। যৎকালে বুদ্ধদেব ভারতে অবতীর্ণ হন, তৎকালে জনসাধারণ সামাজিক ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে নানাবিধ পশু হত্যা করতঃ হিংসাপর হয়। সাধারণ লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তিনি অহিংসা পরম ধর্ম্মের জয় ঘোষণা

করেন। যৎকালে ঈশা প্যালাষ্টাইনে আবির্ভূত হন, তৎকালে জনসাধারণ পৌত্তলিকতায় অধর্ম্মপর হয়; তজ্জন্য তিনি একেশ্বরবাদের জয় ঘোষণা করেন এবং তদুদ্দেশে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন করেন। যৎকালে শঙ্করাচার্য্যদেব ভারতে অবতীর্ণ হন, তৎকালে বহুসংখ্যক লোক নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ অধর্ম্মপরায়ণ হয়; তজ্জন্য তিনি হিন্দুধর্ম্মের আমূল সংস্কার করতঃ ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া যান। যৎকালে বঙ্গীয় সমাজে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন, তৎকালে জনসাধারণ তন্ত্রোক্ত কুল-ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করতঃ অধর্ম্মপরায়ণ হয়; তন্নিবারণার্থ তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন। যৎকালে গুরু নানক পাঞ্জাবে আবির্ভূত হন, তৎকালে তত্রত্য বহুসংখ্যক লোক ম্লেচ্ছ মুসলমানদিগের সংস্রবে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়; তন্নিবারণার্থ তিনি শিখ সম্প্রদায় স্থাপন করতঃ তথায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন করেন। যৎকালে রামমোহন রায় বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন, তৎকালে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে আরম্ভ করে; তন্নিবারণার্থ তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। যাহা হউক, যখনই সংসারে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ধর্ম্মাত্মাগণ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করেন।

যদা যদা ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় চ সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

(গীতা)

"যখনই পৃথিবীতে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃজন করি। পাপাত্মাদিগের বিনাশের জন্য, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, পৃথিবীতে ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আমি মধ্যে মধ্যে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হই।"

গীতোক্ত এই মহাসত্যটী মানবের জাতীয় ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে।

এস্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, পাপাত্মাদিগের নাশের জন্য ও সাধুজনের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এ কেমন কথা?

লোক ক্ষয় করিবার জন্য মহামারী, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, উৎকট পীড়া প্রভৃতি নানা উপায় বর্ত্তমান এবং সাধুজনের পরিত্রাণের জন্যও নানা উপায় বর্ত্তমান; তবে কেন সামান্য কর্ম্মের জন্য ঈশ্বর অবতার লইবেন? এস্থলে শাস্ত্রকারেরা ক্ষত্রিয়জাতিকে ধর্ম্মযুদ্ধ শিখাইবার জন্য তাঁহাদের আদর্শ পুরুষের কথা উল্লেখ করেন; কি প্রকারে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া পাপাত্মাদিগের নাশ করিতে হয় এবং ধার্ম্মিকদিগের রক্ষা করিতে হয়, কি প্রকারে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিতে হয়, তাহাই ভালরূপ দেখাইবার জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ স্বীকার করেন। রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ইহার জন্যই ভারতে অবতীর্ণ হন।

শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, জোরষ্টার, মূষা, বুদ্ধদেব, ঈষা, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব প্রভৃতি যে সকল মহাত্মাগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দুন্দুভিস্বরে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন, তাঁহারা প্রকৃত দেবতা; তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অংশরূপে আবির্ভূত হন; তাঁহারা প্রকৃত যোগেশ্বর, যোগবলেই তাঁহারা ধর্ম্মজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন এবং যোগবলেই তাঁহারা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। যদি বল, তাঁহারা সাধারণ মানব, কেবল অবস্থাবিশেষে পতিত হইয়া জগতে নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করায় বা অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করায় তাঁহারা লোকসমাজে সুবিখ্যাত হন এবং তদীয় পরমভক্ত শিষ্যগণ বা কবিগণ তাঁহাদের গুণগ্রাম ও কীর্ত্তিকলাপ স্ব স্ব গ্রন্থে অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করায় তাঁহারা জগতে সমধিক পূজ্য হন এবং কালে লোকের আদর্শপুরুষ হন; তবে কেন আমরা তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র বা অবতার বলিয়া মান্য করি? কিন্তু এরূপ ভাবাতে মানবসমাজের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। নিরাকার ঈশ্বরে মানবীয় গুণাবলি আরোপ করতঃ তাঁহাকে পূর্ণ আদর্শ করিয়া ভাবাতে মনে তাদৃশ তৃপ্তিবোধ হয় না। অশেষগুণসম্পন্ন মানবই মানবের প্রকৃত আদর্শ; আবার সেই মানব যদি ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র বা অবতার বলিয়া সকলের দৃঢ়বিশ্বাস হয়, তিনিই সকলের পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ হন এবং তাঁহারই উপদেশ ও জীবনী দ্বারা সকলে যেরূপ উপকৃত হন, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। অতএব মানবমনের প্রকৃত তৃপ্তিসাধনের জন্য, মানবসমাজের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরকে মানবাকারে ভাবাই কর্ত্তব্য।

এস্থলে যাঁহারা অবতারপূজনকে ধর্ম্মের কুসংস্কার মনে করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন না।

সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরের কোন না কোন অবতার বা প্রতিনিধি দেখা যায়। মানবপ্রকৃতি যেমন, তাহাতে নির্গুণ ব্রহ্মে বা নিরাকার ঈশ্বরে যথার্থ প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শিত হয় না। সকল লৌকিক ধর্ম্ম নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় আরম্ভ করে বটে, কিন্তু পরিশেষে উহারা ঈশ্বরের অবতার বা লৌকিক প্রতিনিধি গ্রহণ করতঃ সাধারণ মানবমনের তৃপ্তিসাধন করে। যথার্থ ভাবিতে গেলে, খৃষ্টধর্ম্মে ঈষা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র এবং হিন্দুধর্ম্মে শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার, উহাদের তাৎপর্য্য এক ; প্রভেদের মধ্যে এই যে, দ্বৈতবাদী খৃষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরের অবমাননার ভয়ে "অবতার" কথাটী ব্যবহার করে নাই, আর অদ্বৈতবাদী হিন্দুধর্ম্ম পক্ষপাতশূন্য হইবার জন্য "প্রিয়পুত্র" কথাটী ব্যবহার করে নাই।

বস্তুতঃ এই অপকৃষ্ট কলিযুগে শিশ্নোদরপরায়ণ মানবের যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষার জন্য অবতারপূজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এখন তাঁহার সে আধ্যাত্মিকতা নাই, তাঁহার মনের তাদৃশ তেজ নাই, শরীরেরও তাদৃশ বল নাই ; তিনি এখন সংসারের পুত্রকলত্র লইয়াই বিব্রত, উহাদের গ্রাসাচ্ছাদনার্থ অনুক্ষণ চিন্তিত, এখন তিনি কি প্রকারে নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন ? এখন সগুণ নিরাকার ঈশ্বরের ভজনাও তাঁহার বিড়ম্বনা মাত্র ; তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের অবতার পূজনই সহজ ও সুগম। ইহার জন্যই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যুগধর্ম্মে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর করাইবার জন্য অবতার পূজন বিধিবদ্ধ করে এবং অবতারদিগের বিবিধ সাংসারিক লীলা শ্রবণ করায়। আমরাও সেই সকল লীলা শ্রবণ করতঃ আনন্দাশ্রু ও শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে মনের সাত্ত্বিক ভাব সম্যক স্ফুরণ করিয়া ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হই।

এস্থলে কোন কোন উন্নত একেশ্বরবাদী বলেন, আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিব, দয়াল দয়াল বলিতে বলিতে ঈশ্বর প্রেমে গদগদ হইয়া তাঁহার সংকীর্ত্তন করতঃ প্রকৃত ব্রহ্মানন্দে নৃত্য করিব, মনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী তাঁহার উপাসনা করিয়া ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইব ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইব, আমি কেন ঈশ্বরের একটা সামান্য অবতার পূজিতে যাইব ? আমি

যখন স্বয়ং ঈশ্বর বুঝি, তখন ঈশ্বর ত্যাগ করিয়া একটা সামান্ত মানবের পূজন কি আমার শোভা পায়? অবতার-পূজন সামান্ত মানব-পূজন নহে। "যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী," ঈশ্বরকে যিনি যেমন ভাবেন, তিনি তেমনি ফল পান। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে সামান্ত মানব জ্ঞান কর, তাঁহারা তোমার নিকট সামান্ত মানব; তাঁহাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞান কর, তাঁহারা তোমার প্রকৃত ঈশ্বর। আরও জানিও, শাস্ত্রোল্লিখিত অবতারগণের লীলা ও ক্রিয়াকলাপ শ্রবণ ও পঠনে সাধারণ লোকের মনে যেরূপ ধর্ম্মশিক্ষা হয়, অথবা মানবমনে উচ্চ, স্বর্গীয়, সাত্ত্বিক ভাবগুলি যেরূপ ভাবে স্ফুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, কেবল ঈশ্বরকে দয়াময় দয়াময় বলিয়া ডাকিলে, অথবা তাঁহার সামান্তরূপ উপাসনা করিলে কদাচ সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অবতার-পূজন হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার নহে। ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম শিক্ষা দিবার জন্তই শাস্ত্রে অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের মঙ্গলের জন্তই হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরকে কয়েক মানবাকারে দেখাইয়া ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্মসাধনা আমাদের নিকট সহজ ও সুগম করিয়াছে। প্রকৃত জ্ঞানশক্তি থাকে, ধর্ম্মের গূঢ় উদ্দেশ্ত বুঝিয়া জ্ঞানশক্তি চরিতার্থ কর এবং অবতারপূজনে একাগ্রচিত্ত হও।

আত্মার প্রকৃতি।

বিত্তালয়ে সকলেই শিক্ষা করেন, আত্মা, মন ও জড়দেহ এই তিন উপাদানে মানব নির্ম্মিত। পরে যখন তাঁহারা কলেজের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং উন্নত জড়বিজ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন তাঁহারা অন্ধকার হইতে আলোকে আইসেন এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা করেন, আত্মা কেবল একটা কথার কথা মাত্র, উহার অস্তিত্ব আদৌ নাই; মন ও জড়দেহ লইয়াই মানব নির্ম্মিত। চিরকাল মানবধর্ম্ম সকলদেশে অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে বটে, কিন্তু জড়বিজ্ঞান আজকাল ধর্ম্মের সেই চিরাদৃত মতকে পদে দলন করে এবং এক তুড়িতে উড়াইয়া দেয়।

খ্রীষ্ট প্রভৃতি একেশ্বরবাদী ধর্ম্মের মতে মানবের আত্মা ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হয় এবং যতদিন প্রাণ মানবদেহে বর্ত্তমান থাকে, ততদিন আত্মা দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া দেহকে চৈতন্তময় করে এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে ও

জ্ঞানোপার্জ্জনে মনকে চালিত করে। মানবমন আত্মার অংশ বা দাস এবং উহা আত্মা দ্বারাই অনুক্ষণ চালিত হয়। স্বাধীন ইচ্ছায় বিভূষিত হওয়ায় আত্মা ইহজন্মে পাপপুণ্যের পথ স্বয়ং পছন্দ করে এবং তজ্জন্য সংসারে বিবিধ সুখদুঃখ ভোগ করে ও অন্তে স্বর্গগামী বা নিরয়গামী হয়। শরীর বিনষ্ট হইলে, আত্মা দেহ-পিঞ্জর হইতে মুক্ত হয় এবং ইহজন্মকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করে। আজ যে মন সংসারে অনন্ত চিন্তায় চিন্তায়মান এবং যে দেহ সংসারের অনন্তকর্ম্মে প্রযুজ্যমান, প্রাণপক্ষী উড়িয়া গেলে, মাটির দেহ মাটিতে মিশিয়া যায় এবং আত্মাও দেহত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। যতদিন সংসারে উন্নত একেশ্বর-বাদ প্রচলিত আছে, ততদিন উপরোক্ত মতটী সাধারণ সমাজে গৃহীত হয়।

এখন জড়বাদী বিজ্ঞান শবব্যবচ্ছেদ ও রাসায়নিক বিশ্লেষণাদি উপায় অব-লম্বনপূর্ব্বক মানবের স্থূলদেহকে অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করতঃ সিদ্ধান্ত করে, যে মানবদেহটী ঘটীযন্ত্রের ন্যায় চিরদিন চালিত; প্রভেদের মধ্যে, ইহা ঘটীযন্ত্র অপেক্ষা সহস্রগুণ জটিল। যেমন ঘটীযন্ত্রের কোন এক অত্যাবশ্যকীয় কল বিকৃত হইলে, উহা অচল হয়, সেইরূপ মানবদেহরূপ জটিলতম যন্ত্রের হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌ ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া অধিক পরিমাণে বিকৃত হইলে, ইহাও অচল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন ইহার জটিল বিমিশ্র জৈবনিক পদার্থগুলি প্রকৃতিজগতের শক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প জটিল, অজৈবনিক যৌগিক পদার্থে পরিণত হয় এবং এইরূপে ইহার পরমাণুপুঞ্জ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

যেমন বাষ্পীয় কলে উদক অগ্নিসংযোগে অমিতবলশালী বাষ্পে পরিণত হয়, পরে যন্ত্রবিশেষ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া মূলচক্র ঘূর্ণায়মান করতঃ বাষ্পীয় পোতাদি চালায়, সেইরূপ মানবও জীবদ্দশায় নিজদেহে উদ্ভিজ্জনিহিত সূর্য্যের অব্যক্ত তেজোরাশিকে (Potential energy) অঙ্গসঞ্চালন ও মানসিক ক্রিয়াদিরূপ ব্যক্ত তেজোরাশিতে (Kinetic energy) প্রকটিত করতঃ সংসারের অনন্ত ক্রিয়া সম্পাদন করেন।* মানবদেহে স্ফুরিত ও বিবর্দ্ধিত

---

* উদ্ভিজ্জে সৌরতেজ অব্যক্তরূপে নিহিত। যৎকালে উদ্ভিজ্জপত্রের হরিৎবর্ণীয় জীবাণুগুলি (chlorophyl) সূর্য্যরশ্মির সমক্ষে বায়ুবিলীন কারবণিক এসিড গ্যাসকে বিশ্লিষ্ট করে, তৎকালে সৌরতেজ উদ্ভিজ্জদেহে অব্যক্তভাবে নিহিত হয়, পরে যে জীব সেই উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করে, উহার দেহে সৌরতেজ ব্যক্তরূপে প্রকটিত হয়; এ কারণ জীবদেহ অঙ্গ সঞ্চালনাদি বিবিধ জৈবনিক ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ।

মস্তিষ্কই মানসিক ক্রিয়ার যন্ত্র। এই যন্ত্র সংযোগে জড়পদার্থ ইহার চরম পরি-ণতি মানববুদ্ধি প্রকাশ করে। যতক্ষণ বিশুদ্ধ শোণিত মস্তিষ্কে বহমান থাকে, ততক্ষণ মস্তিষ্ক দ্বারা উহার যাবতীয় ক্রিয়াগুলি সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। ইন্দ্রিয়যোগে বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ বল, চিন্তা, মনন বা অনুভব বল, কোন অতীত ঘটনার পূর্ব্বস্মৃতি বল, সকল মানসিক ক্রিয়াই মস্তিষ্কের স্নায়বীয় পদার্থের পরিবর্ত্তন বশতঃ উৎপাদিত হয়। মস্তিষ্কে শোণিত সঞ্চারের ব্যতিক্রম ঘটিলে, মানসিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ স্নায়ুগ্রন্থির সর্ব্বদেহব্যাপ্ত অসংখ্য স্নায়ুশিরা দ্বারা দেহের সকল অংশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। এই সকল স্নায়ুশিরায় তাড়িৎপ্রবাহরূপ ক্রিয়া দ্বারা কেন্দ্রীভূত স্নায়ুগ্রন্থীর ঘাত-প্রতি-ঘাতে যাবতীয় জৈবনিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। মস্তিষ্ক দেহের রাজা; উহারই আজ্ঞা দেহের সর্ব্বস্থলে পালিত হয়; কিন্তু জীবন ধারণের জন্য যে সকল ক্রিয়া অত্যাবশ্যকীয়, যেমন ফুস্‌ফুসের শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, উহারা মস্তিষ্কের অজ্ঞাতসারে সম্পাদিত হয়। যাহা হউক, বিজ্ঞানের মতে মানবমনটী মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র এবং মন নামে পৃথক বস্তু দেহে আদৌ বর্ত্তমান নাই।

এই সকল মতামত প্রচার করিয়া, জড়বাদী বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, আত্মা নামে অভিহিত এমন কোন সূক্ষ্ম পদার্থ জীবদেহে বিদ্যমান নাই। আত্মা মানবমনের কল্পিত আকাশকুসুম মাত্র এবং ভ্রান্তদর্শন ও ভ্রান্তধর্ম্ম এত কাল এই ভ্রান্ত মত জগতে প্রচার করিয়া আছে। এইরূপে ধর্ম্মের যত বুজরুকি বিজ্ঞান তাহা একে একে উদ্‌ঘাটন করিতেছে। প্রবল প্রতাপান্বিত বিজ্ঞানের ভয়ে এখন ধর্ম্ম-বেচারি সদা সশঙ্ক ও শশব্যস্ত, কোন্ দিন বিজ্ঞান ইহার কোন সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে।

জনসাধারণের বিশ্বাস, গর্ভাবস্থায় চতুর্থ মাসে যখন মানবভ্রূণের অঙ্গসঞ্চালন মাতাকর্ত্তৃক প্রথম অনুভূত হয়, তখন ভ্রূণে জীব প্রদত্ত হয় এবং সেই সঙ্গে আত্মাও উহাতে অনুপ্রবেশ করে; সেইরূপ শরীরনাশে আত্মা দেহের নব-দ্বারের মধ্যে কোন এক দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। বিজ্ঞান এই সকল কথার তীব্র প্রতিবাদ করে। ইহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, যে দিন স্ত্র্যণু ও পুমণু জরায়ুগর্ত্তে একত্রিত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতেই উহাতে জীব বা জীবনীশক্তি স্বতঃ আইসে এবং জরায়ুজীবনের কোন সময়ে

উহাতে আত্মা নামে কোন বস্তু প্রবেশ করে না ; তবে যে চতুর্থ মাসে মাতা ভ্রূণের অঙ্গসঞ্চালন অনুভব করেন, তাহা কেবল জরায়ু বর্দ্ধিত হওয়ায় ভ্রূণের অঙ্গস্পন্দন উদরের মাংসপেশী দ্বারা অনুভূত হয়। মানবশরীরের অনেক স্থলে এমন বিবিধ ক্রিয়া অনুক্ষণ সম্পাদিত হয়, যাহা আদৌ অনুভব করা যায় না। সে জন্য প্রথম তিন মাস ভ্রূণের গর্ভাভ্যন্তরে অবস্থিতি অনুভব করা যায় না। সেইরূপ জীবননাশে প্রাণ বা আত্মা নামে কোন বস্তু দেহ হইতে বহির্গত হয় না। নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইলে, মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং কখনও কখনও শেষ-বায়ু মুখ-বিবর হইতে নিঃসৃত হওয়ায় উহা ব্যাদিত থাকে। তাহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, আত্মা মুখ-বিবর দিয়া বা অন্য কোন দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যায়।

বিজ্ঞানের মতে, যেমন অন্যান্য জীবজন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং কিছুদিন থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, উহাদের প্রধান কর্ম্ম উদরপূরণ ও বংশবৃদ্ধি ; সেইরূপ মানবও এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং কিছুদিন এখানে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হন ; উদরপূরণ ও বংশবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সমাজধর্ম্মপালন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার মতে আত্মার অস্তিত্ব আদৌ নাই, পরলোকের অস্তিত্ব নাই, আমরা কেবল ছাগছাগীর ন্যায় উপজাত ; ধর্ম্মাধর্ম্ম আমাদের সকলই মিথ্যা ; আছে কেবল আমাদের জ্ঞানশক্তি এবং এই জ্ঞানশক্তিবলে আমরা জগতে সভ্যতার উন্নতিসাধন করিয়া থাকি। ইহার মতে এই নশ্বর দেহনাশের পর আমরা পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করি না ; যে সকল পরমাণুপুঞ্জ একত্রিত হইয়া আমাদের দেহ নির্ম্মাণ করে, হয়ত মৃত্যুর পর উহাদের পুনরায় একাধারে ঐরূপ সমাবেশ কস্মিন্‌কালে ঘটে না এবং যদি কখন উহাদের ঐরূপ সমাবেশ ঘটে, তবে আমরা পুনরায় জগতে আসিতে পারি।

এই সকল নাস্তিক মতামত বিজ্ঞান আজকাল গগনভেদিরবে প্রচার করে এবং যাঁহারা উহার কুহকে মুগ্ধ, তাঁহারা উহার উপদেশে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মের কাহিনী অবিশ্বাস করেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, বিজ্ঞানের মতামত অজ্ঞ জনসাধারণের ভিতর এখনও ভালরূপ প্রচারিত হয় নাই। উহারা এখনও ঈশ্বর ও পরলোক মানিয়া চলে। রে জড়বাদী জড়বিজ্ঞান ! তোমার এ কি

আস্পর্দ্ধা ! তুমি ধর্ম্মের চিরাদৃত মত বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের স্বর্গীয় মত খণ্ডন করিতে সাহসী ! যখন তোমার শারীরবিধান শাস্ত্র এখনও মানবমনের বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিষয় এখনও উহা অধিক আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই, তথন কেন তুমি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সত্য ধ্বংস করিতে উদ্যত ? যখন তুমি জড়বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থাটী বুঝিতে পার, তদ্ভিন্ন উহার সূক্ষ্ম অংশের বিষয় আদৌ অবগত নও, তখন কেন তুমি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সত্য ধ্বংস করিতে উদ্যত ? যখন জড়বস্তুর স্থূলরূপ লইয়াই তোমার যাবতীয় সিদ্ধান্ত এবং উহারা ঐকদেশিক ও অস্থায়ী, তখন কেন তুমি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অবিনাশী সত্য ধ্বংস করিতে উদ্যত ? রে জড়বিজ্ঞান ! তুমি এখন মানবসমাজের মহৎ সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত ! যে সকল মতামত লইয়া মানবসমাজ এত কাল ধর্ম্মপথে অগ্রসর, সেই সকল অশেষ কল্যাণকর মতামতের বিলোপসাধন করিতে তুমি আজ বদ্ধপরিকর। তোমার কথায় কর্ণপাত করিলে, আমরা মানবজীবনের প্রধান শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইব। তোমার কথায় কর্ণপাত না করাই সকলের কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, অধ্যাত্মবিজ্ঞান আত্মাসম্বন্ধে কিরূপ নির্দ্দেশ করে, এখন তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। পুরাকালে আর্য্যঋষিগণ যোগবলে মানবপ্রকৃতির বিষয় যেরূপ অবগত হন, তাহা এখন বেদান্তে ও যোগশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তাঁহারা সমাধিবলে স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, মানবমন ও মানবাত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমাধির অবস্থায় মন লয়প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়াদির সহিত উহা মূলপ্রকৃতিতে লীন হয় ; কিন্তু তৎকালে মানবাত্মা জাগরূক হয় এবং উহার সর্ব্বজ্ঞ অনন্তশক্তি প্রকটিত হয়। যুগধর্ম্মে আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ ও বর্ত্তমান শরীরলব্ধ অপরিহার্য্য অধ্যাসবশতঃ এখন আমরা মন ও আত্মাকে এক পদার্থ জ্ঞান করি ; বস্তুতঃ উহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শরীর মনের উপাধি অথবা শরীরস্থ মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র ; স্থূল শরীর বা মস্তিষ্ক স্থূলজগতের উপাদানে নির্ম্মিত ; কিন্তু সূক্ষ্ম মন সূক্ষ্ম অধ্যাত্মজগতের উপাদানে নির্ম্মিত এবং স্থূল মস্তিষ্কযোগে প্রকটিত হওয়ায় অল্লাধিক স্থূলত্বপ্রাপ্ত। মন আবার আত্মার উপাধি এবং শেষোক্তটী প্রথমোক্ত দ্বারাই সংসারে প্রকটিত হয়। অতএব আত্মা ও মনের ভিতর বিস্তর পার্থক্য। আত্মা পরমাত্মার অংশ।

আত্মার যথার্থ প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিতে হইলে, মানবপ্রকৃতির সম্যক্ বিশ্লেষণ করা কর্ত্তব্য। এখন তত্ত্ববিদ্যা, বেদান্ত ও যোগশাস্ত্র মানবপ্রকৃতিকে যেরূপভাবে বিশ্লিষ্ট করে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

তত্ত্ববিদ্যা মতে সপ্তবিধ তত্ত্বে মানবপ্রকৃতি বিরচিত ; যথা :—

(১) স্থূল দেহ।

(২) প্রাণ।

(৩) লিঙ্গ-শরীর।

(৪) কামরূপ।

(৫) মন { ইচ্ছা, ভাব। বিজ্ঞান।

(৬) বুদ্ধি।

(৭) আত্মা।

যেমন আয়ুর্ব্বেদমতে স্থূলদেহ সপ্তবিধ ধাতুতে নির্ম্মিত, তত্ত্ববিদ্যামতে স্থূল-সূক্ষ্মরূপধারী মানবও উপরোক্ত সপ্তবিধ তত্ত্বে নির্ম্মিত।

বেদান্ত মতে মানবে পাঁচটী কোষ বর্ত্তমান। যথা :—

(১) অন্নময় কোষ।

(২) প্রাণময় কোষ।

(৩) মনোময় কোষ।

(৪) বিজ্ঞানময় কোষ।

(৫) আনন্দময় কোষ।

(৬) আত্মা।

যেমন একটী থলিয়ার ভিতর আর একটী থলিয়া, তারপর আর একটী, এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে পাঁচটী থলিয়া প্রবেশ করাইলে যেমন হয়, সেইরূপ মানবের বাহ্যদেহ হইতে সূক্ষ্ম আত্মা পর্য্যন্ত উপরোক্ত পাঁচটী কোষ অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। যেমন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ স্থূলসূক্ষ্ম-রূপধারী মানবও উপরোক্ত পাঁচটী স্থূল ও সূক্ষ্ম স্তরে নির্ম্মিত হন। এই সকল স্তরের মধ্যে কেবল অন্নময় কোষটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও স্থূল এবং অপরগুলি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসাপেক্ষ।

রাজযোগমতে মানবে তিনটী উপাধি বর্ত্তমান ; যথা :—

(১) স্থূলোপাধি।

(২) সূক্ষ্মোপাধি।

(৩) কারণোপাধি।

(৪) আত্মা।

যোগিগণ যোগবলে উপরোক্ত উপাধিগুলিকে পৃথক করিতে পারেন। পরকায়প্রবেশ, অতীন্দ্রিয়দর্শন, দূরদর্শন প্রভৃতি যে সকল বাস্তব ক্রিয়া যোগীরা প্রকাশ করেন, তাহাতেই আত্মার যথার্থ অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হয়। মৈস্মর-তত্ত্ব (Mesmerism), প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) প্রভৃতি বিদ্যার ঘটনা-বলি বিজ্ঞান ব্যাখ্যান করিতে পারে না, তজ্জন্য উহাদিগকে অবিশ্বাসও করে।

এখন উপরোক্ত তিনটী মতের পরস্পর সম্বন্ধ এইরূপ ; যথা :—

তত্ত্ববিদ্যা		বেদান্ত	যোগশাস্ত্র
(১) স্থূল শরীর		অন্নময় কোষ	স্থূলোপাধি।
(২) প্রাণ		প্রাণময় কোষ	
(৩) লিঙ্গ-শরীর			
(৪) কামরূপ			
(৫) মন	ইচ্ছা, ভাব	মনোময় কোষ	সূক্ষ্মোপাধি।
	বিজ্ঞান	বিজ্ঞানময় কোষ	
(৬) বুদ্ধি		আনন্দময় কোষ	কারণোপাধি।
(৭) আত্মা		আত্মা	আত্মা।

এই সকল তত্ত্বের মধ্যে আত্মা পরমাত্মার অংশ ; ইহা নির্গুণ ও নিরু-পাধি এবং সকল বিষয়ে ইহা নির্লিপ্ত। ইহা অবিনাশী, নিত্য ও অজ ; ইহার জন্ম, মৃত্যু কিছুই নাই।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

(গীতা।)

"ইহা কদাচ জন্মগ্রহণ করে না বা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় না; ইহা হইয়া কদাচ হয় নাই বা হইবে না, অর্থাৎ ইহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই। ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ, শরীর হত্যা করিলে, ইহার হত্যা হয় না।"

আত্মা পরমাত্মার ন্যায় মায়াতীত ও গুণাতীত। আত্মা ও জীবাত্মায় অনেক প্রভেদ। যখন আত্মা দ্বিতীয় তত্ত্ব বুদ্ধির যোগে সগুণ ও সোপাধিক হয়, তখন ইহাকে পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা বলা যায়। আত্মা সর্ব্বদা বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত থাকে, কেবল নির্ব্বাণকালে ইহা পরমাত্মায় মিলিত হয়; তদ্ভিন্ন সকল অবস্থায় ইহা সোপাধিক। জীবাত্মা ইহার কর্ম্মফলবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন লোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য। সে জন্য এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে জন্মমৃত্যুরূপ যে দুইটী ঘটনা অপরিহার্য্য, তাহা আত্মা সহ্য করে না, ইহার জীবোপাধিই তাহা সহ্য করে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(গীতা)

"যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া লোকে অন্য নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ জীবাত্মাও জীর্ণ পুরাতন শরীর ত্যাগ করতঃ নূতন দেহ ধারণ করে।"

দ্বিতীয় তত্ত্বের নাম বুদ্ধি। জনসাধারণ যে বুদ্ধিকে জ্ঞানশক্তি বলে, ইহা সে বুদ্ধি নয়; ইহা মহত্তত্ত্বের অংশ। আত্মা মায়াতীত, কিন্তু বুদ্ধিরূপ ইহার অংশটুকু মায়াময়; ইহারা অনুক্ষণ একত্র থাকে বলিয়া জীবাত্মাও মায়াময়। বেদান্তে বুদ্ধি আনন্দময় কোষ বলিয়া উক্ত হয়; কারণ জীবাত্মা স্থূলদেহ হইতে মুক্ত হইলে বুদ্ধিযোগে দেবলোকে বিমল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। ইহজন্মে পুণ্যকর্ম্ম করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহাও বুদ্ধি হইতে উপজাত। যোগশাস্ত্রে বুদ্ধি কারণোপাধি বলিয়া উক্ত হয়; কারণ ইহাই জীবের অবিনশ্বর বা কারণ দেহ; তদ্ভিন্ন অন্যান্য অংশগুলি জীবের জন্য বা নশ্বর দেহ। জীবাত্মাই অবিনাশী ও অমর; তদ্ভিন্ন ইহার অন্যান্য অংশ ক্ষণবিধ্বংসী। জীবের কর্ম্মফল জীবাত্মায় সংলগ্ন হয় এবং ইহা অনন্তকালের জন্য উহার সাথের সাথী। সাধারণতঃ পাপপুণ্য হইতে যে আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহাই

জীবাত্মার কর্ম্মফল। কর্ম্মফল বশতঃ জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন লোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য। পুরুষ বা জীবাত্মাই একমাত্র সুখদুঃখের ভাগী।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহপি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু।

(গীতা)

"এই দেহরূপ অষ্টপুরে যিনি বাস করেন, তিনি জীবাত্মা বা পুরুষ। ইনি দেহনিবদ্ধ হইয়া প্রকৃতিসমুৎপন্ন গুণগুলি ভোগ করেন, অর্থাৎ মায়াজনিত সত্ত্বরজস্তম ভোগ করতঃ সুখদুঃখের ভাগী হন। ত্রিগুণের আসক্তিবশতঃ ইনি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।" জীবাত্মা আবার কি প্রকার? ইনি

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।

(গীতা)

"ইনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তা; ইনি মহেশ্বর; ইনি এই দেহে পরমাত্মাস্বরূপ। জীবাত্মা প্রকৃতি বা শরীরের ক্রিয়াগুলি উদাসীন ভাবে দেখেন; কিন্তু প্রকৃতির ক্রিয়াগুলি স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মাতেই প্রকাশিত, অতএব জীবাত্মা উহাদের উপদ্রষ্টা। ইনি আবার উহাদের অনুমন্তা বা অনুভবকারী; প্রকৃতির ক্রিয়াগুলিতে ইনি স্বয়ং অপ্রবৃত্ত হইলেও উহারা তাহাতেই সুপ্রকাশিত; সেজন্য জীবাত্মা উহাদের অনুমন্তা। ইনি সকলের ভর্ত্তা ও ভোক্তা; ইনি সকলকে ধারণ করেন ও সকল ভোগ করেন। জীবাত্মা না থাকিলে কেহই প্রকাশ পায় না এবং কেহই ভোগ করে না। ইনিই শরীরের রাজা এবং ইনিই এই শরীরের পরমাত্মাস্বরূপ পরম পুরুষ।"

অদ্বৈতবাদিদিগের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কোন প্রভেদ নাই; উভয়ে এক। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিদিগের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁহারা বলেন, যে জীবনবৃক্ষের মূলদেশ ঊর্দ্ধে স্থাপিত এবং যাহার শাখা ও প্রশাখা অধোদেশ ব্যাপ্ত, সেই বৃক্ষে দুইটী পক্ষী বিদ্যমান, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। প্রথমটী ভোক্তা এবং দ্বিতীয়টী কেবল সাক্ষীস্বরূপ। জীবাত্মা সর্ব্বজ্ঞ হইলেও যতদিন সংসারে স্থূলদেহনিবদ্ধ থাকেন, ততদিন ইনি মন ও ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার

দ্বারাই বাহ্যজগতের জ্ঞানলাভ করেন এবং দ্বন্দ্বজ সুখদুঃখের ভাগী হন। যোগিদের অষ্টসিদ্ধি জীবাত্মায় স্ফুরিত হয়। সমাধির অবস্থায় জীবাত্মার আত্মা ও বুদ্ধি এই দুই অংশ কদাচ পৃথক হয় না।

মনস্তত্ত্বটী দুই ভাগে বিভক্ত, বিজ্ঞান ও ইচ্ছা, ভাব প্রভৃতি। পরমার্থ জ্ঞান ও পাপপুণ্য জ্ঞান লইয়াই মনের বিজ্ঞানতত্ত্ব গঠিত হয়; তদ্ভিন্ন যে পার্থিব জ্ঞান আমরা বুদ্ধিযোগে উপার্জ্জন করি, তাহা ক্ষণস্থায়ী। ইহা বিজ্ঞানের অংশীভূত হয় না। বেদান্তে বিজ্ঞান বিজ্ঞানময় কোষ বলিয়া উক্ত হয়। দেহ-নাশে ইহা আত্মা ও বুদ্ধির সহিত বা জীবাত্মার সহিত মিলিত হয়। জীবের ধর্ম্মা-ধর্ম্ম, পাপপুণ্য বা কর্ম্মফল সংসারে আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানি ভোগ দ্বারা জীবাত্মার গভীরতমদেশে চিরাঙ্কিত হয়; অতএব ইহা মৃত্যুর পর জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে যায়। কখন কখন যোগেশ্বরদিগের আধ্যাত্মিকতা অধিক স্ফুরিত হওয়ায় প্রাক্তনবিজ্ঞান সহজাত হয়; তাহাতে তাঁহারা জাতিস্মর হন। কিন্তু সাধারণতঃ জীবাত্মার জড়ত্ববশতঃ বিজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় না। সে জন্য তুমি ও আমি পূর্ব্বজন্মের কথা কিছুই অবগত নহি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

> বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন
> তান্যহং বেদ সর্ব্বানি নত্বং বেত্থ পরন্তপ।

"হে অর্জ্জুন! তোমার ও আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি আমার সকল জন্ম জানি; কিন্তু তুমি তোমার সে সকল জন্ম জান না।"

ইচ্ছা ও ভাব প্রভৃতি লইয়া মনের দ্বিতীয় অংশটী গঠিত। ইহা ক্ষণভঙ্গুর এবং দেহনাশে ইহা কামরূপের সহিত মিলিত হয়। এজন্য বেদান্তে কামরূপ ও মনের দ্বিতীয় অংশ মনোময়-কোষ বলিয়া উক্ত হয়। এই দুই অংশ দেহনাশে কামলোকে মিলিত হয়। ইহাতে বোধ হয়, মানবমনের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি, ইচ্ছা ও ঐহিক ভাবগুলি দেহনাশে লয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু উহাদের সারাংশটুকু বিজ্ঞানময় কোষের সহিত মিলিত হইয়া জীবাত্মায় সংলগ্ন হয়। মনোময়-কোষ ও বিজ্ঞানময়-কোষ জীবাত্মার সূক্ষ্ম উপাধি এবং উহারা সূক্ষ্মজগতের উপাদানে নির্ম্মিত হয়। জীবের মনোময়-কোষটী জন্মানুসারে বা অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তিত হয়। যে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জীব ইহজগতে অবতীর্ণ হয়, সেই কর্ম্মফলানুসারে ইহার মনোময়-কোষটী সূক্ষ্মজগতস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক সংযো-

জিত হয়। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সনকাদি দেবগণ ও নারদাদি দেবর্ষিগণ মানবমন সৃষ্টি করেন। এ সকল কথার এক শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নাই।

লিঙ্গ-শরীর স্থূলদেহের ছায়াস্বরূপ; ইহারই আদর্শে স্থূলদেহ পার্থিব স্থূল উপাদানে গঠিত হয়। জীবদ্দশায় লিঙ্গ-শরীর, প্রাণ ও স্থূলদেহ এই তিনের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ বর্ত্তমান থাকে; দেহ জীবিত থাকিতে উহাদের সংযোগ কদাচিৎ ছিন্ন হইতে পারে না। বেদান্তে প্রাণ ও লিঙ্গ-শরীর প্রাণময়-কোষ এবং স্থূলদেহ অন্নময়-কোষ বলিয়া উক্ত হয়। প্রাণময়-কোষই জীবের জীবনীশক্তির আধার এবং উহা দ্বারাই সমস্ত স্থূলদেহ জীবিত থাকে। স্থূলদেহ অন্ন দ্বারা পালিত হয় বলিয়া ইহা জীবের অন্নময়-কোষ; যোগশাস্ত্রে লিঙ্গ-শরীর, প্রাণ ও স্থূলদেহ এই তিনটী জীবের স্থূলোপাধি; ইহারা অল্লাধিক স্থূলোপাদানে গঠিত হয়। যখন প্রাণতত্ত্ব দেহ হইতে বহির্গত হয়, তখন অন্যান্য তত্ত্বগুলি দেহ হইতে পৃথক হওয়ায়, স্থূলদেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়; ইহার পঞ্চতত্ত্ব বাহ্যজগতের পঞ্চতত্ত্বের সহিত মিলিত হয়। তৎকালে লিঙ্গ-শরীরও ক্রমশঃ স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে বিলীন হয়। স্থলবিশেষে ও অবস্থাভেদে এই লিঙ্গ-শরীর প্রাণ, কামরূপ ও মন দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আকাশে সূক্ষ্মরূপে বিচরণ করে এবং প্রেতাদিরূপে মানবের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

উপরোক্ত সপ্তবিধ তত্ত্ব একাধারে ক্রমান্বয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমিত্বজ্ঞানবিশিষ্ট জীব সংসারে উৎপন্ন। ইহার আমিত্বজ্ঞান মায়াসম্ভূত। জন্মে জন্মে জীব বিভিন্নাবস্থাপন্ন শরীরে নিবদ্ধ হইয়া নূতন নূতন আমিত্বজ্ঞান লাভ করে। এক দেহ হইতে দেহান্তরে জন্ম লইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম জীব ক্রমশঃ নিম্নলিখিত স্থান অধিকার করে, যথা—(১) সূর্য্যমণ্ডল (২) পঞ্চ মহাভূত (৩) অন্ন (৪) রক্ত (৫) রেত (৬) মাতৃগর্ভ। শেষোক্ত স্থানে ইহা ব্যক্তরূপ ধারণ করে; তদ্ভিন্ন সকল স্থানে ইহা অব্যক্তরূপেই বর্ত্তমান থাকে। যেমন বসন্তাদি ঋতু নিজ নিজ সময়ে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ জীবের কাল পূর্ণ হইলে এবং প্রাক্তনকর্ম্ম ফলোন্মুখ হইলে, ইহা ইহসংসারে বা অন্যান্য লোকে জন্মগ্রহণ করে। কর্ম্মফলানুসারে ইহা উপযুক্ত মাতৃগর্ভ লাভ করতঃ রাশিচক্রের গ্রহনক্ষত্রাদির উপযুক্ত সম্মিলন প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেহ যেন এমন ভাবেন না, যে অন্ধদৈব ইহাকে এ জগতে আনয়ন করে এবং অন্ধদৈবই

ইহার ক্ষণস্থায়ী জীবন চালনা করে। পরমাণু হইতে সুবিশাল সূর্য্য পর্য্যন্ত, কীটাণু হইতে বৃহদাকার তিমি পর্য্যন্ত এই সার্ব্বজনিক-সামঞ্জস্যপূর্ণ জগতের কোন পদার্থ উদ্দেশ্যবিহীন নহে; সকলেই কোন না কোন সুনির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমান আছে।

মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

মানব কি জন্য এ সংসারে আইসেন, তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি, কোন্ মহৎকার্য্য সম্পাদনের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এ বিষয়টী সম্যক অবধারণ করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। জগৎ অসংখ্য জাতীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ; প্রত্যেকেরই কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সকলেই প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক তদনুরূপ অবস্থায় স্থাপিত হয়। সকলেই নিজ নিজ অবস্থায় জীবন যাপন করে এবং ইহাতেই প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কোটী কোটী প্রবালকীট সমুদ্রগর্ভে একস্থলে একত্রিত হয়। উহারা জীবন যাপন করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু উহাদের কঙ্কালরাশি একত্রিত হওয়ায় বহুকাল পরে সুবিশাল প্রবালদ্বীপ নির্ম্মিত হয় এবং উহা কালক্রমে মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবের বাসভূমি হয়। প্রবালদ্বীপ নির্ম্মাণ প্রবালকীটের যে মহৎ কার্য্য, তাহা উহারা অবগত নয়। গৃধ্রকুল পূতিগন্ধযুক্ত গলিতমাংস ভক্ষণে একান্ত আসক্ত; ঐরূপ মাংস উহাদের মিষ্টান্ন বিশেষ। কত আগ্রহ ও কত তৃপ্তির সহিত উহারা গলিত-শব-মাংস ভক্ষণ করে! জগতে আসিয়া উহারা প্রকৃতির যে কি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাও উহারা অবগত নয়। উহারা জগতে মৃতদেহ-জনিত পূতিগন্ধ দূর করে। সেইরূপ জগতের প্রত্যেক জীবের ও প্রত্যেক বস্তুর কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তাহা নির্ণয় করা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে মানব বুদ্ধিশক্তিতে বিভূষিত হইয়া জ্ঞানবলে ও বিদ্যাবলে সমগ্র জগতের অধীশ্বর, যাঁহার সুখভোগের জন্য এই নন্দনকাননতুল্য পৃথিবী পরিকল্পিত, যিনি স্বজীবনে অনুক্ষণ নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত, তিনিই কি

নিজ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন ? কখন তিনি তরবারি হস্তে বা বন্দুক হস্তে অসংখ্য ভ্রাতার প্রাণনাশে ধাবমান, কখনও বা তিনি ভৈষজ্য-পুটলী লইয়া অসংখ্য ভ্রাতার শারীরিক যন্ত্রণা বিমোচনে অগ্রসর। কখন তিনি পুত্রকলত্রের জন্য নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জনার্থ তৎপর, কখনও বা তিনি স্বজাতির দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচনার্থ অকাতরে মুক্তহস্ত। কখন তিনি সরস্বতীদেবীর বরপুত্র হইবার জন্য একান্ত স্বাধ্যায়পর, কখনও বা তিনি বিদ্যা বিতরণার্থ প্রগাঢ়রূপ পরিশ্রমী। কখন তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও পর সেবায় একান্ত অনুরক্ত, কখনও বা তিনি অধর্ম্মাচরণে ও পরহিংসায় প্রবৃত্ত। এই প্রকারে তিনি জীবনে নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত হন, অথচ তিনিও জানেন না, তিনি এ জগতে আসিয়া প্রকৃতি জগতের কোন্ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করেন, বা কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করেন।

তিনি জন্মিবার পূর্ব্বে কোথায় থাকেন, পরেই বা কোথায় যান, তাহা তিনি অবগত নন; কেবল কয়েক দিবসের জন্য জলবুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত হইয়া তিনি ক্ষণকাল হাসেন ও বহুক্ষণ কাঁদেন; উদর পূরণ করিয়া তিনি বংশ রক্ষার জন্য সন্তানাদি উৎপাদন করেন, উহাদের ভরণপোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জন করেন; আর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, পরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোথায় চলিয়া যান। এই প্রকারেই তাঁহার ক্ষণবিধ্বংসী জীবন অতিবাহিত হয়। এখন সে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি ?

যাহার জন্য মানব সৃষ্ট হউন না কেন, তিনি কি নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় নিকৃষ্ট সুখভোগ করতঃ কেবলমাত্র উদর পূরণ ও বংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য এ জগতে আইসেন ? তিনি কি জ্ঞানশক্তিবলে অগাধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিদ্যাজনিত সুখভোগ করতঃ আপনার ও সমাজের আধিভৌতিক উন্নতি-সাধন করিবার জন্যই এ জগতে আইসেন ? অথবা তিনি কি ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ আত্মার কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্যই এ জগতে আইসেন ?

মানবজীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে, বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃতির কি চরম উদ্দেশ্য, তাহা একবার ভাবা উচিত। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সৃষ্টিচক্রটী আর কিছুই নয়, কেবল পরব্রহ্মের দুই ব্যক্ত অবস্থার মধ্যে সূক্ষ্মরূপ

ক্রমশঃ কলুষিত, অধোগত ও বিকৃত হইয়া স্থূলরূপে পরিণত হয়; পরে স্থূলরূপের সম্যক স্ফূর্ত্তি হইয়া উহা ক্রমশঃ সূক্ষ্মে উন্নত হয়; (অর্থাৎ) সর্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্ম জগতের সৃষ্টি হয়; এজন্য শাস্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের উৎপত্তি লিখিত আছে। বিগত কয়েক মন্বন্তরে ঐ সূক্ষ্মজগৎ অধোগত ও বিকৃত হইয়া স্থূলজগতে পরিণত হয়। এ মন্বন্তরে স্থূলজগতেরই সম্যক স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। পরে আগত মন্বন্তরে এই স্থূলজগৎ ক্রমোন্নত হইয়া আবার সূক্ষ্মে পরিণত হইবে। ইহাতে বোধ হয়, সূক্ষ্মকে ক্রমশঃ অধোগত করিয়া স্থূলে পরিণত করা এবং স্থূলের সম্যক স্ফূর্ত্তি করিয়া উহাকে ক্রমশঃ উন্নত করতঃ সূক্ষ্মে পুনঃ স্থাপন করাই প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য। এ কথাটী দুগ্ধপোষ্য মানবশিশু জড়বিজ্ঞানের কথা নয়। এ কথা ব্রহ্মার অমরপুত্র সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অমোঘ সত্য। সৃষ্টি লয় হইতে পারে, কিন্তু এ কথা কস্মিন্‌কালে লয় হইবার নয়।

প্রকৃতির এই চরম উদ্দেশ্য বা পরিণামবশতঃ সূক্ষ্ম সর্ব্বজ্ঞ জীবাত্মা এ জীবপ্রবাহে বা মন্বন্তরে স্থূলদেহে নিবদ্ধ; স্থূলদেহ সম্যক স্ফূর্ত্তি পাইয়া বিভিন্ন চর্ম্মাবরণে (Coats of skin) আবৃত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; সেই সঙ্গে জীবাত্মা ইহার প্রাকৃত ধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া মন, দেহ ও বাহ্যজগতের সহিত যেরূপ বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ ইহা শরীর ও বাহ্যজগতের আধিভৌতিক উন্নতিসাধনের জন্য, স্থূলত্বের সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য একান্ত ব্যগ্র। এ কারণ যুগধর্ম্মানুসারে মানব এখন আধিভৌতিক উন্নতিসাধনেই তৎপর। স্বয়ং প্রকৃতি যে দিকে ধাবমানা, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠজীব মানবও সেই দিকে অগ্রসর। ইহার জন্য পুরাকালীন ও আধুনিক সকল শ্রেষ্ঠজাতি সভ্যতা বর্দ্ধন করিয়া জগতের আধিভৌতিক উন্নতিসাধনে সবিশেষ প্রয়াসী। ইহার জন্য এই শ্মশান-সদৃশ পর্ব্বতজঙ্গলাকীর্ণ পৃথিবী আজ নন্দন-কাননে পরিণত। এই আধি-ভৌতিক উন্নতিসাধনের উপায়স্বরূপ জ্ঞানশক্তি মানবমনে ক্রমশঃ স্ফুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অদ্যাবধি ইহার বলে তিনি জগতের অশেষ উন্নতিসাধনে সমর্থ এবং ইহারই বলে তিনি কালক্রমে আধিভৌতিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইবেন।

যুগধর্ম্মানুসারে প্রকৃতিদত্ত গুণাগুণবশতঃ এখন আধিভৌতিক উন্নতিই

সকলের ভাল লাগে এবং যাহাতে আধ্যাত্মিকতার কিছুমাত্র গন্ধ বাষ্প আছে, তাহা প্রায় কাহারও ভাল লাগে না। এজন্য সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস, সুন্দর স্ত্রী-সম্ভোগ, সুন্দর ভোজন, সুন্দর যানারোহণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়বাসনা লোকের মনকে প্রথম আকৃষ্ট করে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মের জন্য সংসারে বৈরাগ্যাবলম্বন প্রভৃতি যে সকল পুণ্যকর্ম্মে আত্মার আধ্যাত্মিকতা কথঞ্চিৎ স্ফুরিত হয়, তাহা সচরাচর কাহারও ভাল লাগে না।

ইহসংসারে আসিয়া মানব আত্মা, মন, স্থূলদেহ, পরিবার, সমাজ ও বাহ্য-জগতের সহিত যেরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহাতে তিনি ঐ সকল বিষয়ের উন্নতি-সাধন করিতে স্বভাবতঃ বাধ্য হন। তন্মধ্যে এক আত্মা ব্যতীত সকলগুলির উন্নতিসাধনে তাঁহার আধিভৌতিক উন্নতি সাধিত হয়। অতএব যতদিন তিনি ইহসংসারে থাকেন, ততদিন তিনি নিজের আধিভৌতিক উন্নতির জন্য অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করেন। অগাধ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া নিজ মনের উন্নতিসাধন কর, প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের সুখবর্দ্ধন ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন কর, কায়িক পরিশ্রমাদি দ্বারা নিজ স্বাস্থ্যের উন্নতি কর, অথবা অর্থবলে হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেশের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন কর, সকল কাজেই তোমার আধিভৌতিক উন্নতি সম্যক প্রকাশিত হয়। এখন জনসাধারণ আধিভৌতিক উন্নতির জন্য যেরূপ ব্যগ্র, আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহারা সেরূপ ব্যগ্র নয়।

এখন অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্ম উপদেশ দেয়, মানবের মন, শরীর প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু নশ্বর এবং একমাত্র তাঁহার আত্মাই অবিনশ্বর; অতএব যাহা চিরস্থায়ী, তাহারই উন্নতিসাধন করা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং মন প্রভৃতির উন্নতিসাধন করিতে গিয়া সেই অবিনশ্বর আত্মার অবনতি-সাধন করা কদাচ উচিত নয়। এখন আধ্যাত্মিকতাই আত্মার প্রাকৃত ও স্থায়ী ধর্ম্ম এবং আধিভৌতিকত্ব ইহার অপ্রাকৃত ও অস্থায়ী ধর্ম্ম। অতএব যদ্দ্বারা আত্মার আধ্যাত্মিকতা স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা অবলম্বন করা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু যে আধিভৌতিক উন্নতি আমাদের কালোচিত ধর্ম্ম, উহার সহিত আধ্যাত্মিকতার বিস্তর বিরোধ। আধিভৌতিকত্ব যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, আধ্যাত্মিকতা সেই পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যিনি আধ্যাত্মিক

পথে যত অগ্রসর, তিনি আধিভৌতিক পথে তত পশ্চাৎপদ। যিনি রাজ্যের অধীশ্বর, তিনি মূর্ত্তিমান আধিভৌতিকত্ব; আর যিনি পরমহংস, তিনি এ জগতে মূর্ত্তিমান আধ্যাত্মিকতা। আধিভৌতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে চাও তবে কলিকাতা মহানগরী দর্শন কর; আর আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে চাও, তবে যে স্থলে একজন পরম যোগী সমাধিস্থ হইয়া দিব্যনেত্রে সকল দর্শন করেন এবং স্বর্গের দেবগণ তদুপরি পুষ্পবৃষ্টি করেন, সেইস্থলটী নিরীক্ষণ কর।

এখন জিজ্ঞাস্য, আমাদের কোন পথে গমন করা উচিত? আমরা কি আধ্যাত্মিকতা ভুলিয়া গিয়া কেবল আধিভৌতিক পথে অগ্রসর হইব, না আধিভৌতিকত্ব মিটাইয়া কেবল আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইব? আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান উপদেশ দেয়, উত্তমরূপ আহার বিহার কর, জ্ঞানবলে আপনার ও জগতের শ্রীবৃদ্ধিসাধন কর এবং সেই সঙ্গে সমাজধর্ম্ম পালন কর, ইহাই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; আর যিনি কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়ান, তিনি পাগল ও ভণ্ড, তিনি ইহজগতের প্রধান শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত। অপরদিকে হিন্দুধর্ম্ম উপদেশ দেয়, সংসার অনিত্য, জীবন ক্ষণস্থায়ী, কেন মিছে মায়ায় ভুলিয়া গিয়া আত্মার প্রধান শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হও? সংসার জাহান্নমে যাউক, পুত্র কলত্র ত্যাগ করিয়া বনের প্রান্তভাগে গমন পূর্ব্বক ঈশ্বর আরাধনা কর, তুমি সংসারের অশেষ জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, তোমার জীবাত্মা প্রকৃত শান্তিলাভ করিবে এবং তুমিও মানবজীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ করিবে। এখন কাহার উপদেশমতে আমাদের চলা উচিত? কোথায় বাহ্য সভ্যতা, কোথায় বাহ্য চাক্‌চিক্যতা, কোথায় অর্থ, কোথায় বিদ্যা, কোথায় আমোদ প্রমোদ এই করিয়াই কি আমরা জীবন অতিবাহিত করিব? না সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ও বনের একান্তে গিয়া ঈশ্বরারাধনায় মনোনিবেশ করতঃ আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য একাগ্রচিত্ত হইব এবং অনন্তকালের জন্য অনন্তপথের কিঞ্চিৎ সম্বল আয়োজন করিব? কিন্তু এ সংসারে আসিয়া আমরা যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে আধিভৌতিক উন্নতি আমাদের একপ্রকার অপরিহার্য্য। অতএব অস্থায়ী আধিভৌতিক উন্নতির মধ্যে স্থায়ী আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি করাই মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গমন করা আমাদের আদৌ কর্ত্তব্য

নয়। সংসারের অশেষ পাপতাপের মধ্যে আত্মা নানা প্রকারে পরীক্ষিত হইয়া যেরূপ শিক্ষা পায়, বনের প্রান্তভাগে কেবল মাত্র ঈশ্বরারাধনায় সেরূপ শিক্ষা পায় না। পাপের অশেষ প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া আত্মা যেরূপ ধর্ম্মবলে বলীয়ান হয় বা দুঃখের অশেষ ক্লেশরাশির মধ্যে থাকিয়া আত্মা যে সুখের পথ দেখিতে পায়, তাহাতেই ইহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি হয়। অতএব সংসারাশ্রম ত্যাগ করা কাহারও কর্ত্তব্য নয়।

যথার্থ বলিতে কি, কেহই প্রকৃতপক্ষে সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন না। যাঁহারা সন্ন্যাসী, ফকির বা অবিবাহিত পাদরি, তাঁহারা সমাজের মঙ্গলের জন্যই, ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্যই সংসারধর্ম্ম করেন না; সংসারের বিবিধ জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়া একান্তঃকরণে পরসেবায় রত হইবার জন্যই তাঁহারা ঐরূপ ব্রত অবলম্বন করেন। ঈশ্বর, আত্মা, মন, শরীর, স্বপরিবার, স্বসমাজ ও স্বদেশ, ইহাদের প্রতি মানবের যে সকল অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে দুই একটী একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা অপরগুলিতে অধিক মনোনিবেশ করেন। তাঁহারা স্বপরিবার সেবায় নিযুক্ত হন না বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বদেশ, স্বসমাজ ও ঈশ্বরের সেবা করেন।

সংসারে মানব যে অবস্থায় অবস্থিত হউন না কেন, আত্মা, মন, দেহ, পরিবার ও স্বদেশ লইয়া তিনি কতকগুলি কর্ত্তব্যকর্ম্মে আবদ্ধ আছেন। এই সকল কর্ত্তব্যপালনই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিজ আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে তিনি যেমন বাধ্য, বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বা বিবিধ বিষয় দর্শন ও মনন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা মনের মানসিক উন্নতি করিতে তিনি তেমনি বাধ্য। শারীরিক নিয়ম পালন করিয়া শরীরের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করিতে তিনি যেমন বাধ্য, অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে তেমনি বাধ্য। বিবিধ সৎকর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিয়া নিজের বংশোজ্জ্বল করিতে তিনি যেমন বাধ্য, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে তিনি তেমনি বাধ্য। এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের সমষ্টিই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতেই তাঁহার প্রকৃত আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়।

এখন এই সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে একমাত্র ধর্ম্মই তাঁহার প্রধান সহায়। ধর্ম্মের উপদেশমতে চলিলেই, তিনি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ভালরূপ সাধন করেন। এ সকল বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা উপদেশ দেয়, তাহাই পালন করিলে তিনি প্রকৃত শ্রেয়োলাভ করেন। ইহাতেই তাঁহার প্রকৃত শান্তি, ইহাতেই তাঁহার প্রকৃত সুখ। তদ্ভিন্ন তিনি যে পথে গমন করেন, সেই পথই তাঁহার নিকট কণ্টকাকীর্ণ ও ক্লেশদায়ক। যদি তিনি ধর্ম্মের উপদেশ অগ্রাহ্য করতঃ কেবল আধিভৌতিক উন্নতিসাধনের জন্য তৎপর হন, তিনি অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে, নিজভ্রাতৃতুল্য মানবের বক্ষঃদেশে পদার্পণ পূর্ব্বক তদীয় শ্মশ্রুদেশ উৎপাটন করিতে কোনমতে সঙ্কুচিত হন না। কিন্তু ইহাতে তিনি আত্মনাশের পথ প্রস্তুত করেন; অধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিলেই তাঁহাকে পড়িতে হয়। যে জাতি বা যে ব্যক্তি যতই কেন প্রবলপ্রতাপান্বিত হউক না, অধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিলেই, উহার পতন সন্নিকট। অতএব সংসারে পাপপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদা ধর্ম্মপথে বিচরণ কর ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। দিবা-রাত্র হরিনাম কীর্ত্তন কর। শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে হরিনাম স্মরণ করতঃ সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন কর, তুমি চিরদিন ধর্ম্মপথের পথিক হইবে এবং নিজ জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

আধিভৌতিক উন্নতির পথে নানা বিঘ্ন ও নানা প্রত্যবায় আছে। যিনি যতই কেন যোদ্যম ও স্বাবলম্বন দ্বারা নিজ অবস্থার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে চেষ্টা পান না, ইহা তাঁহার স্বায়ত্ত নহে; ইহা তাঁহার অদৃষ্টসাপেক্ষ বা কর্ম্মফল-সাপেক্ষ। সংসারের ঘটনাস্রোতে তিনি যেরূপে বাহ্যমান হন, তাঁহার ভাগ্যলিপিও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রত্যেক মানবের সম্পূর্ণরূপ স্বায়ত্ত। তিনি যে পরিমাণে শাস্ত্রাদেশ পালন করতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তিনি ততই আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করেন ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন। অতএব সংসারে ধনবান হও বা নির্ধন হও, গণ্যমান্য হও বা নগণ্য হও, সদা ধর্ম্মাচরণে তৎপর হও, সদা ঈশ্বরাদেশ বা শাস্ত্রাদেশ পালন কর, ইহাতেই তোমার দুর্লভ মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সাধন হইবে। দুরদৃষ্ট বশতঃ তুমি সংসারে যতই নির্ধন হও না কেন, ধর্ম্মাচরণে তোমার ততই শান্তিলাভ ও ততই সন্তোষলাভ হইবে। তুমি সংসারের বিবিধ

তাড়নায় যতই প্রপীড়িত হও না কেন, ইহার বিবিধ জ্বালা যন্ত্রণায় যতই অস্থির হও না কেন, ধর্ম্মামৃতপানে ও হরিনামের মাহাত্ম্যে তুমি ততই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে এবং তোমার জীবাত্মাও অনন্ত উন্নতির পথে ততই অগ্রসর হইবে।

আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি করাই মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য এবং যে আধিভৌতিক উন্নতিসাধনে আমরা প্রকৃতিকর্ত্তৃক প্রণোদিত হই, তাহা ইহার গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। এখন এই উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা উচিত। বল দেখি, এ ধর্ম্ম প্রবৃত্তিমার্গে শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে তোমার সকল কর্ম্মে নিজ অনুশাসন চালাইয়া এবং নিবৃত্তিমার্গে নানাবিধ ক্রিয়াযোগ উপদেশ দিয়া তোমার আধ্যাত্মিকতার যেরূপ স্ফূর্ত্তি করিতে চেষ্টা পায়, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়? আধিভৌতিক উন্নতি সাধনের জন্য শাস্ত্র ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্বর্গফলের মধ্যে কেবল অর্থ ও কাম এবং চতুরাশ্রমের মধ্যে একমাত্র গৃহস্থাশ্রম উপদেশ দেয়; আর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য ইহা চতুর্বর্গ ফলের মধ্যে ধর্ম্ম ও মোক্ষ এবং চতুরাশ্রমের মধ্যে প্রথমাশ্রম ও শেষোক্ত দুইটী আশ্রম উপদেশ দেয়। ইহারই গুণে হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিকতা এ কলিকালেও এত অধিক স্ফুরিত হইয়াছে। ইহারই জন্য যুগধর্ম্মানুসারে যে আধিভৌতিকত্ব অধিক বর্দ্ধিষ্ণু, ইহাকে সঙ্কুচিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম তৎপরিবর্ত্তে জীবাত্মার প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা স্ফূর্ত্তি করিতে এত চেষ্টা পায়। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যা মানবের আধ্যাত্মিকতা সঙ্কুচিত করিয়া তাঁহার আধিভৌতিক উন্নতিসাধনের জন্য একান্ত তৎপর। ইহারই গুণে সভ্যজাতিমাত্রেই আজকাল অপর জাতির বক্ষঃস্থলে উপবেশনপূর্ব্বক উহার শ্মশ্রুদেশ উৎপাটনে এত ব্যগ্র। আজকাল এদেশের অধিকাংশ লোক পাশ্চাত্যশিক্ষায় সুশিক্ষিত; সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে একমাত্র আধিভৌতিক উন্নতির প্রার্থী এবং শাস্ত্রোক্ত আধ্যাত্মিকতা উড়াইয়া দেন। কিন্তু আধিভৌতিক উন্নতির মধ্যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি করাই মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

পরলোক ।

যে মানবের জীবন জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, এই আছে ত এই নাই, সে মানব মৃত্যুর পর কোথায় যান, শরীরনাশের সহিত তাঁহার অস্তিত্ব কি একেবারে নাশপ্রাপ্ত হয়, না তিনি কি কোন অদৃশ্যলোকে বর্ত্তমান থাকেন, এই রহস্যটী জানিবার জন্য তিনি চিরদিনই একান্ত ব্যগ্র। কিন্তু এখন তিনি যে অবস্থায় অবস্থিত, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা যে পরিমাণে অপগত, তাহাতে তিনি উপরোক্ত রহস্য মীমাংসা করিতে আদৌ সমর্থ নন। এখন তিনি এই পর্য্যন্ত জানেন—

"That undiscovered land from whose bourne no traveller ever returns." "সেই অনাবিষ্কৃত দেশ যাহার প্রান্তসীমা হইতে কোন পথিক কখন প্রত্যাগমন করে না।" এখন মানবধর্ম্ম সকল দেশে পরলোকে বিশ্বাস করাইয়া তাহার এই চিররহস্যটী মীমাংসা করিয়া দেয়। এ জন্য পরলোকে বিশ্বাস আজকাল প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। ঈশ্বরে বিশ্বাসের ন্যায়, ইহা এখন সকল ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। কেবল প্রত্যক্ষবাদী ও জড়বাদী নাস্তিকগণ পরলোকে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, যে সুখভোগ করিবার জন্য মানব সদা লালায়িত এবং যাহা তিনি ইহজীবনে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোগ করিতে পান না, সেই নির্ম্মল পবিত্র সুখ নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করিবার জন্য তিনি আশার স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সকল দেশে ও সকল সময়ে পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বস্তুতঃ পরলোক যে কোথায়, তাহা কেহ দেখে নাই বা দেখিবে না। তবে কেন আমরা পরলোক স্বীকার করি ?

এই প্রকারে জড়বাদী বিজ্ঞান পরলোক উড়াইয়া দেয়। যে বিজ্ঞান আত্মা, ঈশ্বর কিছুই মানে না, সে বিজ্ঞান কি প্রকারে পরলোক মানিতে পারে ? প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) পরলোকসম্বন্ধে যে সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়, তাহাও বিজ্ঞান উড়াইয়া দেয়। বিজ্ঞান এই পর্য্যন্ত জানে—

Imperious Cæsar, dead and turned to clay,
Shall patch a wall to keep the winter away.

Shakespeare.

"পরাক্রান্ত সম্রাট সীজর মৃত্যুর পর কর্দ্দমে পরিণত হয় এবং হিমনিবারণার্থ প্রাচীরে লেপনস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।" কিন্তু বিজ্ঞান জানে না, যে ব্যক্তি পথের ভিখারী, সে ব্যক্তির আত্মাও অনন্তকালে অনন্ত উন্নতি করে এবং পরিশেষে দেবতায় পরিণত হয়।

বিজ্ঞানের মতে যেমন জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে মানবের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে না, তিনি চিরান্ধকারে আবৃত থাকেন; সেইরূপ মৃত্যুর পরও তাঁহার কোনরূপ অস্তিত্ব থাকিবে না এবং তিনি চিরকালের জন্য পুনরায় অন্ধকারে আবৃত হইবেন; কেবলমাত্র দিন কয়েকের জন্য জগতের পরমাণুপুঞ্জ প্রাকৃতিক নিয়মে একত্রিত হইয়া চৈতন্যবিশিষ্ট জীব উৎপাদন করতঃ তাঁহাকে সুখ-দুঃখের ভাগী করে। যেমন অন্যান্য জীবজন্তু সংসারে জন্ম লয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ মানবও সংসারে জন্ম লন ও মৃত্যুমুখে পতিত হন; যেমন উহারা মৃত্যুর পর একেবারে লয় প্রাপ্ত হয়, তিনিও সেইরূপ মৃত্যুর পর চিরদিনের জন্য লয় প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানের মতে কেবল ভ্রান্ত দর্শন ও ভ্রান্ত ধর্ম্ম এতকাল এই সকল অলীক মতামত জগতে প্রচার করিয়া রাখিয়াছে এবং নির্ব্বোধ মানবও উহাদের ভ্রান্ত মত গ্রহণপূর্ব্বক আপনার দুর্ব্বল মনকে অনেক সময়ে সান্ত্বনা করিয়া থাকেন মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে বিজ্ঞান আমাদের অনন্তকালের আশা একেবারে নির্ম্মূল করে, উহার কথাই কি অমোঘ সত্য? বস্তুতঃ কেবল মরিবার জন্যই কি আমরা এ জগতে আগমন করি? আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম, আমাদের সুখদুঃখ সকলই কি একমাত্র মৃত্যুতে পর্য্যবসিত? ক্ষণবিধ্বংসী আধিভৌতিক উন্নতিই কি মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য? জড়বাদী জড়বিজ্ঞান যাহাই বলুক না কেন, উহার কথায় কর্ণপাত করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। যে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থ ব্যতীত অন্য সূক্ষ্ম পদার্থ আদৌ বুঝিতে পারে না, সে বিজ্ঞান কি প্রকারে ইন্দ্রিয়াতীত পরলোকের বিষয় জানিতে পারে? তবে কেন লোকে উহার কথায় বিশ্বাস করে? উহার কথায় কর্ণপাত না করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। আর যদি উহার কথাপ্রমাণ তোমার মনে এরূপ ধারণা হয়, যে আত্মাও নাই, পরলোকও নাই, এ জগতই সর্ব্বস্ব, মৃত্যু হইলে ধূলার শরীর ধূলায় মিশ্রিত হয় ও সব ফুরাইয়া যায়, তুমিই স্বীয় অবিনশ্বর আত্মার সমূল ধ্বংস করিয়া

কেল এবং এই সকল নাস্তিক বাদ প্রচার করতঃ সমগ্র মানবসমাজের সর্ব্ব-নাশ করিতে উদ্যত হও। যে সকল বিশ্বাস দ্বারা মানবসমাজ এত উপকৃত এবং যদ্দ্বারা ইহা এতদিন ধর্ম্মপথে এত অগ্রসর, সে সকল বিশ্বাস কি সমাজে কদাচ নির্ম্মূল করা উচিত ?

পরলোকের অস্তিত্ব লইয়া বিজ্ঞান ও মানবধর্ম্মে ঘোরতর বিবাদ দেখা যায় ; কিন্তু পরলোক কি প্রকার, উহাতে প্রেতাত্মা কিরূপ ভাবে বর্ত্তমান থাকে, তাহা লইয়া প্রত্যেক ধর্ম্মে বিস্তর মতভেদ আছে। যে সমাজের যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, সে সমাজ পরলোক সম্বন্ধে সেইরূপ মতামত প্রচার করে। কিন্তু দেখা যায়, সকল দেশেই মানবধর্ম্ম পরকালে প্রেতাত্মার মঙ্গলের জন্য কতকগুলি অবশ্যপ্রতিপাল্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপদেশ দেয় এবং জনসাধারণও সেই সকল অনুষ্ঠান অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পালন করে।

ইহা মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ, যে জাতির যেরূপ অভিরুচি, সে জাতি পরলোক সম্বন্ধে সেইরূপ কল্পনা করে। অসভ্য শীকারপ্রিয় মানব মৃত লোককে অস্ত্রশস্ত্রের সহিত কবর দিয়া ভাবেন, পরলোকে পুনরায় ঐ ব্যক্তি শীকারা-দিতে ব্যাপৃত হন। অর্দ্ধসভ্য কামাসক্ত মুসলমান ভাবেন, পরলোকে প্রেতাত্মা স্বর্গের পরীদের সহিত বিবিধ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। সুসভ্য কৃতবিদ্য প্রেততত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভাবেন, প্রেতাত্মা স্বর্গের ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে অশেষ জ্ঞানোন্নতি করতঃ অপার আনন্দভোগ করে। ধর্ম্মাত্মা একেশ্বরবাদী ভাবেন, পরলোকে প্রেতাত্মা অনন্তকাল ঈশ্বরারাধনায় ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। এইরূপ পরলোক সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত জগতে প্রচলিত আছে।

খ্রীষ্টধর্ম্ম উপদেশ দেয়, প্রলয়ের পর প্রধান বিচার দিবসে স্বর্গের বাদ্যধ্বনি শ্রবণে প্রেতাত্মাগণ কবর হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বর সন্নিধানে উপস্থিত হইবে এবং ইহজন্মকৃত পাপপুণ্যের হিসাব দিবে। তৎকালে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র ঈষা খৃষ্টানদিগের জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ করিলে, উহারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং পুণ্যের জন্য স্বর্গসুখ ভোগ করিবে ; কিন্তু পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতি ঈষা ভজনা করে নাই বলিয়া নিরয়গামী হইবে। সেইরূপ মুসলমান ধর্ম্মও এক মুসলমান ব্যতীত অপর জাতিদিগকে নিরয়গামী করে।

খ্রীষ্টধর্ম্মের মতে এ সংসার কেবল পরীক্ষা-ক্ষেত্র। মানব স্বাধীন ইচ্ছায়

বিভূষিত হওয়ায় তিনি নিজকৃত পাপপুণ্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ দায়ী। ইহার মতে প্রত্যেক মানবে নূতন নূতন জীবাত্মা সৃষ্ট হয় এবং এই ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনের পাপপুণ্যের জন্য জীবাত্মা অনন্তকাল সুখদুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য। শেষোক্ত দুইটী মত কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। পৃথিবীতে প্রত্যহ লক্ষ মানব জন্মগ্রহণ করে এবং লক্ষ মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়; সকলেই যে নূতন নূতন জীবাত্মা লইয়া ইহসংসারে আইসে, ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য? অথবা যে ভ্রান্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম উপদেশ দেয়, ছয় সহস্র বৎসর হইল পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে এবং দুই সহস্র বৎসর পরে ইহার প্রলয় অবশ্যম্ভাবী, উহার পক্ষে ঐরূপ অসঙ্গত কথার উল্লেখ বিচিত্র নয়।

পরলোক সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের মতামতগুলি একান্ত উদার ও যুক্তিসঙ্গত। যেমন এ ধর্ম্ম লোকের সুবিধার জন্য মায়াতীত পরব্রহ্মের নানা মায়াময় মূর্ত্তি দেখায় এবং তাঁহার আরাধনার জন্য নানা প্রকার পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করে, সেইরূপ পরলোক সম্বন্ধে ইহা নানা উৎকৃষ্ট মত প্রচার করে। লোকের বুদ্ধিশক্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যেরূপ স্ফুরিত ও বিকশিত হয়, তাহারা তদনুযায়ী কোন না কোন মত অবলম্বন করিয়া এই তরঙ্গময় ভবসাগর সুখে পার হইতে চেষ্টা করে। অশিক্ষিত জনসাধারণকে ধর্ম্মপথে চালিত করিবার জন্য এ ধর্ম্মও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় নরকের ভীষণ দৃশ্য ও স্বর্গের রমণীয় দৃশ্য দেখায়; এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে পাপপথ হইতে অধিক পরিমাণে বিনিবৃত্ত করিবার জন্য এ ধর্ম্ম আবার নিকৃষ্ট যোনিভ্রমণ উপদেশ দেয়; অথচ যোগেশ্বরদিগের দিব্যচক্ষে পরলোক-সম্বন্ধে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাও ইহা ভালরূপ নির্দ্দেশ করে।

এখন সে সকল কথা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে জীবাত্মা (Incarnating monad) যে অবিনশ্বর, তদ্বিষয়ে কিরূপ প্রমাণ দেওয়া যায়, তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। প্রকৃতি-পুস্তক অধ্যয়ন করিলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, যে এ জগতে কোন বস্তুর যথার্থ বিনাশ নাই; অবস্থাভেদে সকল বস্তুর পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু যে সকল পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা উহারা নির্ম্মিত, তাহাদের বিনাশ নাই অথবা যে সকল ভৌতিকশক্তি দ্বারা উহারা অনুক্ষণ চালিত, তাঁহাদেরও বিনাশ নাই। একখণ্ড প্রদীপ্যমান বাতি দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হয়। এস্থলে ইহার বিনাশ হয় না; কিন্তু ইহার পরমাণুপুঞ্জ

অর্থাৎ যে সকল অঙ্গার ও উদ্‌জান পরমাণু দ্বারা ইহা নির্ম্মিত, সেই সকল পরমাণু বায়ুর অম্লজান সংযোগে জলীয় বাষ্প ও কার্‌বণিক এসিড্ গ্যাসে পরিণত হইয়া বায়ুরাশিতে বিলীন হয়। সেইরূপ জীবদেহ মৃত হইলে, উহার জটিল জৈবনিক পদার্থের অঙ্গার, উদ্‌জান ও যবক্ষারজানের পরমাণুপুঞ্জ বায়ুর অম্লজান যোগে জলীয়বাষ্প, কার্‌বনিক এসিড্ গ্যাস ও এমোনিয়ায় পরিণত হয়; এস্থলে উহাদের নাশ হয় না, রূপান্তর হয় মাত্র। জড়জগতের ভৌতিক পদার্থমাত্রেরই নাশ নাই। সেইরূপ সূক্ষ্মজগতের সূক্ষ্ম-পদার্থেরও কোনরূপ নাশ নাই। যে দৃশ্য একবার স্বচক্ষে দর্শন করা যায়, উহা মস্তিষ্কের স্নায়বীয় আকাশে অঙ্কিত হওয়ায় চিরদিন স্মৃতিপথে উদিত হয়। যে ভাবনা বা চিন্তারাশি মানবমনে এক সময় উত্থিত ও পরক্ষণে অস্তহৃত হয়, উহারও বিনাশ নাই; উহা আকাশপটে অঙ্কিত হয় এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানবিশিষ্ট মহাত্মাদিগের দিব্যচক্ষে প্রতিভাত হয়। সূক্ষ্মজগতের যে সকল সূক্ষ্ম উপাদানে সূক্ষ্ম মানবমন গঠিত হয়, প্রাণনাশে মানবমন নষ্ট হইয়া গেলেও উহার সূক্ষ্ম উপাদানগুলির নাশ হয় না। যখন জড়জগতের ভৌতিক পদার্থের নাশ নাই এবং সূক্ষ্মজগতের সূক্ষ্ম উপাদানেরও নাশ নাই, তখন যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাত্মা জড়দেহ ও সূক্ষ্ম মনের রাজা, উহার নাশ কি প্রকারে সম্ভব? সত্য বটে, জন্মে জন্মে উহার আমিত্বজ্ঞান পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু উহা যে এই অখিল সংসারে অবিনশ্বর ও অপরিবর্ত্তনশীল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে অবিনশ্বর জীবাত্মা জীবদ্দশায় জড়দেহে নিবদ্ধ, দেহনাশের পর উহা কোথায় যায় বা কোথায় থাকে? কেহ বলেন, মৃত্যুর পর উহা পুণ্য ভোগের জন্য স্বর্গে গমন করে; কেহ বলেন, পাপের শাস্তিভোগের জন্য উহা নরকে যায়। তবে স্বর্গ ও নরক কোথায়? সকল দেশের জনসাধারণ স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং সকল দেশের কবিগণ উহাদের যেরূপ বর্ণন করেন, তাহাই তাহারা মানিয়া লয়। তাহাদের নিকট স্বর্গ অনন্ত সুখের আলয় এবং নরক অনন্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের স্থান। স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে মানব এতকাল যেরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহাই কি অখণ্ডনীয় সত্য? কেহ কেহ বলেন, দেহনাশে ইন্দ্রিয়াদি নষ্ট হওয়ায় জীবাত্মা কি প্রকারে সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে? অতএব স্বর্গ

ও নরক কবির কল্পনা মাত্র এবং জীবদ্দশায় মানবমন পুণ্যকর্ম্ম করিয়া যে স্বর্গোপম সুখ অনুভব করে অথবা পাপ কর্ম্ম করিয়া যে নরকোপম যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহাই মানবের স্বর্গ ও নরক; তদ্ভিন্ন উহাদের অন্যরূপ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আবার কেহ কেহ বলেন, জীবাত্মাই যাবতীয় সুখদুঃখের একমাত্র ভোক্তা; ইন্দ্রিয়াদি থাকুক বা না থাকুক, পুণ্যকর্ম্ম করায় জীবাত্মা পরলোকে যে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, তাহাই ইহার নিকট স্বর্গলাভ এবং পাপ-কর্ম্ম করায় ইহা পরলোকে যে অশেষ যন্ত্রণারাশি ভোগ করে, তাহাই ইহার নরকভোগ। যাহা হউক, স্বর্গ ও নরকসম্বন্ধে যে ধর্ম্ম যেরূপ উপদেশ দেয় তদ্‌ধর্ম্মাবলম্বিদিগের নিকট তাহাই অন্ধ-বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা উচিত। মানব নিজ সান্তবুদ্ধিশক্তি দ্বারা এ বিষয়টী মীমাংসা করিতে পারেন না।

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম পরজন্মে বিশ্বাস করে; আর খ্রীষ্ট ও মুসলমানধর্ম্ম তাহাতে আদৌ বিশ্বাস করে না। সকল হিন্দুশাস্ত্রেই পরজন্মের কথা সবিশেষ উল্লিখিত আছে।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

(গীতা)

"যাঁহারা জন্ম লন, তাঁহাদের মৃত্যু নিশ্চয়; আর যাঁহারা মৃত হন, তাঁহাদের পুনর্জ্জন্মও নিশ্চয়।"

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ।

(গীতা)

"বহু জন্মলাভের পর প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত বাসুদেবময় ভাবিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন; কিন্তু এরূপ মহাত্মা সংসারে অতি দুর্লভ।

হিন্দু ও বৌদ্ধ অধ্যাত্মবিজ্ঞানোক্ত কর্ম্মফলের প্রাধান্য স্বীকার করেন বলিয়া জীবাত্মার পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করিতে বাধ্য; আর একেশ্বরবাদি-গণ স্বাধীন ইচ্ছার প্রাধান্য স্বীকার করেন বলিয়া তাহাতে অবিশ্বাস করেন। তাঁহারা ভাবেন, যদি এই পাপতাপপূর্ণ সংসারের জ্বালা ও যন্ত্রণা জীবাত্মাকে পুনঃপুনঃ ভোগ করিতে হয়, তবে ইহার শান্তি ও উন্নতি কোথায়? অত-এব তাঁহাদের মতে ইহজন্মকৃত পাপপুণ্যের জন্যই জীবাত্মা অনন্তকাল সুখদুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য।

এখন দেখা যাউক, জীবাত্মার পুনর্জন্মগ্রহণ কতদূর সম্ভব ? এ সংসারে সকলই চক্রাকারে বা মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণশীল। জীবনের সুখদুঃখ বল, দিবারাত্রি বল, ষড়ঋতু বল, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রগণ বল, সকলই চক্রবৎ পরিভ্রমণ করে। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর পুনরায় দিন আইসে। যে বারিবিন্দু আজ সমুদ্রে মিলিত, কল্য সূর্য্যরশ্মিকর্ত্তৃক শোষিত হইয়া ইহা আকাশে মেঘরূপে বর্ত্তমান হয় ; পুনরায় ইহা সলিলাবস্থায় পতিত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে। যে ধূমকেতু আজ আকাশে উদিত, তাহা কিছুকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া পুনরায় আকাশে দেখা দেয়। যে সৌরশক্তি অব্যক্তাবস্থায় আজ উদ্ভিজ্জদেহে নিহিত, কল্য উহা জীবদেহে ব্যক্তাবস্থায় প্রকটিত হয় এবং পুনরায় দেহনাশে সূর্য্যরশ্মিতে মিলিত হয়। সেইরূপ যে জীবাত্মা আজ দেহবদ্ধ হইয়া সংসারে অবতীর্ণ, দেহনাশে অল্পাধিক কালের পর পুনরায় তাহা দেহবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়।

বাসনা দ্বারা কর্ম্মবন্ধে জড়িত হইয়া জীবাত্মা ইহলোকে বা অন্যান্য লোকে বিচরণ করে। যে লোকে ইহা যে দেহ ধারণ করে,তাহা ইহার কর্ম্মদেহ মাত্র ; কেবল কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই ইহার সেই দেহ ধারণ। যেমন জপমালার এক একটী গুটিকা সূত্র দ্বারা আবদ্ধ, সেইরূপ এক জীবাত্মাই ভিন্ন ভিন্ন লোকে বা জন্মে বিভিন্ন আমিত্বজ্ঞানবিশিষ্ট হইলেও কর্ম্মবন্ধরূপ এক দুশ্ছেদ্য সূত্রদ্বারা নিবদ্ধ। এই কর্ম্ম বন্ধনবশতঃ ইহার এত জন্মপরিগ্রহ, এত সুখদুঃখলাভ, এত উন্নতি ও অবনতি। ভ্রান্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম যাহাই বলুক না কেন, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জীবাত্মাই যে কর্ম্মফলবশতঃ ইহসংসারে বা অন্যান্য লোকে পুনঃপুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে এবং ইহার কর্ম্মফল যে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অবিনাশী সত্য, তদ্-বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যেমন মানবগণ দিবাভাগে নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত ও নিশাগমে বিশ্রামসুখ-ভোগে রত হয়, পুনরায় প্রভাত হইলে তাঁহারা আবার নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত হয় ; সেইরূপ যে জীবাত্মা দেহনিবদ্ধ হইয়া ইহসংসারে প্রাক্তনকর্ম্মফল ভোগ করে, সেই জীবাত্মা মৃত্যুর পর অল্পাধিক কাল দেবলোকে বিশ্রামসুখ ভোগ করতঃ ইহজন্মকৃত কর্ম্মফল ভোগের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

'তে তংভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে-পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।

"তাঁহারা বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্য-লোকে প্রবেশ করে।"

এখন জীবাত্মা মৃত্যুর পর ও পুনর্জন্ম লইবার পূর্ব্বে দেবলোকে কিরূপ শান্তিসুখ ভোগ করে? তথায় কি ইহা কেবল ঈশ্বরারাধনা করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, না অশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হয়? এ সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখ দ্বন্দ্বজ ও মায়াজনিত; দুঃখ ব্যতীত কদাচ সুখভোগ করা যায় না; অতএব ঐহিক সুখেও আমাদের প্রকৃত স্বস্তি ও শান্তি নাই। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় যখন আমরা অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকি, সেই অবস্থায়ই আমাদের প্রকৃত শান্তির সময়। প্রকৃত শান্তি যাহাকে বলে, তাহা আমরা গাঢ়নিদ্রাবস্থায় ভোগ করি। অতএব এরূপ অনুমান করা উচিত, মৃত্যুর পর দেবলোকে যখন জীবাত্মা দেহ, লিঙ্গশরীর ও মন হইতে বিচ্যুত হইয়া আমিত্বজ্ঞান ভুলিয়া যায়, তখন ইহা সুষুপ্তি অপেক্ষা শতগুণ শান্তিসুখ ভোগ করে; আবার যেমন নিদ্রাবস্থায় নানাবিধ সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন মানবমনকে সুখদুঃখের ভাগী করে, সেইরূপ বোধ হয় দেবলোকেও জীবাত্মা নিজকৃত পাপপুণ্যের জন্য শতগুণ আধ্যাত্মিক সুখদুঃখ ভোগ করে। কিন্তু সে সকল সুখদুঃখ কিরূপ, তাহা অনুমান করা দেহধারী মানবের সাধ্যাতীত। বোধ হয়, যোগীগণ সমাধির অবস্থায় যেরূপ বিমল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মাদিগের জীবাত্মা সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে এবং পাপাত্মাদিগের জীবাত্মা কেবল অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়।

জরায়ুজীবন ও পার্থিবজীবনে যেরূপ প্রভেদ, ইহলোকে ও পরলোকে সেইরূপ প্রভেদ। মানবভ্রূণ যতদিন জরায়ুগর্ভে অবস্থিত থাকে, ততদিন ইহা পৃথিবীর বিষয় ভাবিতে সম্পূর্ণ অক্ষম; কারণ ইহার সে মন এখনও স্ফুরিত হয় নাই। সেইরূপ মর্ত্ত্যের লোকেরা স্বর্গলোকের বিষয় ভাবিতে সম্পূর্ণ অক্ষম; তাহাদের সে বুদ্ধি নাই, সে ইন্দ্রিয় নাই, যদ্দ্বারা উহার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অতএব পরলোক কোথায়, উহার অবস্থা কিরূপ, তাহা আমরা আদৌ অবগত নহি। অসভ্য মানব পরলোক বা স্বর্গ মেঘের অন্তরালে অবস্থিত মনে করিয়া নিজ অবোধ মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে; কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত জানি, যে পরলোক, স্বর্গ, বা

দেবলোক সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াতীত। আমরা মানবদেহ ধারণ করিয়া কস্মিন কালে উহার বিষয় অবগত হইতে পারিব না; কেবল মৃত্যুরূপ দ্বার দিয়া গমন করিলে উহার ভিতর প্রবেশ করা যায় ও উহার বিষয় অবগত হওয়া যায়। ইহলোক হইতে পরলোকের বিষয় অবগত হওয়া সকলের পক্ষে সমান অসাধ্য। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র পরলোক সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশ্বাসকে যে পথে চালিত করে, সকলের সেইপথে যাওয়া কর্ত্তব্য। মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রোক্ত কথা মানাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য।

এইরূপে দেবলোকে শান্তিসুখ ভোগ করিতে করিতে জীবাত্মার কতকাল ব্যতীত হয়, তাহাও অসম্পূর্ণ মানব অবগত নন। কিন্তু যখন ইহার কর্ম্মফল কালক্রমে পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তখনই ইহা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যে লোকে ও যে অবস্থায় পতিত হইলে কর্ম্মদেবী ইহার কর্ম্মফল সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলতার সহিত বিতরণ করিবেন, ইহা সেইলোকে ও সেই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এখন সেই লোক এই পৃথিবী, কি অন্য কোন নক্ষত্রলোক বা গ্রহলোক, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। যেমন লাজভর্জ্জনকালে যে সকল ধান্য বীজ উপযুক্ত উত্তাপ পায়, তাঁহারাই লাজরূপে স্ফুরিত হয়, আর যাহারা উপযুক্ত উত্তাপ পায় না, তাহারা ধান্যাবস্থায় থাকিয়া যায়; সেইরূপ যে সকল জীবাত্মার কর্ম্ম যে সময়ে ফলোন্মুখ হয়, সেই সময়ে উহারা কোন না কোন লোকে অবতীর্ণ হয়। এখন পরলোক আমাদের নিকট যেরূপ অজ্ঞেয়, কর্ম্মফলও সেইরূপ অজ্ঞেয়। এ সকল বিষয় ভাবাই আমাদের বিড়ম্বনা মাত্র।

এ স্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি জীবাত্মা ইহজগতে বা এইপ্রকার পাপতাপপূর্ণ লোকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে, তবে ইহার উন্নতি কোথায়, কোথায় বা ইহার শান্তি? ইহসংসারের কষ্টরাশি দেখিয়া কোন্ ধর্ম্মাত্মা এমন আশা করেন, যেন তিনি মৃত্যুর পর পুনরায় এখানে আইসেন? দয়াময় ঈশ্বর না হয় একবার পরীক্ষার জন্য এ জগতে পাঠান; তাঁহার দয়ার রাজ্যে এত যন্ত্রণা ও এত কষ্ট দিবার জন্য তিনি কি আমাদিগকে পুনঃপুনঃ এখানে পাঠাইবেন? পরমপিতা পরমেশ্বরকে সর্ব্বদয়াময় ও

সর্ব্বমঙ্গলময় ভাবিলে জীবাত্মার পুনর্জ্জন্মে কি বিশ্বাস করা যায়? সুকুমারমতি বালকবালিকাগণই ঐরূপ ভাবিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন যাঁহারা প্রকৃততত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা বলেন, এইপ্রকারে জীবাত্মা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মায়াজগতের মায়াজ্ঞানলাভ ও মায়াসুখদুঃখ ভোগকরতঃ ক্রমশঃ উন্নতি-সোপানে আরূঢ় হয়। এই প্রকারে ইহা কোটী কোটী বৎসরে যুগযুগান্তরে ও কল্পকল্পান্তরে অশেষ উন্নতিলাভ করতঃ দেবতায় পরিণত হয়। তৎকালে ইহা দেবতাদিগের ন্যায় পরব্রহ্মের প্রতিনিধিস্বরূপ মায়াজগৎ অনুশাসন করে। ইহাই সর্ব্বজ্ঞ অনন্তক্ষমতাবিশিষ্ট জীবাত্মার চরমোৎকর্ষ। ইহাই মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা। বিজ্ঞানোপদিষ্ট এ জগতের ক্ষণস্থায়ী আধি-ভৌতিক উন্নতিলাভই অবিনশ্বর জীবাত্মার চরম উদ্দেশ্য নয়। অতএব মনে স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখ, জীবাত্মার ভবিষ্যৎ অনন্তকালব্যাপী; এই অনন্তকালে ইহা অনন্ত জ্ঞানোপার্জ্জন, অনন্ত সুখভোগ ও অনন্ত ক্ষমতা লাভ করিবে।

এস্থলে ভিন্ন ভিন্ন লোক বা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সমতল ক্ষেত্রের (Planes of existence) কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা অনুক্ষণ আমাদের নয়নপথে পতিত এবং যাহাতে অসংখ্য সৌরজগৎ, অসংখ্য নক্ষত্র লোক, অসংখ্য গ্রহ ও উপগ্রহ বর্ত্তমান, ইহারা জীবনের এক সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত। বোধ হয়, ইহারা এক প্রকার ভৌতিক পদার্থ দ্বারা বিরচিত ও এক প্রকার ভৌতিক নিয়মাবলি দ্বারা পরিচালিত এবং আমাদের ন্যায় উহাদেরও উৎকৃষ্ট অধিবাসিবর্গ আছে। কিন্তু এ সকল বিষয় আমাদের নিকট সম্পূর্ণ রহস্যময়।

যেমন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ জীবনের এক সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত, সেইরূপ জীবনের অন্যান্য সমতলক্ষেত্র বর্ত্তমান। ইহারাই আমাদের নিকট অদৃশ্যযোনি। ইহারা যেমন বিভিন্ন ভৌতিক ও অধ্যাত্মিক নিয়মাবলি দ্বারা চালিত, ইহদের অধিবাসিবর্গও সেইরূপ আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; উহারা বিভিন্নেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট ও বিভিন্নমনবিশিষ্ট। হিন্দুশাস্ত্রে দেবযোনি, ভূতযোনি গন্ধর্ব্বলোক সত্য-লোক, ব্রহ্মলোক, গোলোক প্রভৃতি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন লোক শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, উহারাই জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সমতলক্ষেত্র। যেমন এই পরিদৃশ্যমান জগতের গ্রহনক্ষত্রাদি পরস্পর বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সেইরূপ এই স্থূলজগতও অন্যান্য

অদৃষ্টলোকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আছে। এই সকল সূক্ষ্ম অধ্যাত্মজগৎ হইতেই দেবগণ পরব্রহ্মের চিৎশক্তির উপাধিস্বরূপ এই স্থূলজগৎ পরিচালন করেন। যুগধর্ম্মানুসারে মনুপুত্রগণের আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পাওয়াতে অধ্যাত্ম-জগৎ ও স্থূলজগতের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ব্যবহিত হইয়াছে; এজন্য এখন আমরা অধ্যাত্মজগতের বিষয় কিছুই অবগত নহি। কিন্তু যোগবলে যাঁহাদের অতীন্দ্রিয়জ্ঞান স্ফুরিত হয়, তাঁহারা অদৃষ্টলোক দিব্যচক্ষে সন্দর্শন করেন; কিন্তু উহার বিষয় তাঁহারা কিছুই ব্যক্ত করেন না। এস্থলে শাস্ত্র যাহা নির্দ্দেশ করে, তাহাই আমাদের অন্ধবিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

অনেকে যোনিভ্রমণ লইয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর বিদ্রূপ করেন। সত্য বটে, যে জীব কর্ম্মফল বশতঃ বা প্রকৃতির পরিমাণ বশতঃ নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে একবার উৎকৃষ্ট মানবে পরিণত হয়, সে জীব এ জগতে পুনরায় প্রাণিত্ব প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু পাপিষ্ঠ লোকে পাপাচরণ করতঃ পরলোকে যে নিকৃষ্ট আসুরীযোনি প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত নয়।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাত্যধমাং গতিং।

(গীতা)

"মূঢ় পাপিষ্ঠ লোকে আসুরীযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পায় না এবং উহারা এইরূপে ক্রমশঃ অধম গতি প্রাপ্ত হয়।"

তত্ত্ববিদ্যা উপদেশ দেয়, প্রথম কল্পে যাহা প্রস্তর, তাহাই দ্বিতীয় কল্পে উদ্ভিজ্জ, তৃতীয় কল্পে তাহাই প্রাণী এবং চতুর্থ কল্পে তাহাই মানব।

"The breath becomes a stone, the stone a plant, the plant an animal, the animal a man, the man a spirit, the spirit a god."

ব্রহ্মবাক্ প্রথমে প্রস্তর, পরে উদ্ভিজ্জ, তৎপরে প্রাণী, তৎপরে মানব, তৎপরে প্রেতাত্মা এবং পরিশেষে দেবতা হয়। বেদান্ত মতে জীব স্থাবরে ও জঙ্গমে সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান। প্রকৃতির পরিণাম বশতঃ জীবের ক্রমোন্নতি উপরোক্ত প্রকারেই সংঘটিত হয়। যাহা এখন প্রস্তর, তাহাও কালে দেবতা হয়; যাহা এখন শৃগাল, তাহাও কালে দেবতা হয়; যাহা এখন মানব,

তাহারাও কালে দেবতা হয়। আমরাও কালে দেবতা হইয়া জগৎ শাসন করিব। বল দেখি, ইহা অপেক্ষা জীবের ভাগ্য অধিক সুপ্রসন্ন কি প্রকারে হইতে পারে?

নির্ব্বাণ ও মুক্তি।

এক বিন্দু সলিলকণা সূর্য্যরশ্মি কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া মহাসমুদ্রের গর্ভ হইতে উত্থিত হয়। এখন এই বারিবিন্দু এ জগতে কত কাল ও কত স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় মহাসমুদ্রে লীন হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই বারিবিন্দু কখন বাষ্পাকারে বায়ু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া নানা দেশ দেশান্তর দর্শন করে; কখন বা আকাশে মেঘরূপে পরিণত হইয়া নানাবিধ চিত্র ও বিচিত্র রূপ প্রদর্শন করে; কখন বা বৃষ্টিরূপে ধরায় পতিত হইয়া নদ, নদী, হ্রদ, পল্লোল ও সরোবর আশ্রয় করে; আবার কতবার সূর্য্যরশ্মি কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া আকাশে মেঘরূপে দেখা দেয়; আবার কতকাল ভূগর্ভে, উদ্ভিজ্জদেহে ও জীবদেহে সঞ্চরণ করতঃ বিবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করে। এইরূপে সেই বারিবিন্দু নানাস্থানে, নানাদেহে ও নানা অবস্থায় কতকাল পরিভ্রমণ করে। হয়ত ইহা সহস্রবার শোষিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয় এবং সহস্রবার বৃষ্টিরূপে ধরায় পতিত হয়; পরিশেষে ইহা মহাসমুদ্রে লীন হয়।

জীবাত্মার গতিও অবিকল বারিবিন্দুর ন্যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে মহার্ণবরূপ পরব্রহ্ম হইতে জীবাত্মা বিয়োজিত হইবার পর কত কাল কর্ম্মফল কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ইহা বিভিন্ন লোকে পরিভ্রমণ করে এবং কখন পুনরায় পরব্রহ্মে মিলিত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহা "ন দেবা জানন্তি কুতো মানবাঃ," দেবতারা ইহা জানেন না, মানব কোন্ ছার!

পরব্রহ্মে জীবাত্মার পুনর্মিলনকে নির্ব্বাণ কহে; জীবাত্মারূপ যে মহাগ্নি এতকাল প্রজ্বলিত ছিল, তাহাই নির্ব্বাণাবস্থায় কিছুকালের জন্য নির্ব্বাপিত হয়; অথবা যে কর্ম্মরূপ মহানলে জীবাত্মা এতকাল দগ্ধ হইতেছিল, তাহাই সে অবস্থায় নির্ব্বাণ হয়। আর যাঁহারা ভাবেন, জীবদ্দশায় যে জীবাগ্নি প্রজ্ব-

লিত ছিল, মৃত্যুর সময় সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তাঁহারা নির্ব্বাণের বিকৃতার্থ করেন। নাস্তিকগণই নির্ব্বাণের এইরূপ মন্দ অর্থ করিয়া থাকেন।

নির্ব্বাণাবস্থায় জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না! যেমন প্রলয়ে বিশ্ব পরব্রহ্মে লীন হয় এবং ইহার অস্তিত্ব আদৌ থাকে না; সেইরূপ নির্ব্বাণেও জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে না এবং ইহা পূর্ণব্রহ্মে মিলিত হইয়া পূর্ণব্রহ্ম হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের মতে বুদ্ধদেব মৃত্যুর পর নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন; তজ্জন্য তিনি বৌদ্ধজগতে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ পূজিত হন। যে সকল ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদী এবং যাহাদের মতে জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় কোন ও ভেদ নাই, সেই সকল ধর্ম্মই জীবাত্মার নির্ব্বাণ স্বীকার করে এবং উহাদের মতে নির্ব্বাণপদ লাভই ইহার চরমোৎকর্ষ। এক নির্ব্বাণ ব্যতীত সকল অবস্থায় জীবাত্মা কর্ম্ম-ফলানুসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং সুখদুঃখের ভাগী হয়।

কেহ কেহ বলেন, নির্ব্বাণ প্রকৃতির অপরিহার্য্য পরিণাম বিশেষ। যৎকালে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তৎকালেই ব্রহ্মাদি দেবগণ ও অন্যান্য ভূতগ্রাম পরব্রহ্মে লীন হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করে; তদ্ভিন্ন মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে কেহই নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে না। তাঁহাদের মতে জন্মে জন্মে অসীম সাধনাবলে জীবাত্মা ষড়ৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া দেবতায় পরিণত হইলেও, ইহা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে প্রকৃত নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন, একমাত্র সাধনা-বলে জীবাত্মা কোন এক জন্মেই নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। যে কর্ম্মসূত্রে দ্বারা জীবাত্মা আবদ্ধ, সাধনাবলে তাহা ছেদন করিতে পারিলে, ইহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং ইহা পরব্রহ্মে লীন হইয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করে। তাঁহাদের মতে নির্ব্বাণ ও মোক্ষ শব্দের তাৎপর্য্য এক।

যে অদ্বৈতবাদী ধর্ম্ম জগতে মায়াবাদ বুঝে, সে ধর্ম্ম জীবাত্মার নির্ব্বাণ উপ-দেশ দেয়। নির্ব্বাণ অবস্থাটী মায়াতীত ও গুণাতীত। ইহাতে জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব ও সুখদুঃখ জ্ঞান কিছুই থাকে না। সুষুপ্তি, ত্রয়ী অবস্থা ও সমাধির ন্যায় এ অবস্থা চৈতন্য রহিত, নির্ব্বিকল্প ও নির্ব্বিকার। তদ্ভিন্ন সকল অবস্থায় ইহা মায়াজ্ঞান লাভ করে এবং মায়াজনিত সুখদুঃখ ভোগ করে।

যে সকল ধর্ম্ম জগতে দ্বৈতবাদী, তাহারাই জীবাত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভ উপদেশ দেয়। মানবজন্ম গ্রহণ করাতে জীবাত্মা যে সকল পাপে স্বভাবতঃ

জড়িত হয় এবং যে জন্য ইহা জীবনে নানাবিধ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মৃত্যুর পর যাহাতে ইহা স্বর্গলোকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে পারে ও নরকযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পায় অথবা যে কর্ম্মফলানুসারে ইহা পুনঃ পুনঃ ইহলোকে বা অন্যান্য লোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, সেই কর্ম্মফল যখন সাধনাবলে লয় প্রাপ্ত হওয়ায় ইহা পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় না এবং স্বর্গলোকে দেবতাদিগের মধ্যে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতে পারে, তখনই ইহা মুক্তিলাভ করে বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

মুক্তিলাভ বা মোক্ষপদ প্রাপ্তি জীবাত্মার সাধনাসাপেক্ষ। যোগাভ্যাস করতঃ পরব্রহ্মের নির্গুণোপাসনা দ্বারাই হউক, অসাধারণ ধর্ম্মাচারণ করতঃ সগুণ ঈশ্বরোপাসনা দ্বারাই হউক, অথবা একান্ত ভক্তির সহিত ঈশ্বরের অবতার বিশেষের আরাধনা দ্বারাই হউক, যে কোন সাধনবিধি দ্বারা যদি জীবাত্মা পরমার্থ জ্ঞান লাভ করতঃ তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারে, তখন ইহা মোক্ষলাভের যোগ্য হয়। বিষয়বাসনাই ইহার জন্মপরিগ্রহের মূলীভূত কারণ। অসাধারণ সাধনাবলে জন্মজন্মান্তরে যখন এই বিষয়বাসনা মন হইতে দূরীভূত হয়, তখন ইহা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমধামে গমন করে। পরমধাম কিরূপ?

> ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
> যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।
>
> (গীতা)।

"যে স্থলে শশী, সূর্য্য ও অগ্নি উত্তাপ দেয় না এবং যথায় গমন করিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, সেই স্থলই আমার পরমধাম।"

জীবাত্মা পরমধামে উপস্থিত হইলে, ইহা দেবতাদিগের ন্যায় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন ইহা ষড়ৈশ্বর্য্যে ও অনন্ত ক্ষমতায় বিভূষিত হইয়া ভূতাদি শাসন করে। এতকাল ইহা শাসিতবর্গের মধ্যে ছিল; এখন ইহা শাসকবৃন্দের মধ্যে উন্নীত হয়। এই প্রকারে সাধনবলে জীবাত্মার পদবৃদ্ধি ও পদোন্নতি হইতে থাকে বটে, কিন্তু ইহা কদাচ মায়া হইতে বিচ্যুত হয় না। যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখনই ইহা পরব্রহ্মে লীন হইয়া নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়।

অবিনশ্বর জীবাত্মার ভবিষ্যৎ কত সমুজ্জ্বল ও কত আশাপূর্ণ! যে জীবাত্মা

আজ ক্ষণবিধ্বংসি মানবদেহে নিবদ্ধ হইয়া সংসারের বিবিধ জ্বালাযন্ত্রণায় অস্থির ও নানা ঝঞ্ঝাবাতে ও তরঙ্গে আলোড়িত, সেই জীবাত্মা বিভিন্ন লোকের মায়া-জ্ঞান লাভ ও মায়াসুখভোগ করিতে করিতে ক্রমোন্নতি লাভ করিবে এবং অনন্ত সাধনাবলে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী-দেবতা হইবে ও ভূতাদি শাসন করিবে, ইহা অপেক্ষা জীবের ভাগ্য আর অধিক সুপ্রসন্ন কিরূপে হইতে পারে? জীবাত্মার অনন্ত উন্নতির কথা ভাবিলে, হৃদয়-চকোর কিরূপ আনন্দে নৃত্য করে! অধ্যাত্মবিজ্ঞান! ধন্য তোমার উপদেশ! ধন্য তোমার আশাপ্রদ কথা! তুমি অবিনশ্বর জীবাত্মার অনন্ত উন্নতির কথা যাহা নির্দ্দেশ কর, তাহার সহিত তুলনা করিলে, যে জড়বিজ্ঞান জীবাত্মার অমরত্ব ও অবিনশ্বরত্ব ঘুচাইয়া এই নগণ্য মেদিনীর বাহ্যাড়ম্বর বৃদ্ধি ও বাহ্যশ্রীবৃদ্ধিসাধনই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উপদেশ দেয়, উহার কথা কিরূপ অশ্রদ্ধেয় ও কিরূপ অকিঞ্চিৎকর?

মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া পরমধামে যাইলে, জীবাত্মা যেরূপ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, ইহজীবনে তাহার কি কোনরূপ আভাস পাওয়া যায়? ইহসংসারে যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহারাই জীবাত্মার সেই ব্রহ্মানন্দের কিঞ্চিৎ আভাস পান। এখন সংসারে কাহারা জীবন্মুক্ত?

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্।
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ
প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা নাশাভ্যন্তরচারিণৌ।
যতেন্দ্রিয়মনবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণাঃ
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।

(গীতা ৫।)

"যে সকল যোগিদিগের ইন্দ্রিয়গণ সংযত, যাঁহারা কামক্রোধ হইতে বিমুক্ত ও পরমার্থ জ্ঞানে অভিজ্ঞ, তাঁহাদেরই চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যবিষয়গুলি বহির্ভাগে রাখিয়া (উহাদের দ্বারা কোনরূপ আকৃষ্ট বা বিকৃত না হইয়া) ভ্রূযুগলের মধ্যে চক্ষু রাখিয়া নাশাভ্যন্তরচারি প্রাণ ও অপান বায়ুকে সংযত করতঃ যে মুনি ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি সংযত করেন, সকল প্রকার ইচ্ছা, ভয়, ও ক্রোধকে মন হইতে একেবারে দূরীভূত করেন এবং সদা মোক্ষ-

পদ প্রাপ্তির জন্য একান্ত ব্যগ্র হন, তিনিই ইহসংসারে জীবন্মুক্ত।" ঈদৃশ মহাত্মাগণই ইহসংসার হইতে পরমধামের স্বর্গসুখের আভাস পান। আর বিজ্ঞানের মতে কাহারা জীবন্মুক্ত ও সকলের আদর্শ পুরুষ? যাঁহারা অলোক সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিবলে রাজ্যের মন্ত্রীত্বাদি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যলিপি অনুশাসন করেন, তাঁহারাই উহার মতে জীবন্মুক্ত; যেহেতুক দেশের সকল লোকে তাঁহাদেরই প্রশংসাবাদ করিয়া থাকে।

মুক্তি সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ স্বর্গীয় ও মহোচ্চ। কি নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ, কি জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি কর্ম্মযোগ, সকল বিষয়েই যেমন এ ধর্ম্ম পরাকাষ্ঠা দেখায়, মুক্তি বিষয়েও সেইরূপ ইহা যাহা উপদেশ দেয় তাহা ধর্ম্মজগতে অতুলনীয়। বোধ শক্তি থাকে, স্বধর্ম্মের মুক্তিতত্ত্ব বুঝিয়া নিজ বোধ শক্তি চরিতার্থ কর। শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার মুক্তি উল্লিখিত আছে, যথা (১) সাযুজ্য, (২) সারূপ্য, (৩) সালোক্য, (৪) সাষ্টি, (৫) সামীপ্য। সাযুজ্য মুক্তি লাভ হইলে, জীবাত্মা পরমাত্মায় সংযুক্ত বা লীন হয়; নির্ব্বাণের সহিত সাযুজ্য মুক্তির কোনরূপ প্রভেদ নাই। সারূপ্য মুক্তি লাভ হইলে, জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া জীবাত্মা সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয়; এ অবস্থায় পরব্রহ্ম হইতে ইহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে। সাষ্টিমুক্তি লাভে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সমান ঐশ্বর্য্য ভোগ করে; যেমন পরব্রহ্মের অনন্তশক্তি ও অনন্তজ্ঞান, সেইরূপ জীবাত্মাও সাধনবলে ঐরূপ শক্তি ও জ্ঞান লাভ করে। সালোক্য ও সামীপ্য মুক্তি লাভ হইলে, জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একলোকে অবস্থিতি পূর্ব্বক বা তাঁহার সমীপে অবস্থিতি পূর্ব্বক অপার ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে।

হিন্দু পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে অদ্বৈতভাবে দেখেন বলিয়া, নির্ব্বাণ বা সাযুজ্যমুক্তি লাভই তাঁহার ধর্ম্মসাধনার চরমফল। আবার তিনি উভয়কে দ্বৈতভাবে দেখেন বলিয়া জীবাত্মার সালোক্যাদি মুক্তি লাভই তাঁহার ধর্ম্মসাধনার চরমফল। এখন একবার ভাব দেখি, তাঁহার সাধনার চরম উদ্দেশ্য বা প্রধান লক্ষ্য কি? তিনি সাধনবলে অনন্ত শক্তিশালী সর্ব্বজ্ঞ জীবাত্মার পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি দ্বারা যে কেবল ব্রহ্মলোকে যাইতে বা পরব্রহ্মের সমীপে যাইতে অভিলাষ করেন, তাহা নহে; কিন্তু তিনি সাধনবলে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে

বিভূষিত হইয়া স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম হইতে ইচ্ছা করেন। যে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, এই প্রকারেই সে জীবাত্মার পূর্ণ উন্নতি কল্পনা করা উচিত। এ জগতে এক হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকে মনের এমন উচ্চাভিলাষ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। তাহারা না হয় অশেষ ধর্ম্মাচরণ করিয়া স্বর্গলোকে বা ঈশ্বরের সমীপে যাইতে অভিলাষ করে; কিন্তু আমরা স্বয়ং ঈশ্বর হইব এমন আশা তাহারা কদাচ করিতে পারে না। এই পূর্ণব্রহ্মত্ব লাভ করিবার জন্যই একজন পরম হিন্দু ইহসংসারে ভক্তিমার্গের অনুসরণ দ্বারা তন্ময়ত্বলাভে একান্ত প্রয়াসী হন। তন্ময়ত্ব কাহাকে বলে, তাহাই খ্রীষ্টাদি ধর্ম্ম বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

সেইরূপ মুক্তি কাহাকে বলে, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। ইহার মতে সংসারের শোকতাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরানুগ্রহে স্বর্গলোকে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করার নাম প্রকৃত মুক্তি। সংসারের শোকতাপকে খ্রীষ্টধর্ম্ম যেরূপ ভয় করে, হিন্দুধর্ম্ম তদ্রূপ করে না। হিন্দুধর্ম্মের মতে জন্মজন্মান্তরের শোকতাপে বিপদ্যমান হওয়াও জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতা স্ফুরিত হয়। যেমন খৃষ্টধর্ম্ম মানবের আধ্যাত্মিক পতনের বিকৃত অর্থ করে, তেমনি এ ধর্ম্মও তাঁহার মুক্তির বিকৃত অর্থ করিয়া থাকে। যে ধর্ম্ম সয়তানের প্রলোভনে জ্ঞানবৃক্ষের আস্বাদনে মানবের পতন ঘটায়, সেই ধর্ম্ম আবার একটা সামান্য লোককে ক্রুসে বিদ্ধ করাইয়া তাঁহার শোণিত পাত করতঃ তাঁহাকে মানবের মুক্তিদাতা বলিয়া স্থির করে। এ ধর্ম্মের মতে সাত দিন অন্তর একবার গির্জ্জায় গমনপূর্ব্বক মুক্তিদাতাকে মধ্যস্থ রাখিয়া ঈশ্বরভজন করিলেই মুক্তিলাভ করা যায়। যেমন ইহার সাধনবিধি, তেমনি ইহার মুক্তিবিধি! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! লোকে পূর্ব্বে কি ভাবিয়া, কি দেখিয়া শ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ ঐরূপ অপকৃষ্ট ধর্ম্মের ছায়া আশ্রয় করিতে যাইত? তাহারা যদি হিন্দুধর্ম্মের স্বর্গীয়ভাব একবার বুঝিত, তাহারা কি কদাচ সামান্য ঐহিক সুখসচ্ছন্দতা লাভের জন্য ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গদলে গিয়া মিলিত?

ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্মশাস্ত্র।

মানবধর্ম্ম মাত্রেই সর্ব্বত্র প্রচার করে, যে ইহার আদ্য ধর্ম্মগ্রন্থ ঈশ্বরপ্রকটিত। ইহুদিদিগের ভিতর পুরাতন বাইবেল, খ্রীষ্টানদিগের ভিতর নূতন বাইবেল, মুসলমানদিগের ভিতর কোরান, বৌদ্ধদিগের ভিতর ত্রিপিটক এবং

হিন্দুদিগের ভিতর চতুর্ব্বেদ ঈশ্বরপ্রকটিত বলিয়া চিরদিন সমধিক পূজ্য। সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থের উপর অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতঃ উহার বাক্য ও উপদেশ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করে। দেখা যায়, ঈশ্বরের উপর লোকের যেরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস, আত্ম ধর্ম্মগ্রন্থের উপরও তাহাদের সেইরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস। বস্তুতঃ আত্মধর্ম্মগ্রন্থের উপর তাহাদের তাদৃশ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না হইলে, তাহারা কিপ্রকারে উহার ধর্ম্মামৃত পান করতঃ ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হইতে পারে? এ স্থলে ধর্ম্মগ্রন্থের উপর যাহার যেরূপ দৃঢ়বিশ্বাস হয়, তিনিও ইহার উপদেশ দ্বারা সেইরূপ উপকৃত হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ কি সত্যসত্যই ঈশ্বরপ্রকটিত? ঈশ্বর কি সেনাই পর্ব্বতের উপর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমধ্যে আবির্ভূত হইয়া মুসাদেবকে দশ মহাজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক মানবসমাজে তাহা প্রচার করেন? তিনি কি ঈষাদেবের শ্রীকণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে স্বর্গীয় মহোচ্চ ধর্ম্মোপদেশ নিঃসরণ করতঃ তাহা জনসমাজে প্রচার করেন? যদি এক ঈশ্বর এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ দেশে দেশে প্রচার করেন, তবে ইহাদের এত বিভিন্ন মতামত কেন? কেন একধর্ম্মাবলম্বী লোকে অন্যধর্ম্মের গ্রন্থের উপর পদাঘাত করে? বিংশশতাব্দীর এত জ্ঞানালোকের মধ্যে কে ধর্ম্মের এই সকল প্রলাপবাক্যে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারে? কৃতবিদ্যমাত্রেই ত ভালরূপ জানেন, বিজ্ঞানের কাছে ধর্ম্মের এ সকল বুজরুকি আজকাল আর খাটে না এবং এ সকল কুসংস্কার এখন সমাজে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগের মহামহিম পণ্ডিতগণ বলেন, এ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ কদাচ ঈশ্বর প্রণীত হইতে পারে না; ইহারাও অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় ভ্রমসঙ্কুল মানবমনবিরচিত; কেবল মাত্র স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থের উপর জনসাধারণের অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপাদন করাইবার জন্য প্রত্যেক বৈশেষিক ধর্ম্ম সংসারের কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া ইহার আত্মধর্ম্মগ্রন্থকে ঈশ্বরপ্রেরিত বা ঈশ্বরপ্রকটিত বলিয়া চিরদিন প্রচার করিয়া থাকে।

কেহ কেহ এরূপ বলেন, বুদ্ধ, ঈষা, মুষা, মহম্মদ প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রকৃত যোগেশ্বর এবং যাঁহারা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠাংশে আবির্ভূত হন। তাঁহারা স্বশিষ্যমণ্ডলীর ভিতর যে সকল স্বর্গীয় উপদেশ প্রদান করেন, সে সকল উপদেশ ঈশ্বর স্বয়ং

তাঁহাদের হৃদয়াকাশে প্রকটিত করেন; অতএব তাঁহাদিগের প্রণীত শাস্ত্রবিশেষও যে ঈশ্বরপ্রকটিত, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নয়।

যথার্থ বলিতে কি, সকল দেশের যোগেশ্বর মহাত্মাগণ ব্রহ্মার অমরপুত্র, সেই সত্য, সনাতন ও প্রাচীন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান হইতে স্বর্গীয় উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করেন। এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান অতি প্রাচীনকালে দৈববাণীযোগে দেবগণ কর্ত্তৃক জগতে প্রকটিত হয়।

"There was a primeval Revelation." *Secret Doctrine.*

শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে আকাশে দৈববাণী হইত। অনেকে শাস্ত্রের এ কথায় বিশ্বাস করেন না। কলিযুগে স্থূলত্বের সম্যক বৃদ্ধি হওয়ায়, আমাদের নিকট ঐ সকল ঘটনা এখন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সংসারে অসম্ভব কিছুই নাই। এখনও মধ্যে মধ্যে আমাদের হৃদয়াকাশে দৈববাণী হয় এবং দৈবযোগে আমরা নূতন নূতন বিষয় অবগত হই।

যাহা হউক, সকল দেশের যোগসিদ্ধ অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিৎ মহাত্মাগণ ভালরূপ জানিতেন, যে প্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান দেবগণ কর্ত্তৃক দৈববাণীযোগে সংসারে প্রকটিত হইয়াছিল। ইহারই অনুকরণে বৈশেষিকধর্ম্ম প্রচারকগণ স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া জগতে প্রচার করেন। কিন্তু এরূপ প্রচার করাতে জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। আপ্ত ধর্ম্মগ্রন্থের উপর লোকের আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকিলে, কি প্রকারে তাহারা সেই গ্রন্থের উপদেশ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিতে ব্যগ্র হয়? অতএব জগতের অশেষ মঙ্গলের জন্য, মানবসমাজের যথার্থ হিতের জন্য, আপ্ত ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বেদ বল, কোরাণ বল, বাইবেল বল, উহাদের ভিতর এমন দ্ব্যর্থ ভাব নিহিত, যাহা সহজবুদ্ধিতে আদৌ বোধগম্য হয় না। যোগেশ্বরপ্রণীত বলিয়া উহাদের ভাব স্থলে স্থলে এত দুরূহ ও ক্লিষ্ট। যাঁহারা ঐ সকল আদ্যধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহারা যে জনসাধারণ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমধিক উন্নত ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যেমন প্রত্যেক মানবধর্ম্মে এক এক জন ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা অবতার না থাকিলে, সে ধর্ম্ম জগতে স্ফূর্ত্তি পায় না, সেইরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মের এক এক

খানি ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্মগ্রন্থ না থাকিলে, সে ধর্ম্ম জগতে আদৌ স্ফূর্ত্তি পায় না। যে ধর্ম্মের সেবকবৃন্দ এক শাস্ত্রানুসারে নিজ নিজ চরিত্র গঠিত করে এবং উহারই আদেশ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া মান্য করে, সেই ধর্ম্মই জগতে স্থায়ী হয় এবং ইহা দ্বারাই জগতের অধিকাংশ লোক সম্যক উপকৃত হয়। অতএব মানবসমাজের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য আদ্যধর্ম্মগ্রন্থকে ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া মানা উচিত। যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ নানা সম্প্রদায়ের বৈশেষিক মতামতে পূর্ণ, উহারা এক ব্যাসবিরচিত বলিয়া কেন জগতে প্রচারিত হইল? উহাদের প্রতি জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই উহারা ব্যাসবিরচিত বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে।

আদ্য ধর্ম্মগ্রন্থ ঈশ্বরপ্রেরিত হউক বা না হউক, যখন ঐরূপ বিশ্বাস সকলের মনে বদ্ধমূল হওয়ায় সমগ্র মানবসমাজের এত মহোপকার, তখন যদি নবোত্থিত নববিজ্ঞান লোকের সেই দৃঢ় বিশ্বাসকে ক্রমশঃ মন্দীভূত করিয়া দেয়, তাহারা কি সন্দেহদোলায় দোলায়মানচিত্ত হইয়া ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হয় না এবং ইহাতে সমাজের সবিশেষ অমঙ্গল হইবার কি সম্ভাবনা নাই? অতএব এ বিষয়েও বিজ্ঞানের কথায় কর্ণপাত না করাই শ্রেয়।

আমাদের বিশ্বাস, চতুর্ব্বেদ ঈশ্বরপ্রকটিত ও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতে বিনিঃসৃত হয়। শাস্ত্রের এ কথায় কৃতবিদ্য নব্যসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এ কথারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন ভাষা মানবকৃত, ঈশ্বরপ্রণীত নয়, অথচ অনাদি বলিয়া উহাকে ঈশ্বরপ্রণীত বলা যায়; সেইরূপ জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার অনাদি বলিয়া উহাকেও ঈশ্বরপ্রণীত বলা যাইতে পারে। অতএব অতি প্রাচীনকালের শ্রুতিপরম্পরাগত আর্য্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ চতুর্ব্বেদও যে ঈশ্বরপ্রণীত বা ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখসমীরিত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেমন ভাষা ও জ্ঞান মূলে অনাদি, অতএব ঈশ্বর প্রণীত, পরে সমাজের উন্নতির সঙ্গে ইহারা মনুষ্য কর্ত্তৃক পরিস্ফুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়; সেইরূপ আর্য্যজাতির আদ্যধর্ম্মগ্রন্থ, বেদ সংহিতা মূলে অনাদি, অতএব ঈশ্বরপ্রণীত; ইহাও পরে আর্য্য সমাজের উন্নতির সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া এখন চতুর্ব্বেদে বিভক্ত হইয়াছে।

পুরাকালে আর্য্যসমাজে এক বেদ শাস্ত্র প্রচলিত ছিল; ইহাই কালক্রমে

পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদব্যাস কর্ত্তৃক চতুর্ব্বেদে বিভক্ত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য চতুর্ব্বেদ কি ঈশ্বরপ্রকটিত? দৈববাণীযোগে বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক কি ইহারা যথার্থই শ্রুত ও তৎপরে প্রচারিত হয়, না ইহারা যোগবলে তাঁহাদের হৃদয়াকাশে প্রতিভাত হয়? মনে কর, শাস্ত্রের এ সকল কথা সর্ব্বৈব অলীক; কিন্তু যখন স্বল্পদূরবর্ত্তী ঐতিহাসিক সময়ের কোরাণ ও বাইবেলকে মুসলমান ও খৃষ্টানেরা ঈশ্বরপ্রকটিত বলিয়া স্পর্দ্ধার সহিত প্রচার করে, তখন অতি প্রাচীন কালের কে-জানে-কোন-সময়ের, অনৈতিহাসিক সময়ের বেদশাস্ত্রকে আমরাও কেন না দ্বিগুণ স্পর্দ্ধার সহিত ঈশ্বরপ্রকটিত বলিয়া প্রচার করিব? বেদকে ঈশ্বরপ্রকটিত বলায়, ইহার প্রাচীনত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে মাত্র।

আজ বেদ সম্বন্ধে অপরূপ কথা শ্রবণ করা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অসাধারণ গবেষণা ও পরিশ্রমের গুণে সিদ্ধান্ত করেন, বেদপ্রণেতা আর্য্য-ঋষিগণ কৃষকযোদ্ধা এবং বেদের স্তোত্রগুলি আর্য্যকৃষককুলের ভীতিসংবলিত গীতমাত্র। তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, তাঁহাদের কথা প্রকৃত হিন্দুর নিকট অশ্রোতব্য।

এখন বেদকে একবার হিন্দুর নয়নে দেখা উচিত। প্রকৃত বেদ অনাদি শব্দব্রহ্মের রূপ। সৃষ্টিবিষয়ক যে জ্ঞান পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার হৃদয়াকাশে প্রতিভাত হয় এবং যদ্দ্বারা তিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন, তাহাই প্রকৃত বেদ। যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান চতুর্যুগের যোগেশ্বরগণ চিরদিন অনুশীলন করেন, তাহাই প্রকৃত বেদ। আর তুমি ও আমি যে বেদ দেখিতে পাই, যাহা এখন ম্লেচ্ছপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কলুষিত ও ভ্রষ্ট, তাহা প্রকৃত বেদ নহে, তাহা যথার্থ বেদের অপভ্রংশ মাত্র। কলিযুগে বেদ এখন অপ্রকাশিত বা ঈষৎ প্রকাশিত। ইহার শ্রেষ্ঠ অংশগুলি সমাজে ধর্ম্মাবনতির সহিত ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে। যুগভেদে মানবের আধ্যাত্মিকতা যে পরিমাণে অপগত হয়, যথার্থ বেদও সেই পরিমাণে সমাজে গুপ্ত হয়। বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ, যাঁহারা বেদশাস্ত্র সমাজে প্রকটিত করেন, তাঁহারা যোগবলেই ইহা প্রাপ্ত হন। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগের বেদশাস্ত্র এখন সমাজে লুপ্ত হইয়াছে। কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের জন্য বেদের যে সকল অংশ রক্ষা করেন, তাহাই এখন সমাজে বেদনামে প্রচলিত আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদের এই অপভ্রংশ

দর্শন করতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ উৎপত্তি কোথায়, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন না।

বেদের অর্থ দুই প্রকার, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্ত অর্থের সমালোচনা করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, বেদ অসভ্য জড়োপাসক আর্য্যকৃষককুলের ভীতিসম্বলিত গীতমাত্র। কিন্তু কালে তাঁহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। বেদের অব্যক্ত ও গূঢ় অর্থ যোগীরাই বুঝিতে পারেন। সপ্তস্বরের সহিত ইহার মন্ত্রগুলির সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। এক এক স্বরে গীত হইলে, মন্ত্রগুলি সূক্ষ্মজগতে ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপাদন করিত। জড়জগতের জড়শক্তিতে দৈবশক্তির কিরূপ বিকাশ, তাহাই বেদে প্রদর্শিত হইয়াছে! সূক্ষ্মজগতস্থ দেবগণ পঞ্চ মহাভূতের মহালীলা দ্বারা স্থূলজগতে কিরূপ প্রকাশমান এবং তাঁহারা কিরূপে স্তবনীয় হওয়া উচিত, তাহাই বেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন জীবদেহ হইতে জীবাত্মা উড়িয়া গেলে, উহার শবদেহ মাত্র পড়িয়া থাকে; সেইরূপ বেদের শবদেহমাত্র এখন অবশিষ্ট আছে, উহার মন্ত্রশক্তি এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এ কলিকালে উহার সে প্রভাব নাই, সে জ্যোতি নাই। বেদের মাহাত্ম্য লোকে কি বুঝিবে?*

---

* বেদ সম্বন্ধে দ্বিতীয়ভাগে আরও লিখিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

পাপপুণ্যের বিচার।

অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারের যেরূপ অবস্থায় আমাদিগকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, পরিবারবর্গে বেষ্টিত ও সমাজবদ্ধ হইয়া আমরা চিরদিন যেরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করি, আমাদের হৃদয়ে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সমাবেশ হওয়ায়, আমরা যেরূপ ইষ্টানিষ্টের মহাদ্বন্দ্বে অনুক্ষণ লিপ্ত হই, তাহাতে হিতাহিত বিবেচনা ব্যতীত আমরা এক মুহূর্ত্ত যাপন করিতে পারি না; পদে পদে আমাদিগকে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। বাল্যকালের জ্ঞানোদয়েরসঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হিতাহিত জ্ঞান প্রস্ফুরিত হইতে আরম্ভ হয়। নানা বিষয় পর্য্যবেক্ষণ, শ্রবণ ও মনন করিয়া আমাদের এই হিতাহিত জ্ঞান আজীবন পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আমরা ইহা দ্বারাই আজীবন চালিত হই।

অন্যান্য জীবজন্তু নৈসর্গিক সংস্কার দ্বারা সকল বিষয়ে চালিত হয়; উহাদিগকে কখন হিতাহিত বিবেচনা করিতে হয় না। কিন্তু আমরা প্রকৃতিদেবীর বিদ্রোহী সন্তান। আমাদের কৃত্রিম জ্ঞানশক্তি যে পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত, আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার এখন সেই পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছে। হিতাহিত জ্ঞানে প্রকৃতি আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না; বরং স্বার্থ প্রবৃত্তিগুলিকে হৃদয়ে সমধিক বলবতী করিয়া দেওয়ায়, আমরা অনেক সময়ে প্রকৃতিকর্তৃক বিপথে চালিত হই। আমরাও বাল্যকালে বিবিধ সংস্কার পাইয়া ও উত্তরকালে বিবিধ শিক্ষা পাইয়া হিতাহিত জ্ঞান লাভ করতঃ ভবসাগর উত্তীর্ণ হই।

পাপপুণ্যের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে, আমরা এ সংসারে কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত আছি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সামাজিক মানব স্বজনবর্গে ও স্বজাতিবর্গে বেষ্টিত হইয়া চিরদিন লোকালয়ে বসবাস করেন। সমাজে বসবাস দরুণ তাঁহার হৃদয়ে দুই প্রকার বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রবৃত্তির সমাবেশ দেখা যায়, যথা, স্বার্থসাধিকা ও পরার্থসাধিকা। প্রথমোক্ত প্রবৃত্তি-

গুলির প্রধান উদ্দেশ্য আত্মসুখবর্দ্ধন ও আত্মোন্নতিসাধন, [illegible] [illegible]র উদ্দেশ্য পরসেবা ও পরহিতসাধন। আবার তাঁহার স্বার্থে [illegible] জন্তু-দিগের স্বার্থে অনেক প্রভেদ। ধর্ম্ম তাঁহাকে চিরদিন পরিবারে [illegible] পুত্র-কলত্রাদি স্বজনবর্গ লইয়া বসবাস করায়। ইহাতে তাঁহার স্বার্থ, আর উঁহাদের স্বার্থ অপরিহার্য্যরূপে জড়িত হয় এবং তিনি নিজের জন্য যেমন চিন্তিত হন, উহা-দের জন্যও তিনি তেমনি চিন্তিত হন। কিন্তু নিকৃষ্ট জীবজন্তু নিজের প্রাণরক্ষা, উদরপূরণ ও কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা ব্যতীত আর কিছুই জানে না। আবার তিনি সমাজে বসবাস করায় পরের জন্য [illegible]ত করিতে অনেক সময় বাধ্য এবং আপনার ও পরিবারের জন্য তিনি যেমন চিন্তিত হন, যে সমাজে থাকেন, সে সমাজের জন্যও তিনি তেমনি চিন্তিত হন। এইরূপে নানাস্থলে, নানা সময়ে ও নানা কারণে তাঁহার স্বার্থে ও পরার্থে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং তিনিও সদা সর্ব্বদা ইষ্টানিষ্টের সংঘর্ষে লিপ্ত হন। যাহা এক সময়ে তাঁহার মহৎ ইষ্ট, তাহাই আবার অন্য সময়ে তাঁহার মহৎ অনিষ্ট; যাহা তাঁহার ইষ্ট, তাহা অপরের অনিষ্ট; যাহা তাঁহার স্বজনবর্গের ইষ্ট, তাহা তাঁহার স্বজাতিবর্গের অনিষ্ট। যদি তিনি আত্মসেবায় অধিক অনুরক্ত হন, পরসেবায় তিনি বিরক্ত হন। যদি তিনি পরসেবায় অধিক অনুরক্ত হন, তিনি আত্মসেবায় বিরক্ত হন। এই স্বার্থ-পরার্থের বিরোধে, এই ইষ্টানিষ্টের সংগ্রামে ধর্ম্ম তাঁহাকে চিরদিন পরিচালিত করে। ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে বিবেকরূপ সংস্কার চিরবদ্ধমূল করিয়া তাঁহাকে সংসা-রের ইষ্টপথে চালায় এবং নিজ শাস্ত্রে তাঁহার যাবতীয় পাপপুণ্যসম্যক নির্দ্দেশ করতঃ উহাদিগকে তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত করে।

এখন পাপপুণ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? সকল দেশে মানবধর্ম্ম উপদেশ দেয়, যে সকল ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা অবিনশ্বর আত্মা ইহলোকে ও পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয় এবং যদ্দ্বারা বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহাই ইহার পুণ্যকর্ম্ম বা ধর্ম্ম; পুণ্য জীবাত্মার চিরসহচর এবং উহারই বলে জীবাত্মা পরলোকে অনন্ত সুখভোগ করে; আর যে সকল অসৎ কর্ম্ম দ্বারা ইহা উভয় লোকে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় এবং যদ্দ্বারা ইহা আত্মগ্লানিরূপ অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হয়, তাহাই ইহার পাপকর্ম্ম বা অধর্ম্ম। ইহাও জীবাত্মার চিরসহচর এবং ইহার গুণে আত্মা আসুরী ও রাক্ষসীযোনি প্রাপ্ত হয় বা নরক ভোগ করে।

প্রাচ্য জগতে ধর্ম্মশাস্ত্রই পাপপুণ্যবিচারের কেন্দ্রস্থল। যাহা শাস্ত্র সম্মত, তাহাই পুণ্যকর্ম্ম, আর যাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহাই পাপকর্ম্ম। এ জন্য হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে এক জন ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর নিকট গঙ্গাস্নান মহাপুণ্য ও গোহত্যা মহাপাতক এবং কোরাণমতে একজন মুসলমানের নিকট কাফরকে তরবারি বলে স্বধর্ম্ম দীক্ষিত করা মহাপুণ্য ও শূকরমাংসস্পর্শ মহাপাপ। ইহার মতে পাপপুণ্য বিচার করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে যেরূপ নির্দ্দেশ করে, তোমায় তাহা অন্ধবিশ্বাসের সহিত পালন করিতে হয় এবং তুমিও কদাচ তাহা হইতে একচুলও স্খলিত হইতে পার না। সুশিক্ষিতাশিক্ষিত সমাজস্থ যাবতীয় লোককে একমার্গে চালিত করিয়া সমাজের প্রকৃত সুখবর্দ্ধন করাই ধর্ম্মশাস্ত্রের মহৎ উদ্দেশ্য। সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র এস্থলে সমাজস্থ যাবতীয় লোকের বিবেককে এক পথের পথিক করিয়া দেয়।

পাশ্চাত্য জগতে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ বিবেকই পাপপুণ্যবিচারে আমাদের প্রধান সহায়। যাহা বিবেকানুমোদিত, তাহাই পুণ্যকর্ম্ম বা ধর্ম্ম, আর যাহা বিবেকবিরুদ্ধ, তাহা পাপকর্ম্ম বা অধর্ম্ম। খ্রীষ্ট ধর্ম্মমতে এ সংসার কেবল পরীক্ষাক্ষেত্র; সুতরাং এ ধর্ম্ম মানবের স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেকের প্রাধান্য স্বীকার করে। ইহার মতে বিবেক তোমায় যে পথে লইয়া যায়, তুমি কেবল সেই পথে যাইতে বাধ্য। যদি সে পথ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রকে অমান্য করিয়াও বিবেকের আদেশ শিরোধার্য্য করা উচিত। দেখ, শাস্ত্র মানবরচিত, অতএব ভ্রমসঙ্কুল; কিন্তু বিবেক অভ্রান্ত ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ জগতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ; আমরা সহজাত সংস্কার বলে বা সহজ জ্ঞানে স্বর্গীয় বিবেক প্রাপ্ত হই। ইহার আদেশ ও ঈশ্বরের আদেশ, উহাদের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; অতএব ইহারই আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। আরও দেখ, ইহার অভিমতে কর্ম্ম করিলে, হৃদয়ে আত্মপ্রসাদ-রূপ স্বর্গসুখ ভোগ করা যায়। আর ইহার অনভিমতে কর্ম্ম করিলে, হৃদয়ে আত্মগ্লানিরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব খ্রীষ্টধর্ম্মমতে পাপপুণ্য-বিচারে বিবেকেরই প্রাধান্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য। সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় আজ[illegible] বিবেকের যতদূর পক্ষপাতী, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের ততদূর পক্ষপাতী নন।

আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতে, ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিবেক ব্যতীত মানবের হিতাহিত বিচারে অপর একটীর প্রাধান্য থাকা উচিত; তাহা কেবল সমাজের মঙ্গলামঙ্গল। যদ্দ্বারা সমাজস্থ বহুসংখ্যক লোকের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাই পুণ্যকর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম, আর যদ্দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা, তাহাই পাপকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম। শাস্ত্র মানবরচিত, অতএব ভ্রমসঙ্কুল; বিবেক বাল্যকালের সংস্কার ও উক্ত কালের শিক্ষার অনুসারে গঠিত হয়, অতএব ইহাও ভ্রমসঙ্কুল। সুতরাং উভয়কেই স্থলবিশেষে অগ্রাহ্য করিতে হয়।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন, "ধর্ম্মশাস্ত্র যতই কেন স্পর্দ্ধার সহিত বলুক না, ইহা ঈশ্বরপ্রকটিত বা মহাত্মা-বিরচিত, তথাচ ইহা নানা কুসংস্কারে ও নানা ভ্রমে পরিপূর্ণ। যখন জগৎ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখনই ধর্ম্ম শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। আমি কেন কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা মানিব? আমি সুন্দর জ্ঞান-শক্তিতে বিভূষিত হইয়া এ জগতে সৃষ্ট হইয়াছি। আমি সকল বিষয়ে একমাত্র জ্ঞানশক্তি পরিচালন পূর্ব্বক ভালরূপ বিবেচনা করিয়া কাজ করিব। আমি কেন অন্ধবিশ্বাসের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা মান্য করিয়া চলিব? এই বিংশ শতাব্দীর দিনে, এত জ্ঞানালোক ও এত সমুজ্জ্বল সভ্যতাজ্যোতির মধ্যে কে সেই স্থবির, মুমূর্ষু ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা মান্য করিয়া চলে? আবার লোকে বিবেক বিবেক করিয়া মহা চীৎকার করে, যেন ইহাই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব, যেন ইহাই তাহাদের সহজ বা নৈসর্গিক জ্ঞান। তবে কেন বিবেক সম্বন্ধে সংসারে এত পার্থক্য দেখা যায়? হিন্দুর নিকট গঙ্গাস্নান মহাপুণ্যদায়ক; কিন্তু খ্রীষ্টানের নিকট গঙ্গাস্নান ও টেম্‌সস্নান উভয়ই এক। মুসলমানের নিকট মক্কাদর্শন মহা পুণ্যদায়ক; কিন্তু খ্রীষ্টানের নিকট মক্কাদর্শন ও বোম্বাইদর্শন উভয়ই এক। বিবেক সম্বন্ধে লোকের কত পার্থক্য দেখ! তোমার বিবেক তোমার নিকট তোমার বিশ্বাসে অভ্রান্ত; কিন্তু তোমার বিবেক আমার নিকট আমার বিশ্বাসে ভ্রান্ত। তবে কেন বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ বলিয়া এত আস্ফালন কর? বেশ জান, ভ্রান্ত ধর্ম্মের ঐ সকল কুসংস্কার ও বুজরুকি উন্নত ও অভ্রান্ত বিজ্ঞানের কাছে আর খাটে না।"

এই প্রকারে উন্নত বিজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিবেকের প্রাধান্য মন্দীভূত করিতে চেষ্টা পায়। তৎপরিবর্ত্তে ইহা উপদেশ দেয়, মানব সামাজিক জীব; সমাজই

তাঁহার জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ; সমাজ ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর নাই; সমাজ ব্যতীত তাঁহার এক মুহূর্ত্ত চলে না; অতএব সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের উপর তাঁহার যাবতীয় হিতাহিত সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করা কর্ত্তব্য এবং চিরদিনই যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র একমাত্র সমাজের মঙ্গলামঙ্গল লইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করে। কিন্তু মূঢ় জনসাধারণ তাহা বুঝিতে পারে না; উহারা কেবল শাস্ত্র ও বিবেকের গৌরব বর্দ্ধন করে। এই মতের প্রকৃত নাম বৈজ্ঞানিক হিতবাদ।

যাহা হউক, ডারউইনপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বরপ্রতিনিধি বিবেককেও এক তুড়িতে উড়াইতে চেষ্টা পান। তাঁহাদের মতে বিবেকরূপ মনের সংস্কারটী বিরুদ্ধপ্রবৃত্তিসংবলিত মন দ্বারা চালিত হইয়া সমাজের হিতাহিত বিবেচনা করিতে বাধ্য হওয়ায় সামাজিক মানবে ইহা ক্রমশঃ স্ফুরিত হয়। ইহা আদৌ তাঁহার নৈসর্গিক সংস্কার নহে। সমাজে বসবাস দরুণ তিনি চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থায় পতিত হইয়া নানাবিষয়ে হিতাহিত বিবেচনা করিতে বাধ্য হন এবং সেই সঙ্গে বিবেকরূপ সংস্কারটী তাঁহার মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়। মাতৃভাষা ও ঈশ্বরজ্ঞানের ন্যায় বিবেকও তাঁহার মনে ক্রমবিকশিত ও ক্রমস্ফুরিত। এখন যেমন তিনি বাল্যকালে অন্যান্য সংস্কারের সহিত হিতাহিত জ্ঞান লাভ করেন, সেইরূপ তাঁহার জাতীয় জীবনের বাল্যকালে অন্যান্য জ্ঞানের সহিত হিতাহিত জ্ঞানও সমাজে উদ্ভূত হয়। বিজ্ঞান বলে, চুরি করা মহাপাপ, তুমি কোথা হইতে শিক্ষা কর? তুমি সমাজে বাস কর বলিয়াই পরের দ্রব্য অপহরণে তাহার অনিষ্ট হয় বুঝিতে পার; এ জন্য তুমি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা কর, চুরি করা মহাপাপ! একটা শঙ্খচিল তোমার হস্ত হইতে একখণ্ড মিষ্টান্ন অম্লানবদনে ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়, উহার মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ হয় না। শঙ্খচিল নিজের উদর পূরণটী ভালরূপ বুঝে; ক্ষুধাতৃপ্তির জন্য ছলপূর্ব্বক বা বলপূর্ব্বক কোন জিনিষ গ্রহণ যে অন্যায়, তাহা উহার বোধ নাই। ভাল! তুমি এ সংসারে শ্রেষ্ঠ ও বিবেকান্বিত জীব! গাভীর যে দুগ্ধে উহার বৎস পরিপুষ্ট হয়, সে দুগ্ধটুকু বলপূর্ব্বক তুমি কেন অপহরণ কর এবং নিজে তাহা পান কর বা স্বসন্তানকে পান করাও? এস্থলে তোমার স্বার্থপর বিবেক তোমায় কি বলে?

এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিজ্ঞান স্পষ্ট উপদেশ দেয় যে, যথার্থতঃ তোমার ধর্ম্মও নাই, অধর্ম্মও নাই, বিবেক একটা কথার কথা মাত্র এবং তোমার আছে কেবল একমাত্র সমাজ। এই সমাজ বশতঃই তোমার যাবতীয় ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান বা হিতাহিতজ্ঞান এবং এই সমাজ বশতঃই তোমার হৃদয়ে তোমার পূজ্যতম বিবেক সমুৎপন্ন ও স্ফুরিত হইয়াছে। আরও দেখ, এক শিক্ষার তারতম্য বশতঃ বিবেকের কত তারতম্য উপস্থিত হয়! যে হিন্দু এখন গোহত্যায় মহাপাপ জ্ঞান করেন, তাঁহারই প্রপিতামহগণ গোমেধ যজ্ঞে গোবধ করিতে শ্লাঘা বোধ করিতেন। যে গ্রীশান এখন ঈশ্বর আরাধনা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তৃপ্ত হন, তাঁহারই প্রপিতামহগণ একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য সক্রেটিসকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অতএব তথাকথিত ঈশ্বরের প্রতিনিধি বিবেকও পরিবর্ত্তনশীল।

এই প্রকারে বিজ্ঞান বিবেক সম্বন্ধে নানা নাস্তিক মত প্রচার করে এবং সেই সঙ্গে উহার গৌরব লাঘব করিতে চেষ্টা পায়। এখন জিজ্ঞাস্য, বিজ্ঞানের এ সকল কথা আমাদের শ্রবণীয় কি না? এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যেমন ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ হউক বা বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কারবশতঃই হউক, এতদ্ব্যতীত আমাদের সংসার অচল, আমাদের অন্য কোন প্রকার গতি নাই; সেইরূপ বিবেক আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ হউক বা বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার হউক, ইহার অনুশাসন ব্যতীত আমাদের সংসার অচল; ইহাই কেবল একমাত্র আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিরূপক এবং ইহারই আদেশ চিরদিন সমভাবে পালনীয়।

ধর্ম্মশাস্ত্র বল, বিবেক বল, বৈজ্ঞানিক হিতবাদ বল, পাপপুণ্য বিচারে বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিরূপণে ইহারা আপাত দর্শনে বিভিন্ন মার্গ হইলেও, বস্তুতঃ ইহারা একই মার্গ। ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিবেকের মূলে বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক মঙ্গলামঙ্গল পূর্ণভাবে নিহিত আছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে, বিবেক ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিরূপক, আর ধর্ম্মশাস্ত্র জাতিগত ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিরূপক। যে স্থলে বিবেক ব্যক্তিবিশেষকে হিতাহিত বিচারে চালিত করে, সে স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্র সমাজস্থ যাবতীয় লোকের বিবেককে এক ছাঁচে ঢালিত করে এবং সকলকে হিতাহিত বিচারে সমভাবে চালিত করে। যেমন সমাজের প্রধান

প্রধান লোকেরা উহার বিবেকস্বরূপ, সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রও জাতীয় বিবেক-স্বরূপ। ইহা দ্বারাই জাতিবিশেষ চিরদিন গঠিত ও চালিত হইয়া থাকে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য,কি প্রকারে জাতিবিশেষ স্বজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া সমাজে বসবাস করত অশেষসুখে কালাতিপাত করিতে পারে; ইহাতেই সমাজের মঙ্গলামঙ্গল স্বতঃ আসিয়া পড়ে। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক হিতবাদের মধ্যেও প্রভেদ অল্প।

অনেকের বিশ্বাস, পাপপুণ্যজ্ঞান আমাদের স্বভাবসিদ্ধ বা সহজাত। উন্নতবিজ্ঞান এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করে। ইহার মতে পাপপুণ্যজ্ঞান বা বিবেক আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার নহে। যাহা নৈসর্গিক জ্ঞান, তাহা সর্ব্বদেশে ও স[illegible]ল সময়ে সমভাবে অনুভূত হয়। বাল্যকালে অন্যান্য সংস্কারের সহিত আমরা পাপপুণ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হই। মানবমস্তিস্কের স্ফূর্ত্তির সহিত জ্ঞানশক্তি যেরূপ স্ফুরিত হয়, অতি শৈশবকাল হইতে বিবিধ বিষয় দর্শন, শ্রবণ ও মনন করিয়া এবং গুরুজনের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ে যে সংস্কার ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়, তদনুসারে সকলের বিবেক গঠিত হইয়া থাকে। এ কারণ বশতঃ পাপপুণ্যজ্ঞান লইয়া সকল সমাজে এত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যাহা সমগ্র মানবসমাজের অনিষ্টকর, তাহা সকল সমাজেই পাপ জ্ঞানে ঘৃণিত এবং যাহা সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণকর ও মঙ্গলদায়ক, তাহা সকল সমাজে সকল সময়ে পুণ্যজ্ঞানে আদৃত। এজন্য চৌর্য্য নরহত্যাদি সমাজের অমঙ্গলকর দুষ্কর্ম্মগুলি সকল দেশে পাপ জ্ঞানে ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হয় এবং পরোপকারাদি সমাজের মঙ্গলকর সংকর্ম্মগুলি সকল দেশে পুণ্য জ্ঞানে আদৃত ও অনুষ্ঠিত হয়। সেইরূপ যাহা সমাজ[illegible]ষের অনিষ্টকর, তাহা সেই সমাজে [illegible]জনক বিবেচিত হয়; যেমন গোহত্যা হিন্দুসমাজে মহাপাতক ব[illegible] ঘৃণি[illegible] হয়। যাহা সমাজবি[illegible]দায়ক, তাহা সেই সমা[illegible] বিবেচিত হয়, যেমন ব্রাহ্মণ ভোজন ভারতে মহাপুণ্যদায়ক এবং পাদরীপালন খ্রীষ্টজগতে মহাপুণ্যদায়ক।

হৃদয়ে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সমাবেশ হওয়ায় মান[illegible] স্বার্থ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য সদা ব্যগ্র হন; কিন্তু ইহার অযথা চরিতার্থতায় সমাজের প্রভূত অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা হইয়া থাকে। তুমি সমাজে গণ্য হইয়াও নগণ্য।

তোমার নিজের সুখ তোমার অধিক প্রিয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদি অপরের অনিষ্ট সাধন হয়, সমাজের খাতিরে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার উচিত নয়। আবার তোমার একাকীর অনিষ্ট তোমার নিকট বিশেষ কষ্টদায়ক হইলেও, তাহাতে সাধারণ সমাজের কোনরূপ অনিষ্ট নাই। কিন্তু যাহা সমগ্র সমাজের অনিষ্টদায়ক, তাহাতে তোমার যেরূপ অনিষ্ট, অপরেরও সেইরূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব লোকবিশেষের ইষ্টানিষ্টের প্রতি তাদৃশ লক্ষ্যপাত করা উচিত নয়। পরন্তু যাহা সাধারণ সমাজের অপকারক বা উপকারক, তাহার প্রতি সকলের সর্ব্বতোভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত।

এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, যাহা সমাজের মঙ্গল, তাহাই পুণ্য বা ধর্ম্ম এবং যাহা সমাজের অমঙ্গল, তাহাই পাপ বা অধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত পাপপুণ্যের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে না।

যদি বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট সমাজের হিতাহিতই ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পাপপুণ্য হয়, ইহাতে কি মানবধর্ম্মের প্রকৃত অবমাননা করা হয় না? কোথায় ধর্ম্মের মতে পাপপুণ্য অবিনাশী আত্মার অবিনাশী ভাব ও অনন্তকালের জন্য উহার চিরসঞ্চয়? না কোথায় ইহারা বিজ্ঞানের মতে মানবমনের ঐহিক ক্ষণস্থায়ী সামাজিক ভাব মাত্র? বিজ্ঞানের মতকে সম্যক বিশ্লিষ্ট করিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে ইহার মতে পাপপুণ্যের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, ইহারা ধর্ম্মের বুজরুকি মাত্র; সমাজের মঙ্গলের জন্যই মানবধর্ম্ম সকল দেশে সামাজিক-হিতাহিতকে পাপপুণ্য নামে অভিহিত করে, যাহাতে দেশের জনসাধারণ সমাজের অনিষ্টদায়ক কর্ম্মগুলি স্বতঃ পরিত্যাগ করতঃ ইহার ইষ্টদায়ক কর্ম্মগুলি সম্পাদন পূর্ব্বক ইহার ক্রমোন্নতি সাধনে ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনে স্বতঃ প্রোৎসাহিত ও যত্নবান হয়। এ স্থলে আমাদের বুঝা উচিত, ধর্ম্মের পাপপুণ্যজ্ঞান ও বিজ্ঞানের হিতাহিতজ্ঞান, এতদুভয়ের ভিতর পার্থক্য বিস্তর। একটী কেবলমাত্র এই পাপতাপপূর্ণ ইহ সংসারের কথা, অপরটী অনন্তকালের কথা; একটী ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনের ক্ষণস্থায়ী কথা, অপরটী অবিনশ্বর আত্মার অবিনশ্বর কথা। আরও বিজ্ঞান যেরূপভাবে মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, তাহাতে জনসাধারণের কিছুমাত্র উপকার হইবার

সম্ভাবনা নাই ; সে উপদেশ অনেকস্থলে ব্যর্থ ও কথামাত্রায় পর্য্যবসিত। কে বল সমাজের খাতিরে, পরের খাতিরে ঐ সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে অভিলাষী হন ? বিজ্ঞানের হিতবাদ বাক্যালঙ্কারে ও বাগাড়ম্বরে শোভা পায় কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

যাহা হউক, যে জড়বাদী, স্থূলদর্শী জড়বিজ্ঞান ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক কিছুই মানে না, সে বিজ্ঞান যে পাপপুণ্যের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের ঐরূপ সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ অর্থ করিয়া আমাদের মনে ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত করিতে চেষ্টা পাইবে, তাহাতে ইহার কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। এস্থলে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের স্তোকবাক্যে কর্ণপাত না করাই আমাদের উচিত এবং একমাত্র অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কথাই গ্রাহ্য।

এখন জিজ্ঞাস্য, পাপপুণ্য এ সংসারে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইল ? খ্রীষ্টধর্ম্ম উপদেশ দেয়, সয়তান স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইবার পর ঈশ্বরের উপর প্রকুপিত হইয়া তাঁহার নবসৃষ্টি ধ্বংস করিবার মানসে আদি মানব আদম ও তাঁহার স্ত্রী ঈভকে নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদনে প্রলোভিত করে এবং এই প্রকারে সমগ্র মানবজাতির পতন আনয়ন করে। এই পতন বশতঃ করুণাময় ঈশ্বরের শান্তিরাজ্যে অশেষ পাপতাপ প্রবিষ্ট হয় এবং মানবও মৃত্যুমুখে পতিত হন। অধ্যাত্মবিজ্ঞান খ্রীষ্টমতের কিয়দংশ সমর্থন পূর্ব্বক উপদেশ দেয়, যৎকালে যুগধর্ম্মে স্ত্রীজাতি উৎপন্ন হইয়া অযোনিসম্ভব দেবরূপী মানব আধুনিক যোনি সম্ভব মানবে পরিণত হন, তৎকালে তদীয় হৃদয়ে জ্ঞানশক্তি ক্রমস্ফুরিত হইতে আরম্ভ হয়। এই জ্ঞানশক্তির স্ফূর্ত্তির সহিত তাঁহার আধ্যাত্মিকতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং তিনি পতিত হইয়া সংসারের পাপতাপে জড়িত ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্ঞানশক্তি স্ফূর্ত্তির সহিত তিনি অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকিতে এবং বস্ত্র দ্বারা নিজের লজ্জা নিবারণ করিতে শিক্ষা করেন। এই অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকায় তিনি প্রকৃতিদেবীর কোপানলে পতিত ও তৎকর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে ক্লেশিত ও প্রপীড়িত হন। আধুনিক উন্নতবিজ্ঞানও স্বীকার করে, জ্ঞানশক্তির স্ফূর্ত্তির সহিত মানব অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকায় তিনি রোগ শোকে প্রপীড়িত হন ; কিন্তু ইহা প্রকাশ্যভাবে খ্রীষ্টমতের খণ্ডন করে এবং উহাকে সামান্য উপকথা বলিয়া উড়ায় ! ইহার মতে মানবসমাজের অবস্থা ও

গঠনপদ্ধতি যেরূপ এবং মানবহৃদয়ে বিরুদ্ধপ্রবৃত্তির যেরূপ সমাবেশ, তাহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ সমাজের হিতাহিত বা সংসারের ধর্ম্মাধর্ম্ম উত্থিত হইয়াছে। এখন যদি বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন মানবের প্রকৃতি ঐরূপ হইল, যাহাতে তিনি স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া অনুক্ষণ স্বার্থ ও পরার্থের সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং সকল সময়ে সমাজের হিতাহিত সাধনে প্রবৃত্ত হন? কিন্তু এ কথায় বিজ্ঞান প্রায় নিরুত্তর।

এখন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এ বিষয়ে কিরূপ স্বর্গীয় ও মহোচ্চ মতামত প্রকাশ করে, তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ইহার মতে সংসারের যাবতীয় পাপপুণ্য ও সুখদুঃখ একমাত্র মায়ার ত্রিগুণ হইতে উদ্ভূত। এই মায়ার ত্রিগুণই জীবাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে অনন্তকালের জন্য চালিত করে। এই মায়ার এমনি গুণ, জীবাত্মা যখন যে লোকে পরিভ্রমণ করে, তখন ইহা সেই লোকের মায়াজন্য অবস্থায় পতিত হইয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করে ও নূতন কর্ম্মফল অর্জ্জন করে। জীবাত্মার কর্ম্মফল ভোগের জন্য মায়ার ত্রিগুণ জগতে [illegible] বৈচিত্র্য ও বৈষম্য আনয়ন করতঃ ইহাকে নানা অবস্থায় নিক্ষেপ করে। এই [illegible] প্রত্যেক লোকে জীবাত্মা নানা মায়াজন্য অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়া ইহার কর্ম্মফল ভোগ করে। কর্ম্ম ফলই জীবাত্মার চিরসহচর। ইহারই জন্য জীবাত্মা জন্মে জন্মে কর্ম্মদেহ লাভ করে। কর্ম্মফলই ইহাকে অনন্তকাল পরিচালিত করে। এমন কি, কর্ম্ম ফলের অস্তিত্বে ইহার অস্তিত্ব ও বিশেষত্ব এবং যে দিন ইহার কর্ম্মফল লয়প্রাপ্ত হয়, সেই দি[illegible] ইহা [illegible]রিকণার ন্যায় পরব্রহ্মরূপ মহার্ণবে লীন হয়। জীবাত্মার কর্ম্মফলই ইহার পাপপুণ্যের সমষ্টি।

সংসারের নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইয়া জীবা[illegible] যে সকল কর্ম্ম দ্বারা ইহলোকে সাত্ত্বিকভাব ও সাত্ত্বিকসুখ এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়, যদ্দ্বারা ইহা অনন্ত উন্নতির পথে ধাবমান হইয়া উৎকৃষ্ট লোকের উপযোগী হয়, তাহাই ইহার পুণ্যকর্ম্ম এবং যদ্দ্বারা ইহা তামসিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে অশেষ দুঃখ ভোগ করে ও পরলোকে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, তাহাই ইহার পাপকর্ম্ম। যদ্দ্বারা ইহা সংসারে আত্মপ্রসাদরূপ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করতঃ দেবতুল্য হয় এবং মৃত্যুর পর দেবত্বে পরিণত হয়, তাহাই ইহার পুণ্যকর্ম্ম এবং

যদ্দ্বারা ইহা আত্মগ্লানিরূপ নরকাগ্নিতেদগ্ধ হইয়া পশুতুল্য হয় এবং অন্তে নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাই ইহার পাপকর্ম্ম।

এখন হৃদয়স্থ বিবেক ইহলোকে জ্ঞানশক্তির স্ফূর্ত্তির সহিত ক্রমবিকশিত হউক বা নৈসর্গিক সংস্কার হউক এবং হৃদয়ে যতই কেন স্বার্থ প্রবৃত্তি ও পরার্থ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ সমাবেশ হউক না, তাহাতে জীবাত্মার পাপপুণ্য জ্ঞানের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হয় না। মায়ার ত্রিগুণ ইহার মায়াজন্য অবস্থা যেরূপ স্থিরীকৃত করে, ইহাও তদনুসারে সকল লোকে চালিত হয়। ইহলোকে ইহার মায়াজন্য অবস্থা এখন এইরূপ স্থিরীকৃত যে, মানব সমাজে বনবাস করায় বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির দাস, তাঁহার জ্ঞানশক্তির স্ফূর্ত্তির সহিত তাঁহার জীবাত্মা ও পাপ-পুণ্যজ্ঞান ক্রমস্ফুরিত। অতএব যে জড়বাদী বিজ্ঞান বিবেক বা পাপপুণ্যজ্ঞান বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার বলিয়া সাহঙ্কারে মানবধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করে, সে বিজ্ঞান কতদূর ভ্রান্ত এবং তদ্দ্বারা আমরা কতদূর বিপথে চালিত হই!

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান গৌরব এই যে, পাপপুণ্য নির্দ্দেশে ইহার প্রসর একদিকে যেমন বহুপ্রসারিত, অপরদিকে ইহা তেমনি অতীব সূক্ষ্ম। যে সকল কর্ম্ম সমাজ, শরীর, মন ও জীবাত্মার পরম কল্যাণকর ও অশেষ মঙ্গল-দায়ক, তাহাই এ ধর্ম্মের মতে পুণ্যকর্ম্ম; আর যাহা উহাদের প্রকৃত অ- কারক, তাহাই পাপকর্ম্ম। যেমন দেহপিঞ্জরনিবদ্ধ জীবাত্মা যুগধর্ম্মে জড়দেহের সহিত জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই দৃশ্যমান বাহ্যজগতের সহিত বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সেইরূপ এ ধর্ম্মও এ সকল সম্বন্ধ বিশদরূপে প্রকাশ করতঃ উহাদের দ্বারা জীবাত্মার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা কিরূপে কথঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি পায়, তজ্জন্য ইহা বিশেষ প্রয়াসী। ইহারই জন্য এ ধর্ম্ম তোমার সামাজিক, পারিবারিক, শারীরিক ও মানসিক যাবতীয় কর্ম্মগুলি তোমার অশেষ মঙ্গলের জন্য সুচারু-রূপে চালায় এবং উহাদের উপর পাপপুণ্যের অনুশাসন দিয়া জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত করে ও বিবেককেও তদনুরূপ গঠিত করে। একদেশদর্শী খ্রীষ্টাদি ধর্ম্মে ঐ সকল দেখা যায় না বলিয়া উহারা যে স্বধর্ম্মের কুসংস্কার, তাহা একবারও মনে ভাবিও না। এস্থলে ধর্ম্মের মহোচ্চ ও স্বর্গীয়-ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সকলের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

দেখ, গঙ্গাস্নানে আমাদের মহাপুণ্য ও গোহত্যায় মহাপাতক। স্বাস্থ্যকর,

আয়ুষ্কর ও অশেষ রোগনাশক স্রোতের জলের অবগাহনে লোকবর্গকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্যই কি গঙ্গাস্নানে এত পুণ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? ক্ষণবিধ্বংসি শরীরের সামান্য উপকারের জন্যই কি গঙ্গামাতা আমাদের পতিতপাবনী? গোহত্যায় সমাজের প্রভূত অমঙ্গল সম্পাদিত হয় বলিয়াই কি উহাতে এত মহাপাতক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? সমাজের সামান্য উপকারের জন্য কি গাভী আমাদের পূজনীয়া মা ভগবতী? ধর্ম্মজগতের নিয়ম এই যে, যাহার যাহাতে অটল বিশ্বাস, তিনি তাহা সম্পাদন করিয়া জীবাত্মাকে পাপপুণ্যের ভাগী করেন এবং মনে আত্মপ্রসাদ বা আত্মগ্লানি প্রাপ্ত হন। অতএব গঙ্গাস্নান করিয়া ধর্ম্মাত্মা হিন্দু অশেষ পুণ্যলাভ করেন এবং গোহত্যা করিয়া বা দর্শন করিয়া নিরয়গামী হন। আর একজন মুসলমান গঙ্গাস্নান করিয়া কিছুই ফল পায় না এবং গোহত্যা করিয়া নিরয়গামী হয় না। কিন্তু সে ব্যক্তি শূকরমাংস স্পর্শ করিয়া নিরয়গামী হয়। যাহা হউক, হিন্দুধর্ম্ম আমাদের নিকট যেরূপ পাপপুণ্য নির্দ্দেশ করে, তাহাই আমাদের নিকট সর্ব্বতোভাবে পালনীয়।

এখন জিজ্ঞাস্য, শাস্ত্র ও বিবেক এতদুভয়ের মধ্যে কাহার আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য? সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় বলেন, এ জগতে বিবেক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ইহারই আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। যিনি বিবেকের অনভিমতে কর্ম্ম করেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রকৃত দোষী হন। যে কোন অসৎ কর্ম্ম কর না কেন, যখন তুমি সেই কর্ম্ম করিয়া নিজ বিবেকের নিকট অপরাধী হও, তখনই তুমি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়া যথার্থ পাপপঙ্কে লিপ্ত হও। অতএব বিবেকাদেশই একমাত্র পালনীয়। দেখা যায়, যে সমাজে এক প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত, তথায় শাস্ত্র ও বিবেকের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই, কারণ একই শাস্ত্র সমাজস্থ যাবতীয় লোকের বিবেক গঠিত করে। ইহারই জন্য মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইবার পর, উহারা পূর্ব্বতন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ দগ্ধ করতঃ নিজ নিজ শাস্ত্র প্রচার করে। যে সমাজে ভিন্ন মতাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র প্রচলিত, তথায় শাস্ত্রবিশেষ ও বিবেকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং সমাজস্থ লোকের বিবেক শিক্ষানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এমন স্থলে যে শাস্ত্রপাঠে যে ধর্ম্ম তোমার বিবেকসম্মত, তুমি তাহাই গ্রহণ করিয়া আপনার ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ কর।

যদি তুমি কেবল হিন্দুশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ করিতে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তোমার বিবেক গঠিত হইত এবং হিন্দুধর্ম্মেও তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা থাকিত। কিন্তু তুমি এখন ইংরাজি বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও ইংরাজি ভাবে আকণ্ঠ পরিপূরিত, হিন্দুয়ানিও তোমার চক্ষুঃশূল। এখন তুমি একেশ্বরবাদের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝ, হিন্দুধর্ম্মও তোমার নিকট অসার পৌত্তলিকতা মাত্র।

যে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত হওয়ায় লোকবর্গের বিবেক বিভিন্নরূপে পরিচালিত হয়, সে সমাজে যদি জনসাধারণ স্ব স্ব বিবেকের অভিমতে কাজ করে, তথায় যথেচ্ছাচারিতা অনায়াসে প্রশ্রয় পায়। যথেচ্ছাচারিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজমাত্রেরই অনিষ্টকারক। যে সমাজে যথেচ্ছাচারিতা যত অধিক প্রবল, সে সমাজ তত অধিক ক্ষীণবীর্য্য এবং অল্পকারণে ধ্বংস পাইবার ইহার তত অধিক সম্ভাবনা হইয়া থাকে। অতএব যে বিবেক লোককে যথেচ্ছাচারী করিতে পারে, উহার আদেশ স্থলবিশেষে লঙ্ঘন করা উচিত, আর যে ধর্ম্মশাস্ত্র সমাজস্থ যাবতীয় লোককে এক পথের পথিক করে ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করে, উহার আদেশ সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে পালন করা বিধেয়। সমাজের সঙ্গে তোমায় জীবনের সুখ দুঃখ অপরিহার্য্যরূপে জড়িত; অতএব স্বসমাজের সাধারণ ও বৈশেষিক ধর্ম্মনিয়ম যথাবিধি পালন করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। যদি তুমি স্ববিবেকাভিমতে চালিত হইয়া যথেচ্ছাচারী হও এবং সমাজের কোন নিয়ম উল্লঙ্ঘন কর, প্রকৃতপক্ষে তুমি স্বসমাজদ্রোহী হও। চৌর্য্য নরহত্যাদি করিলেই যে তুমি কেবল সমাজদ্রোহী হও, এমন নহে; কিন্তু সমাজনির্দ্দিষ্ট কোন বৈশেষিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলেও, তুমি প্রকৃত সমাজদ্রোহী। নিজের বিকৃত বিবেকের অভিমতে যদি কেহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ বিধবা বিবাহ করেন বা করান, তিনি হিন্দুসমাজদ্রোহী হন। সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রাদেশ পালন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

> যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ
> ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং।
> তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ
> জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।

(গীতা।)

"যিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারী হন, তিনি ইহজীবনে সিদ্ধি লাভ করেন না, সুখীও হন না এবং অন্তে উৎকৃষ্ট গতিও প্রাপ্ত হন না। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার একমাত্র প্রমাণ এবং শাস্ত্রোক্ত সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অবগত হইয়া যথাবিধি উহাদের পালন করা উচিত।" শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে যে অমৃতময় উপদেশ নিঃসৃত, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া সকলের একান্ত কর্ত্তব্য।

সমাজে অধিবাসের সঙ্গে মানবহৃদয়ে যশোলিপ্সা ক্রমশঃ স্ফুরিত। তুমি যে সমাজভুক্ত, সে সমাজের লোকেরা তোমার কীদৃশ সুখ্যাতি বা অখ্যাতি করে, তচ্ছ্রবণার্থ তুমি সদা স্বতই ব্যগ্র হও; এজন্য মানসম্ভ্রম চিরদিন সকলের এত প্রিয় এবং মানসম্ভ্রম রক্ষার্থ সকলে এত যত্নবান। যখন তুমি সমাজের কোন মঙ্গলদায়ক কর্ম্ম কর, যেমন লোকে তোমার সুখ্যাতি করিতে থাকে, তুমিও তেমনি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে সৎকর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদ লাভ কর। যখন তুমি সমাজের কোন অমঙ্গল সাধন কর, যেমন লোকে তোমার অপযশ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করে, তুমিও তেমনি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হও। আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানি বিবেক হইতে উত্থিত। একটী পুণ্যকর্ম্মের সমুচিত পুরস্কার, আর অপরটী পাপকর্ম্মের গুরুতর দণ্ড। স্থলবিশেষে ধর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদের সহিত লোকের যশাযশের বিরোধ উপস্থিত হয়। যদি তুমি ধর্ম্মের খাতিরে, সত্যের খাতিরে স্ব ও ভুর বিপক্ষে যথার্থ সাক্ষ্য দেও, লোকে তোমার অপযশ গাইতে পারে; কিন্তু তুমি ধর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদলাভ করিয়া চরিতার্থ হও। যদি তুমি বিকৃত বিবেকের অভিমতে স্বধর্ম্মকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করতঃ অন্যধর্ম্মে দীক্ষিত হও, গ্রামস্থ লোকে তোমার অপযশ গায় বটে; কিন্তু তুমি স্ববিবেকের নিকট অপরাধী হও না এবং তজ্জন্য আত্মগ্লানিতেও দগ্ধ হও না। আবার পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মাচরণ করায় আত্মপ্রসাদ পদে পদে লাভ করা যায়; কিন্তু পুনঃ পুনঃ অধর্ম্মাচরণে আত্মগ্লানি আদৌ অনুভূত হয় না এবং অভ্যাসবশতঃ মনও প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া যায়। যে দুর্ব্বৃত্ত পাপাত্মা কসাই প্রথম গোহত্যা করে, তাহার মনে আত্মগ্লানি অনুভূত হয়; পরে প্রত্যহ গোহত্যা করায় তাহার মন প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া যায় এবং সে পাপিষ্ঠও স্বচ্ছন্দে সহস্র সহস্র গোবধ করে ও গোমাংস ভক্ষণ করে;

পরিশেষে যখন স্বীয় হস্ত দুখানি কুষ্ঠে গলিত হয়, তখনই সে ব্যক্তি নিজকৃত পাপ ভালরূপ বুঝিতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য, পাপকর্ম্মের ন্যায় পাপানুচিন্তনে তাদৃশ পাপস্পর্শ হয় কি না? পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মা যে ঘোর পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। যখন পাপকর্ম্মের দ্বারা সমাজের অমঙ্গল সাধিত হয়, এবং কোন না কোন লোক বিশেষরূপ ক্লেশিত ও প্রপীড়িত হয়, তখন নিশ্চয়ই পাপকর্ম্ম দ্বারা আত্মা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়। কিন্তু পাপানুচিন্তন দ্বারা সমাজের কোনরূপ অমঙ্গল সাধিত হয় না; কেবল মাত্র অনুচিন্তনকারীর মন তদ্দ্বারা ক্রমশঃ বিকৃত ও কলুষিত হয় এবং পাপানুষ্ঠানের পথ ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হয়; তবে পাপানুচিন্তন কি প্রকারে তাদৃশ পাপ হইতে পারে? যখন কোন লোক বিরলে বসিয়া পাপানুচিন্তন করেন এবং তদ্বিষয়ে মনে মনে নানা আন্দোলন করেন, অন্তর্যামী ঈশ্বর, না হয়, সে বিষয় অবগত হন; কিন্তু যখন সুযোগের অভাবে সে ব্যক্তি সেই চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না, তখন তিনি কি প্রকারে সেই পাপচিন্তা করিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হন?

যথার্থ বলিতে কি; পাপানুচিন্তন দ্বারাই আত্মা যথার্থরূপে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়। কোন পাপকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে, পরে বা তৎকালে তদ্বিষয়ক যে চিন্তারাশি মনোমধ্যে উদয় হয়, তদ্দ্বারাই আত্মা যথার্থরূপ কলুষিত ও পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়। কুচিন্তার কালিমা জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশে সংলগ্ন থাকে। পাপকর্ম্মের ফলাফল এই বাহ্য স্থূলজগতে অনুভূত হয়; কিন্তু পাপানুচিন্তনের ফলাফল সূক্ষ্ম বা অধ্যাত্মজগতে অনুভূত হয়। পাপকর্ম্মের ঘাত ও প্রতিঘাত স্থূল জগতে অভিব্যাপ্ত হয় মাত্র, কিন্তু পাপানুচিন্তনের ঘাত ও প্রতিঘাত সূক্ষ্মজগতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

ফটোগ্রাফী লোকবিশেষের সামান্য ছায়া লইয়া রাসায়নিক দ্রব্যসংযোগে তাহার প্রতিকৃতি চিত্রফলকে মুদ্রিত করে। সেইরূপ মানবহৃদয়ে যে সকল চিন্তা উদয় হয়, তাহাও সূক্ষ্মজগতের আকাশপটে অঙ্কিত হয়। সত্য বটে, ঐ সকল চিন্তা হৃদয়ে বিলীন হয় এবং মস্তিষ্কে উহাদের কোনরূপ স্থায়ী-চিহ্ন না থাকায় উহারা স্মৃতিপথে পতিত হয় না; কিন্তু উহারা অনন্তকালের জন্য সূক্ষ্মজগতে প্রতিফলিত ও অঙ্কিত হইয়া যায়। যে দৃশ্য নয়নপথে এক-

বার পতিত হয়, উহারই অঙ্কন বা ছাপ আমাদের মস্তিষ্কে যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে। মানবমন অসম্পূর্ণ বলিয়া চিন্তার কোন স্থায়ীচিহ্ন উহাতে থাকে না। কিন্তু যাঁহার মন যোগবলে বলীয়ান ও যিনি অতীন্দ্রিয়জ্ঞানবিশিষ্ট, তিনি এক জন সামান্য লোককে সন্দর্শন করিয়া তাহার মনের কথা বলিয়া দেন। এ স্থলে উহার মনে যে সকল চিন্তা উদয় হয়, তাহা আবার ঐ যোগী... কাশে প্রতিফলিত বা অঙ্কিত হয়; সে জন্য তিনি তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারেন। অতএব ইহ একপ্রকার প্রমাণসিদ্ধ, মানবমনের চিন্তারাশি সূক্ষ্মজগতে চিরাঙ্কিত হয় এবং পাপানুচিন্তন দ্বারা জীবাত্মা নিশ্চয়ই ঘোর পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হয়।

হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্মরাজ যমের যে চিত্রগুপ্ত লেখক যাবতীয় লোকের পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখেন, ইনিই বা কে? তিনি সকল বিষয় গোপনে চিত্রিত বা অঙ্কিত করেন, এ জন্য তাঁহার নাম শাস্ত্রে "চিত্রগুপ্ত।" এখন এ কাজে এক জন দেবতা নিযুক্ত, কি লক্ষ লক্ষ দেবতা নিযুক্ত, তাহা "ন দেবা জানন্তি কুতো মানবাঃ।" কর্ম্মফল ভোগের জন্য জীবাত্মা নানালোকে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ সুখ দুঃখের ভাগী হয়; সে কর্ম্মফল কোন্ কোন্ দেবতা বিধান করেন, আমাদের সুখ দুঃখের প্রকৃত বিধাতা কে, তাহা যদি আমরা জানিতে পারি, আমাদের আর ভাবনা কি? এখন আমরা অবোধ মনকে বুঝাই, যে এক ঈশ্বর এ সকল বিধান করেন এবং সকল বালাই ঈশ্বর বেচারীর স্কন্ধে অর্পণ করিয়া এখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

স্থূলজগতে কোটী কোটী মানববৃন্দ ও জীববৃন্দ আমাদের দর্শনপথে অনুক্ষণ পতিত হয়। কিন্তু অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মজগতে যে কত কত দেববৃন্দ বর্ত্তমান, তাহা আমরা অবগত নহি। ইহা সুনিশ্চিত, স্থূলজগতের সহিত সূক্ষ্ম-জগতের এত অধিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, উভয়েই উভয়ের ঘাত প্রতিঘাতে সম্পূর্ণ্যমান ও সঞ্চাল্যমান। যাহা স্থূলজগতে সংঘটিত হয়, তাহাও সূক্ষ্মজগতে তৎক্ষণাৎ প্রতিফলিত হয় এবং যাহা সূক্ষ্মজগতে আন্দোলিত হয়, তাহাও ক্রমশঃ স্থূলজগতে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং পাপকর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত যে কেবল স্থূল-জগতে নিবদ্ধ, তাহা নহে, কিন্তু উহা সূক্ষ্মজগতেও বিস্তারিত হয়। সেইরূপ যাহা সূক্ষ্মজগতে ক্ষোভিত হয়, তাহা ক্রমশঃ স্থূলজগতেও বিস্তারিত হয়। অতএব

পাপকর্ম্ম কর বা পাপানুচিন্তন কর, উভয়েই তুমি সমভাবে পাপী হও এবং সকল দেশের মানবধর্ম্ম তোমায় ঐরূপ উপদেশ দিয়া থাকে।

ধর্ম্মাধর্ম্মের বা পাপপুণ্যের বিচার অনেক সময় সুকঠিন হয়। যে পৃথিবীতে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রবৃত্তিগুলি মানবহৃদয়ে অনুক্ষণ উত্থিত, যে পৃথিবীতে স্বার্থে ও পরার্থে অবিরত সংঘর্ষ উপস্থিত, যে পৃথিবীতে সত্ত্বরজস্তম প্রকৃতির এই ত্রিগুণ সকল পদার্থে জাজ্বল্যমান, যে পৃথিবীতে নানাশাস্ত্র রচিত হইয়া নানা মুনির নানামত প্রচলিত, সে পৃথিবীতে ধর্ম্মাধর্ম্মের গতি অনেক স্থলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সে পৃথিবীতে যাহা এক জনের নিকট ধর্ম্ম, তাহা অপরের নিকট অধর্ম্ম, যাহা একজনের নিকট মহাপুণ্য, তাহা হয়ত অপরের নিকট মহাপাতক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নরহত্যা, আত্মহত্যা ও লুণ্ঠন এক স্থলে মহাপাপ, অন্য স্থলে ইহারা মহাপুণ্য। প্রত্যেক কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও ফলাফল দেখিয়া উহার গুণাগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য। যে কর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য সমাজবিশেষের মঙ্গলসাধন বা যদ্দ্বারা সমাজবিশেষের মঙ্গল সাধিত, সে কর্ম্ম সে সমাজে প্রশস্ত, যশস্কর ও পুণ্যদায়ক। যে কর্ম্ম দ্বারা সমাজবিশেষের অমঙ্গল সাধিত, সে কর্ম্ম সে সমাজে গর্হিত, অযশস্কর ও পাপজনক। তুমি স্বসমাজস্থ কোন ব্যক্তিকে ক্রোধপরবশ হইয়া বা কোন দুরভিসন্ধি পূরণার্থ হত্যা কর, তুমি স্বদেশপ্রতিষ্ঠিত রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হও, স্বসমাজে নিন্দনীয় হও এবং স্ববিবেকের নিকট অপরাধী হইয়া ঈশ্বরের নিকট, ধর্ম্মের নিকট মহাপাপী হও। অপরপক্ষে তুমি আত্মরক্ষার্থ আক্রমণকারীর প্রাণ বধ কর, তুমি স্ববিবেকের নিকট অপরাধী হও না কিম্বা সমরক্ষেত্রে স্বদেশ রক্ষার্থ ও অন্যদেশ বিজয়ার্থ তুমি সহস্র নরবধ কর, তোমার স্বজাতীয়েরা তোমার পাদপূজা করে, তুমিও জয়োল্লাসে অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত হও এবং সকলেই তোমার যশোগুণ কীর্ত্তন করে। তুমি সমাজের কোন ব্যক্তিকে লুণ্ঠন কর, তুমি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হও এবং সমাজের লোকবর্গও তোমার উপর খড়্গহস্ত হয়। কিন্তু সৈন্য সামন্ত লইয়া তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হও এবং গ্রামের পর গ্রাম দগ্ধ করিতে করিতে অন্য দেশ লুণ্ঠন কর, তুমি স্বসমাজে বীর বলিয়া পূজিত হও এবং দেশের ইতিহাসও তোমার শৌর্য্যবীর্য্যের অশেষ প্রশংসা জলদক্ষরে ঘোষণা করে। তুমি আত্ম-

হত্যা করিতে যাও, রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হও; কিন্তু সংগ্রামস্থলে অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন কর, তুমি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সশরীরে স্বর্গারোহণ কর এবং জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হও অথবা স্মরণার্থ তোমার প্রতিমূর্ত্তি সোৎসবে ও মহাসমারোহে দেশের মহানগরীতে স্থাপিত হয়।

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, ধর্ম্মের গতি এ সংসারে অতীব সূক্ষ্ম। কিন্তু যাহা তোমার বিবেচনায় ধর্ম্ম, তাহাই তোমার নিকট পুণ্য, আর যাহা তোমার বিবেচনায় অধর্ম্ম, তাহাই তোমার নিকট পাপ এবং তোমার জীবাত্মাও তোমার বিবেকানুযায়ী পাপপুণ্যের ভাগী হয়। যদি তোমার এমন বিশ্বাস হয়, যে গোহত্যায় মহাপাপ, তুমিও গোহত্যা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হও। যদি তোমার এমন বিশ্বাস হয়, ভক্ষণার্থ ছাগ হিংসায় পাপ নাই, তুমিও ভক্ষণার্থ ছাগ হিংসা করিয়া পাপের ভাগী হও না।

পাপপুণ্য বিচারে বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে বিবেক অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ অধিক শিরোধার্য্য হওয়া উচিত। অনেক স্থলে আমরা বিবেক দ্বারা বিপথে চালিত হই। পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ দ্বারা বিবেক হৃদয়ে লোপ পায় এবং তৎকালে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আদৌ থাকে না। স্থলবিশেষে বিবেক অন্ধ হইয়া যায় এবং লোকে বিবেক দ্বারা হিতাহিত বিচারে অসমর্থ হয়। কোন কোন সময়ে লোকে স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া সমাজের অমঙ্গলদায়ক কর্ম্মকেও গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করে না। এই প্রকারে একমাত্র বিবেক দ্বারা চালিত হইলে অনেক স্থলে সমাজের অমঙ্গল সম্পাদিত হইতে পারে। অতএব পাশ্চাত্যজগৎ বিবেকের যতই কেন প্রশংসা করুক না, বিবেক অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ যে অধিক পালনীয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কলিযুগ বর্দ্ধনের সঙ্গে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি মানবহৃদয়ে এত বলবতী, যে অনেকে উহাদের চরিতার্থতার জন্য শাস্ত্র, বিবেক ও মানাপমান সকলই তুচ্ছ জ্ঞান করে। উহাদের সম্যক শাসনার্থ সমাজে রাজদণ্ডের আবশ্যকতা হয়। তজ্জন্য অতি পুরাকাল হইতে রাজদণ্ডবিধি সকল সমাজে স্থাপিত আছে। চৌর্য্যনরহত্যাদি যে সকল দুষ্কর্ম্ম সমাজের অতীব অনিষ্টকারক, তন্নিবারণার্থ রাজদণ্ড সকল দেশে শারীরিক যন্ত্রণা প্রদানপূর্ব্বক সমাজস্থ যাবতীয় লোককে কঠোরভাবে শাসন করে। ইহারই জন্য বেত্রাঘাত, কারাবাসাদি দণ্ডগুলি বহু

কাল সমাজে প্রচলিত আছে। এস্থলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত, ধর্ম্মনীতি সমাজকে সাত্ত্বিকভাবে শাসন করিতে চায়, আর রাজনীতি উহাকে রাজসিক ও তামসিক ভাবে শাসন করিতে চায়। মনে কর, আমাদের যাবতীয় পাপপুণ্য জ্ঞান মিথ্যা এবং ইহারা কেবলমাত্র সমাজের মঙ্গলামঙ্গল হইতে উত্থিত, তথাচ যে ধর্ম্ম সমাজের হিতাহিতকে পাপপুণ্য নামে অভিহিত করিয়া হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত করে, বিবেককে তদনুসারে গঠিত করে, সকলকে সমাজের মঙ্গলদায়ক কর্ম্মে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করে এবং অমঙ্গলদায়ক কর্ম্ম সম্পাদনে বিনিবৃত্ত করে, সে ধর্ম্ম শারীরিক দণ্ডবিধানকারী রাজনীতি অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ কি? কলিযুগ বর্দ্ধনের সঙ্গে ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা রাজনীতির প্রাধান্য সমাজে বর্দ্ধিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্যসভ্যতার মূলমন্ত্র ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা রাজনীতির প্রাধান্য অধিক। এজন্য পাশ্চাত্যজগতে রাজ্যের শাসকবৃন্দ ধর্ম্মযাজকদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে এত প্রয়াসী হয়।

এদেশেও ধর্ম্মযাজকদিগের বা পুরোহিত ও অধ্যাপকদিগের ক্ষমতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের গুণে তাঁহাদের ক্ষমতা রাজ্যের শাসকবৃন্দ অপেক্ষা অধিক ছিল। হিন্দুরাজন্যবর্গ চিরদিন সমাজের অধিনায়ক ব্রাহ্মণদিগের আদেশ শিরোধার্য্য করেন। তাঁহাদের ক্ষমতা অধিক হওয়ায়, তাঁহারা চিরদিন হিন্দুসমাজকে ধর্ম্মভাবে, সাত্ত্বিকভাবে শাসন করেন। যেমন একদিকে রাজন্যবর্গ রাজদণ্ড প্রদানপূর্ব্বক হিন্দুসমাজকে রাজসিক ও তামসিকভাবে সুশাসন করেন, সেইরূপ অপরদিকে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণও যে সকল সামাজিক মঙ্গলজনক বিষয়ে রাজদণ্ড হস্তক্ষেপ করে না, সে সকল বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান দিয়া তাঁহারা স্বসমাজকে সাত্ত্বিকভাবে শাসন করেন এবং স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের প্রভূত মঙ্গলসাধন করেন।

অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মও আত্মগ্লানিকে পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত বলে। কিন্তু অনেকস্থলে পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করাতে বিবেক প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া যায় এবং পাপজনিত গতানুশোচনা হৃদয়ে আদৌ অনুভূত হয় না। সেজন্য পাপের দণ্ডবিধানের জন্য এ ধর্ম্ম কেবলমাত্র আত্মগ্লানির উপর নির্ভর করে না। ইহার মতে আত্মগ্লানি পাপের নিগূঢ় প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। ইহাতে নিরাকারোপাসক খৃষ্টানদিগের মনে তৃপ্তিবোধ হইতে পারে; কিন্তু সাকারো

পাসক ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর মনে তাদৃশ তৃপ্তিবোধ হয় না। সুতরাং অতি পুরাকাল হইতে শাস্ত্রকারেরা সংসারে পাপকর্ম্মের সম্যক শাসনের জন্য নানাবিধ সগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধিবদ্ধ করেন। ঐ সকল উৎকৃষ্ট বিধান অন্যধর্ম্মে দেখা যায় না বলিয়া উহারা যে হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার, তাহা কদাচ মনে ভাবিও না। শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্য অতীব মহোচ্চ। সমাজকে সাত্ত্বিকভাবে শাসন করিবার জন্য এ সকল স্বর্গীয় ও মহোচ্চ বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা ভাবেন, ব্রাহ্মণেরা প্রতারণা পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎ আতপ চাউল ও কাঞ্চন মুদ্রা পাইবার উদ্দেশে এ সকল বিধান দেন, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত বিধানের বিন্দুবিসর্গ বুঝেন না।

যদি তুমি কোন পাপকর্ম্ম করায় আত্মগ্লানি অনুভব কর, তুমি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে স্ববিবেকের নিকট, অন্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হও বটে, কিন্তু সমাজস্থ কোন ব্যক্তি তোমার পাপাচরণ স্বকর্ণে শ্রবণ করেন না এবং তুমিও কাহার নিকট কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হও না। যে স্থলে অসার খ্রীষ্টধর্ম্ম একজন খ্রীষ্টানের পাপকাহিনী কেবলমাত্র ধর্ম্মযাজকের নিকট বর্ণন করাইয়া উহার নিকট তাহাকে কুণ্ঠিত করায় ও স্বসমাজকে ভালরূপ শাসন করিতে পারে না, সেস্থলে তোমার শ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম্ম পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিয়া তোমার পাপকাহিনী সমাজে ঘোষণা করতঃ সকলের নিকট তোমায় যথার্থভাবে কুণ্ঠিত করায় ও তোমার বিস্তর অর্থ ব্যয় করাইয়া তোমায় সে বিষয়ে আরও সতর্ক করায় এবং সেই সঙ্গে সমাজকে ভালরূপ সুশাসন করে। বিবেকানুভূত আত্ম-গ্লানিতে সমাজের শিক্ষোপযোগী কোনরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয় না। কিন্তু ব্যয়বহুল প্রায়শ্চিত্ত বিধান দ্বারা সমাজস্থ যাবতীয় লোক উত্তম দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হয়, তাহাদের উত্তম শিক্ষা হয় এবং তাহারা প্রায়শ্চিত্তকে যেরূপ অন্তরের সহিত ভয় করে, এমন কারাবাসকেও ততদূর ভয় করে না।

ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে পাপাচারীর দণ্ডবিধানের জন্য প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান দেন। রাজনীতির অনুমোদিত বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড, দ্বীপান্তরবাস ও প্রাণদণ্ড কেবল তামসিক অসভ্যোচিত দণ্ড, কিন্তু অস্মদ্দেশপ্রচলিত প্রায়-শ্চিত্তাদি বিধান পাপের সাত্ত্বিক দণ্ড। ইহাতে লোকের যেরূপ শিক্ষা হয়, আজীবন কারাগারে থাকিলেও তাহার শতাংশের একাংশ হইবার সম্ভাবনা

নাই। গোহত্যার জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত বিধিবদ্ধ বলিয়া আমাদের নিকট গোহত্যা চিরদিন মহাপাতক এবং প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি কোন লোক স্বপ্নেও গোহত্যার বিষয় ভাবিতে পারে না। ধন্য ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিকৌশল! ধন্য তোমাদের সমাজতত্ত্বজ্ঞান! সমাজস্থ কোন ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ না করিয়া, দ্বীপান্তর প্রেরণ না করিয়া বা কোন রূপ শারীরিক যন্ত্রণা না দিয়া, তোমরা প্রায়শ্চিত্তাদি প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বসমাজকে যেরূপ সুশাসনে সুশাসিত করিয়াছিলে, সভ্যতাভিমানী, ইউরোপবাসী, রাজনীতিজ্ঞ, দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ স্বসমাজকে কদাচ সেরূপ শাসন করিতে পারেন না। আমাদের জাতীয় জীবনে এমন সুসময় অতীত হইয়াছে, যখন চৌর্য্য প্রতারণা প্রভৃতি অসৎকর্ম্মগুলি হিন্দুসমাজে অশ্রুত ছিল। কেন যবনদূত মেগাস্থেনিস আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরতার এত প্রশংসা করেন? কেন চীনদেশবাসী-তীর্থযাত্রিরা আমাদের এত সুখ্যাতি করেন? হিন্দুধর্ম্মের গুণে, ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণদিগের গুণে হিন্দুসমাজ চিরদিন ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্মপরায়ণ; কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হয়, "তে হি নো দিবসা গতাঃ" হায়! আমাদের সে সকল দিন এখন কোথায়? এই কপট ধর্ম্মযুগে আমরা বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজতন্ত্রের শাসনে এখন কেবল কপট ও পাপাচারী হইতেছি।

এখন বিধর্ম্মী ইংরাজরাজের রাজনীতির সহিত অনেক স্থলে আমাদের চিরন্তন ধর্ম্মনীতির বিরোধ উপস্থিত হয়। আমরাও চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার তীব্র তাড়নায় কপটতা আশ্রয় করিয়া প্রাণে প্রাণে জাতিধর্ম্ম রক্ষা করি। এখন ইংরাজরাজপ্রতিষ্ঠিত বিচারাগারগুলি কেবলমাত্র প্রবঞ্চনা, শঠতা ও মিথ্যা কথনের কেন্দ্রস্থল। তথায় যিনি যতদূর প্রবঞ্চনা ও বাক্‌চাতুর্য্য শিক্ষা করেন, তাঁহার ততোধিক জয়লাভ ও অর্থোপার্জ্জন। এখন আদালতের চক্ষে যিনি যত ধূলি প্রদান করেন, তাঁহার তত সুনাম ও অর্থাগম। যে কৃত্রিম সভ্যতা-সুলভ পাপস্রোতে আমরা এখন বাহ্যমান, তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করা দুর্ব্বল মানবের সাধ্য নয়। কোথায় হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন। তুমিই আমাদের একমাত্র সহায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সুখদুঃখের বিচার।

এ ভবসংসার কেবল সুখদুঃখে পরিপূর্ণ। চক্রবর্ত্তী অধীশ্বর হইতে কৌপিনধারী পথের ভিখারী পর্য্যন্ত সকলের জীবন সুখদুঃখে জড়িত। প্রত্যেক মানব ইহজীবনের কোন না কোন সময়ে সুখার্ণবে ভাসমান হন, বা কোন না কোন সময়ে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হন। এ সংসারে কেহ রাজসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ লোকবর্গকে নিজ পদমূলে রাখিয়া সুখের পর সুখ ভোগ করেন; কেহ বা মুষ্টিমেয় ভিক্ষায় শরীরযাত্রা পালন পূর্ব্বক দুরন্ত শীতকালে চীরবসনাবৃত হইয়া কষ্টের পর কষ্ট বহন করেন। কেহ সুরম্য হর্ম্ম্যে অধ্যুসিত হইয়া বিবিধ সুস্বাদ খাদ্যে উদর পূরণ করতঃ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়নপূর্ব্বক পরমসুখে কালাতিপাত করেন; কেহ বা পর্ণকুঠীরে অবস্থিতিপূর্ব্বক শাকান্নে দগ্ধোদর পূরণকরতঃ স্থণ্ডিলশায়ী হইয়া, কেবল কষ্টের দিন গণনা করেন। কেহ পুত্রকলত্রশোকে জীবন্মৃত হইয়া অগাধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ মানবজীবন অসার ভাবেন; কেহ বা যৎসামান্য কুঠীরে অবস্থিতি পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্রের সহাস্যবদনে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। কেহ অশেষ রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অতুল সম্পত্তির ভিতর আপনাকে হতভাগ্য মনে করেন; কেহ বা স্বাস্থ্যসুখে সুখী হইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের অশেষ কষ্টসত্ত্বেও আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করেন। কেহ ক্রোড়পতি হইয়া পুত্ররত্নে বঞ্চিত হওয়ায় স্বজীবনকে বিড়ম্বনামাত্র ভাবেন; কেহ বা কপর্দ্দকশূন্য হইয়া নবকুমারের মুখারবিন্দদর্শনে অতুল আনন্দনীরে অভিষিক্ত হন। কেহ কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইযা গলদশ্রুলোচনে কপোলদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক দুঃখের দিন দুঃখেই অবসান করেন; কেহ বা মহানগরীর মহাবর্ত্মে বিমানারোহণে সগর্ব্বে মেদিনীমণ্ডল কম্পায়মানপূর্ব্বক বিস্ফারিত হৃদয়ে গমন করেন।

ভবসংসারে সুখের ভাগ অপেক্ষা দুঃখেরই ভাগ অধিক; এমন কি, মানবের সুখরাশি যত অল্প, তাঁহার দুঃখরাশি তত অধিক। যদি সমাজের চতুর্থাংশ লোককে সুখী বিবেচনা করা যায়, ইহার তিনাংশ লোক কেবল দুঃখ-ভারাক্রান্ত। যদি মানবজীবনের চতুর্থাংশ সময় সুখে অতিবাহিত হয়, ইহার তিন চতুর্থাংশ সময়ে কেবল দুঃখের করালছায়া পতিত হয়; সে সময় কেবল শোকের উচ্ছ্বাস, দীর্ঘনিশ্বাস, রোদন, আর হাহাকার ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না। হা হতবিধে! এ সংসার কেন এত দুঃখময় করিলে? তুমি মানবকে কেন এত যন্ত্রণায় প্রপীড়িত কর? কোথায় হে পূজ্যপাদ বুদ্ধদেব! তোমার ন্যায় অনেক সহৃদয় ব্যক্তিও ভবসংসারের অশেষ দুঃখ দর্শনে ব্যথিতচিত্ত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন।

সংসারের যে সকল জ্বালাযন্ত্রণা ও রোগশোক মানবকে অহরহঃ প্রপীড়িত করে, সে সকল নিবারণ করতঃ তাঁহার প্রকৃত সুখ সম্ভাব বৃদ্ধি করিবার মানসে সকল দেশের মনীষিগণ সকল সময়েই সাধ্যমত চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এতদর্থে নানাবিধ নানা উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদের ন্যায় সুখ দুঃখের প্রকৃত রহস্যোদ্ভেদ করা অসম্পূর্ণ মানবের সাধ্যাতীত। যাহা হউক, ভবসংসারের সুখদুঃখের কারণ সম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রচলিত ও যদ্দ্বারা মানবসমাজ চালিত, এখন সে সকল মতামতের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা কর্ত্তব্য।

সকল দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস, জগৎপাতা জগদীশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা এবং তিনিই স্বহস্তে মানবজাতির সুখদুঃখ বিতরণ করেন। যিনি এ সংসারে যেমন কর্ম্ম করেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট তদনুরূপ ফলভোগ করেন। তাহাদের বিশ্বাস, সংসারের সুখদুঃখ কেবল পাপপুণ্যের ফলস্বরূপ; সুখ যেমন পুণ্যের পুরস্কার, দুঃখ তেমনি পাপের দণ্ড স্বরূপ। তোমার মন স্বাধীন ইচ্ছায় বিভূষিত এবং তোমার পুরোভাগে পাপের পথ বিস্তীর্ণ ও পুণ্যের পথও বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। তুমি স্বাধীন ইচ্ছায় চালিত হইয়া যে পথ অনুসরণ কর, ফলও তদনুরূপ পাও। পাপপথ অবলম্বন কর, চিরদিন তুমি দুঃখানলে দগ্ধ হইবে এবং পুণ্যপথ অবলম্বন কর, চিরদিন তুমি সুখসলিলে অভিষিক্ত হইবে।

রোগশোকপরিতাপবন্ধন ব্যসনানি
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্।
(হিতোপদেশ।)

"রোগ, শোক, পরিতাপ, কারাবাস ও বিপদসমূহ সকলই স্বকৃত অপরাধরূপ বৃক্ষের ফল স্বরূপ।"

এখন জিজ্ঞাস্য, ভবসংসারের সুখদুঃখের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা কি উপরোক্ত সহজ নিয়ম দর্শন করি? সকলেই জানেন, এ সংসারে অনেকে কিছুমাত্র পাপকর্ম্ম না করিয়াও চিরদুঃখে দুঃখী; আবার অনেকে কিছুমাত্র পুণ্যকর্ম্ম না করিয়া অনন্তসুখে সুখী। সকলেই জানেন, এ সংসারে অনেকে ধর্ম্মাচরণ করিয়াও অশেষ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হন, আবার অনেকে অশেষ পাপাচরণ করিয়াও পরমসুখে সুখী হন। কলিকালে ধর্ম্মেরই পরাজয় ও অধর্ম্মের জয় দেখা যায়। তবে কেন বল, ধর্ম্ম হইতে সুখ এবং অধর্ম্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়? দেখ, একজন সদ্বংশসম্ভূত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করিয়া কত কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন! আর একজন অধমাধম চর্ম্মকার চর্ম্ম ব্যবসায় দ্বারা কেমন সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে! একজন অগাধ বিদ্যা-বিশারদ ধর্ম্মাত্মা অধ্যাপক যৎসামান্য বসন পরিধানপূর্ব্বক রাজপথে পদব্রজে যাইতে যাইতে কত কষ্ট পান! আর একজন নীচকুলোদ্ভব রজক সুন্দর বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া অশ্বযানারোহণে কেমন সুখে গমন করেন! অতএব সংসারের বৈষয়িক তারতম্যের বা সুখদুঃখের প্রকৃত কারণতত্ত্ব বুঝা ভার।

এই বিষম সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য জনসাধারণ সকল দেশে আবার অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। অদৃষ্ট বা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে, লোকে পরমসুখে কালাতিপাত করে; তৎকালে জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলি তাহাদিগকে কেবল সুখ হইতে সুখান্তরে লইয়া যায়। সেইরূপ অদৃষ্ট বা ভাগ্য কুপিত হইলে, তাহারা সংসারে নানাবিধ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করে; তৎকালে তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাবলি তাহাদের উপর কেবল দুঃখের পর দুঃখ আনয়ন করে। সকলের বিশ্বাস, স্ত্রীরত্ন বল, পুত্ররত্ন বল, ধনসম্পত্তি বল, শরীরের স্বাস্থ্য বল, সমাজে মানসম্ভ্রম বল, সংসারের যে যে বস্তু আমাদের সুখ বর্দ্ধনের জন্য পরিকল্পিত, তৎসমুদায়ই আমরা কেবল অদৃষ্টগুণে লাভ

করি। এক অদৃষ্টই আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখের মূলাধার। আবার এই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা ভবসংসারের ক্লেশরাশি ও বিপদ্‌রাশি নীরবে ও অম্লানবদনে বহন করি। যখন আমরা কোন অপ্রতিকরণীয় বিপদে পতিত হই, তখন কেবল অদৃষ্টকে স্মরণ করিয়া আমরা হৃদয়ের নিভৃত স্থলে রোদন করি। যখন আমরা রোগশোকে জর্জ্জরীভূত হই, তখন আমরা, হা আমার অদৃষ্ট! বলিয়া রোদন করি। যথার্থ বলিতে কি, এই দুঃখময় ভবসংসারে মানবধর্ম্ম যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া মানবের দগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনাবারি অভিসিঞ্চন করে, তন্মধ্যে অদৃষ্টবাদ একটী সর্ব্বপ্রধান উপায়। এই অদৃষ্টবাদই আমাদের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য বর্দ্ধন করে এবং ইহা-রই স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমরা অনেক সময়ে সংসারের শোকদুঃখ অল্পকালের মধ্যে বিস্মৃত হই। রে অদৃষ্টবাদ! তুমিই আমাদের প্রকৃত, বন্ধু! তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমরা অনেক সময়ে ভবার্ণবের নানা ঝঞ্ঝা-বাত উত্তীর্ণ হই। তুমিই ভবার্ণবের উত্তালতরঙ্গ মধ্যে যথার্থ শান্তিতৈল নিক্ষেপ কর।

ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল, দৈব, নিয়তি, বিধিনির্ব্বন্ধ, বিধাতৃবিহিত মার্গ প্রভৃতি সকল কথার তাৎপর্য্য এক। যে সকল ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি আমাদের সুখদুঃখ আনয়ন করে, তাহা আমাদের ভাগে পতিত; অতএব উহাদের সমষ্টি আমাদের ভাগ্য। এ সকল ঘটনাবলি পূর্ব্বে জ্ঞাত হওয়া যায় না বা উহাদের কারণ দৃষ্ট হয় না; অতএব উহাদের সমষ্টি আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের বিশ্বাসে, ইহারা জন্মকালে আমাদের কপালে লিখিত; অতএব ইহাদের সমষ্টি আমাদের কপাল বলিয়া উক্ত। ইহারা চিরদিন সূক্ষ্মজগতস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত; অতএব ইহারা আমাদের দৈব ঘটনা। আজকাল সমাজের আধ্যাত্মিক অধঃপতনবশতঃ দৈবশব্দের অর্থ কথঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ বা হঠাৎ যে ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার নাম দৈব ঘটনা। এই সকল দৈবঘটনা দ্বারা আমরা অপরিহার্য্যরূপে নিয়ন্ত্রিত হই; অতএব ইহারা আমাদের নিয়তি। ইহারা বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত ও স্থিরীকৃত এবং সর্ব্বতোভাবে অখণ্ডনীয়; অতএব ইহারা বিধিনির্ব্বন্ধ বা বিধাতৃবিহিত মার্গ।

অদৃষ্টশব্দের উৎপত্তি যেরূপে হউক না কেন, আমাদের সুখদুঃখ যে কারণে সংঘটিত হউক না কেন, আমরা অদৃষ্টকে আমাদের যাবতীয় সুখ-দুঃখের একমাত্র কারণ বা মূলাধার জ্ঞান করি। যেমন আমাদের অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বসৃষ্টিস্থিতিসংহারের একমাত্র আদিকারণ জগৎপাতা জগদীশ্বর, সেইরূপ আমাদের অন্ধবিশ্বাসে আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখের একমাত্র আদিকারণ অদৃষ্ট। ইহা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যে বিষয়ের কারণপরম্পরার অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হই, মানবমনের প্রকৃত্যনুসারে সে বিষয়ের একমাত্র আদি-কারণে আমরা উপনীত হইতে চেষ্টা করি। এই প্রকার অনুচিন্তন দ্বারা আমাদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায় যে, আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখের একমাত্র আদিকারণ অদৃষ্ট। অনেকের মতে অদৃষ্টবাদ জগতে এইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

মানবের অদৃষ্ট তাঁহার প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারা স্থিরীকৃত ও তাঁহার জন্মলগ্নানু-সারে গ্রহাদির স্থিতি ও সঞ্চার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন প্রকৃতিজগৎ কতকগুলি অপরিবর্ত্তনশীল ও অখণ্ডনীয় ভৌতিক নিয়মাবলি দ্বারা পরিচালিত, সেইরূপ প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক মানবজাতি ও সমগ্র মানবজাতির অদৃষ্ট বা নিয়তি কতকগুলি অখণ্ডনীয় আধিদৈবিক নিয়মাবলি দ্বারা পরিচা[illegible] পাশ্চাত্য জ্ঞানজগতে ভৌতিক নিয়মাবলী কথঞ্চিৎ আবিষ্কৃত [illegible] আধিদৈবিক নিয়মাবলীর কিয়দংশ ফলিত-জ্যোতিষ [illegible]; কিন্তু উভয়ই এখনও আমাদের নিকট প্রকৃত রহস্যময়।

প্রাচ্যজগৎ অদৃষ্টবাদ বা দৈবের পক্ষপাতী; আর পাশ্চা[illegible] ইহার অনাদর করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা বা পুরুষকারের পক্ষপাতী [illegible], দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কে অধিক প্রবল? মানবজীবন দৈব দ্বারা অধিক অনু-শাসিত, না স্বাধীন ইচ্ছা ইহাকে যেভাবে চালায়, ইহাও সেইভাবে চালিত হয়? পাশ্চাত্যজগৎ শিক্ষা দেয়,—

Heaven helps those who help themselves.

Where there is will, there is way.

"যাঁহারা নিজে আপনাদের সাহায্য করেন, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাদের সহায়।"

"যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই পন্থা।"

উদ্যোগীনাং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

(হিতোপদেশ।)

"উদ্যমশীল পুরুষসিংহকে লক্ষ্মী প্রাপ্ত হন; যাহারা সংসারে কাপুরুষ, তাহারাই বলে, দৈবই সমস্ত প্রদান করে। দৈবকে সংহার করিয়া যথাশক্তি নিজ পৌরুষ দেখাও; যত্নপূর্ব্বক কার্য্য করিলে, তাহাতে যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহাতে তোমার কি দোষ?"

যে পাশ্চাত্যজগৎ উদ্যমশীল, অধ্যবসায়ী ও উচ্চাভিলাসী এবং স্বাবলম্বন ও স্বোদ্যমবলে নিজে সুখের পথ, উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লয়, তথায় পুরুষকারের সমাদর না হইয়া কি প্রকারে অদৃষ্টবাদ আদৃত হইতে পারে? তথায় জনসাধারণকে আধিভৌতিক উন্নতিসাধনে সম্যক প্রোৎসাহিত করিবার জন্য স্বাধীন ইচ্ছার এত সমাদর ও অদৃষ্টবাদের এত অনাদর দেখা যায়।

স্বাধীন ইচ্ছা ও দৈব লইয়া আজকাল কৃতবিদ্যসমাজে বিস্তর বাদানুবাদ চলিত। তাঁহারা বলেন, স্বাধীন ইচ্ছা বলবতী না হইলে, আমরা কি প্রকারে পাপপুণ্যের প্রকৃত ভাগী হই? যদি আমরা সকল সময়ে দৈবকর্ত্তৃক অনুশাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হই, তবে আমাদের পাপপুণ্যজ্ঞান কোথায়? দেখ, হিন্দুধর্ম্ম উপদেশ দেয়,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ণ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। (গীতা।)

"হে অর্জ্জুন! যেমন সূত্রধর দারুযন্ত্রে আরূঢ় পুত্তলিগণকে নাচায়, তেমনি ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া নিজ মায়া দ্বারা উহাদিগকে নাচান।"

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

"আমি ধর্ম্ম জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই; আমি অধর্ম্মও জানি, কিন্তু তাহাতে আমার নিবৃত্তি নাই। হে হৃষীকেশ! তুমি আমার হৃদয়দেশে অবস্থান পূর্ব্বক আমায় যেরূপ প্রেরণ কর, আমিও তদনুরূপ কার্য্য করি।"

উপরোক্ত দুইটী শ্লোকপাঠে অনেকে মনে করেন, যখন ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে যেরূপে চালান আমরা সেইরূপে চালিত হয়, তখন তিনিই আমাদিগকে পাপপথে বা পুণ্যপথে লইয়া যান, তবে আমরা কি প্রকারে পাপপুণ্যের জন্য দায়ী? আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা যেরূপ হউক না কেন, যখন আমরা চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাপরম্পরার দাস, তখনই বা আমরা কি প্রকারে নিজ-কৃত পাপপুণ্যের জন্য প্রকৃত দায়ী? যখন আমরা পুরুষকার বলে নিজে সুখের পথ পরিষ্কার করিতে পারি; তখন দৈব বা কি প্রকারে বলবতী? এখন এই বিষম সমস্যাটী কি প্রকারে মীমাংসা করা উচিত? কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রাদেশ কদাচ মিথ্যা হইবার নয়। শাস্ত্রের আদেশ পুরুষকার অপেক্ষা দৈব প্রধান। দৈব প্রসন্ন না হইলে, পুরুষকার আদৌ স্ফূর্ত্তি পায় না এবং আমাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং।" যে পুরুষকার বা অধ্যবসায় বলে তুমি জগতে মহৎ কার্য্য করিতে অভিলাষী, তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন না হইলে, তুমি তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পার না। যে ধীশক্তিবলে তুমি জগতে মহৎ কার্য্য করিবে, সে ধীশক্তি কি প্রকৃতি-দত্ত নয়? তাহাতে কি দৈবের অনুশাসন অধিক নাই? তবে কেন পাশ্চাত্য জগতের কথায় নিজ শাস্ত্র অবহেলা কর? পাশ্চাত্যজগতের নবভাগ্যোদয় বলিয়া আজ তথায় পুরুষকারের এত সমাদর! কিন্তু প্রাচ্যজগতের উপর দৈব এখন ততদূর প্রসন্ন নয়; তজ্জন্য কেবল পুরুষকার বলে তুমি অসাধারণ কার্য্য করিতে পার না এবং তোমার পুরুষকার এখন ততদূর স্ফূর্ত্তি পায় না।

লোকের পার্থিব অবস্থা পুরুষকার বা স্বাধীন ইচ্ছাবলে কথঞ্চিৎ পরি-বর্ত্তিত হইতে পারে বটে; কিন্তু জীবনের সুখদুঃখ অধিক পরিমাণে দৈবাধীন। যে বিবিধ রোগশোক ও জ্বালাযন্ত্রণা দ্বারা, কি রাজাধিরাজ, কি পথের কাঙ্গাল, সকলেই সমভাবে প্রপীড়িত হয়, তাহা সর্ব্বৈব দৈবাধীন। জীবনের

অনেক দৈবঘটনায় স্বাধীন ইচ্ছা পিপীলিকাবৎ দলিত হইয়া যায়। এ জন্য সংসারে যে দৈব বা অদৃষ্টের উপর জীবনের সুখদুঃখ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহাই প্রবল; অথচ পাপপুণ্যের জন্যও আমরা সম্পূর্ণরূপে দায়ী। অদৃষ্ট বা ভাগ্য প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারা স্থিরীকৃত ও গ্রহদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; কিন্তু মানবমন স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেকে বিভূষিত হওয়ায়, ইহা কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্ম্মবীজ রোপণ করে এবং তাহার ফলাফল ইহজন্মে বা ভবিষ্যৎজন্মে ভোগ করে। পূর্ব্বজন্মে বা ইহজন্মে যে সকল কর্ম্ম একবার সম্পাদিত হয়, তাহাদের ফলভোগের জন্য স্বাধীন ইচ্ছার অনুশাসন অনেক সময়ে উল্লঙ্ঘিত হয় বটে; কিন্তু ইহজন্মে বা পরজন্মে যে সকল নূতন নূতন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, উহাদের জন্য স্বাধীন ইচ্ছার অনুশাসন সম্যক্ বলবৎ। অতএব মানবজীবনের সুখদুঃখ দৈব ইচ্ছা ও স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্ঘাতফল; তন্মধ্যে লোকবিশেষের স্বাধীন ইচ্ছা অপেক্ষা দৈব ইচ্ছাই অধিক বলবতী। অগত্যা হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

এখন আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান সুখদুঃখের কারণ সম্বন্ধে কিরূপ নির্দ্দেশ করে, তাহার আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার মতে মানবের অদৃষ্ট আর কিছুই নয়, কেবল অলক্ষনীয় ও অখণ্ডনীয় ঘটনাস্রোত বা অনির্দ্দিষ্ট কারণসমূহ। উহারা আদৌ মানবের বশবর্ত্তী নয়; কিন্তু তিনি উহাদের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী। মানবজীবন ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, সূক্ষ্ম মানবমন স্থূল শরীরের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, শরীরও সেইরূপ বাহ্যজগতের সহিত অশেষরূপে সম্বদ্ধ; আবার সমাজে বসবাস দরুণ মানব যেরূপ পরিজনবর্গের সহিত সম্বদ্ধ, সাধারণ সমাজের সহিতও তিনি সেইরূপ অশেষরূপে সম্বদ্ধ। এই সকল বিবিধ সম্বন্ধের বিবিধ যোগাযোগ হইতে তাঁহার জীবনের বিবিধ সুখদুঃখ সমুৎপন্ন হয় এবং উহাদের যোগাযোগ যেরূপ জটিল হইতে জটিলতর, তাঁহার সুখদুঃখও সেইরূপ চিরদিন জটিলভাবে পরিচালিত হয়। এই সকল সম্বন্ধের বিবিধ যোগাযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করা সকলের সাধ্যাতীত। এ কারণবশতঃ সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখের কারণপরম্পরা আমাদের নিকট চিরদিন প্রকৃত রহস্যময়।

স্বশরীর, স্বপরিবার, স্বসমাজ ও বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যে সকল ঘটনাবলি

স্থলবিশেষে তোমার স্বাধীন ইচ্ছা কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বা তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে পরাস্ত করিয়া সুখদায়ক শুভফল উৎপাদন করে, তাহাই তোমার শুভাদৃষ্ট বা সৌভাগ্য, আর যখন উহারা দুঃখজনক অশুভফল উৎপাদন করে, তখন উহারা তোমার দুরদৃষ্ট বা দুর্ভাগ্য নামে অভিহিত হয়। তুমি স্বাধীন ইচ্ছাসত্ত্বেও স্বকীয় অবস্থার দাস। সংসাররূপ মহাসমুদ্রে চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা-স্রোত তোমায় যে ভাবে চালিত করে, তুমিও সেই ভাবে সদা বাহ্যমান হও; অথচ সকল বিষয়ে স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা চালনা করিবার অবসর তুমি পাও। তোমার জীবনের যাবতীয় সুখদুঃখ এতদুভয়ের সঙ্ঘাতফল। মনে করিলেই যে তুমি স্বাধীন ইচ্ছাবলে স্বীয় সুখের পথ পরিষ্কার করিতে পার, তাহা নহে; কিন্তু এ বিষয়ে চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাস্রোত তোমার উপর অধিক অনুশাসন চালায়। এখন এই সকল বিবিধ সম্বন্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক।

দেখ, শরীর ও মনের সম্বন্ধ কত জটিল! তোমার মনের সুখদুঃখ তোমার শরীরের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের উপর কতদূর নির্ভর করে! প্রত্যেক মানবশরীর এক একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ। ইহার ক্রিয়াপরম্পরা কত জটিলভাবে ও গূঢ়ভাবে সম্পাদিত হয়! এতৎসম্বন্ধে যাহা এখনও অনাবিষ্কৃত, তাহার সহিত তুলনা করিলে বিজ্ঞানকৃত আবিষ্কার যৎসামান্য বলিয়া বোধ হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। যে সকল যান্ত্রিক (Organic) ও ক্রিয়া-ঘটিত (Functional) ব্যাধিসমূহ মানবকে অহরহ দারুণ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা দেয় এবং যাহার জন্য চিরদিন "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং," তাহাদের প্রকৃত কারণতত্ত্ব এখনও নির্ণীত হয় নাই। পর্য্যবেক্ষণাদি বলে বিজ্ঞান কত ব্যাধির কত কীটাণু আবিষ্কার করে এবং তন্নিবারণার্থ কত উপায় উদ্ভাবন করে! কিন্তু চিরদিনই মানব নানা রোগে প্রপীড়িত হন।

মনে কর, এক ব্যক্তি সুখস্বচ্ছন্দে আহারবিহার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অকস্মাৎ একদিন বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি এ পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। এস্থলে জনসাধারণ বলে, দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহার আয়ুঃক্ষয় হওয়ায় তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এ কথা শ্রবণে আধুনিক উন্নতচিকিৎসা-

বিজ্ঞান হাস্য সম্বরণ না করিয়া বলে, যে একটা সামান্য কথার কথা, আয়ুঃক্ষয় লইয়া মূর্খলোকে স্বীয় মনকে প্রবোধ দিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর অনেক বৈজ্ঞানিক কারণ বিদ্যমান। এস্থলে প্রথমতঃ শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ বহির্জ্জগতস্থ বিসূচিকা বিষ বা কীটাণু পানীয়যোগে বা অন্য কোন দুর্লক্ষ্যসূত্রে তদীয় শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং অন্ত্রের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ধাতুগত দৌর্ব্বল্যবশতঃ অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন সত্ত্বেও ঐ রোগ তদীয় শরীরের শোণিত হৃদয়াদি যন্ত্রের এরূপ ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য আনয়ন করিল, যাহাতে তাঁহার প্রাণধারণ অনুপযোগী হওয়ায় সে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এখন যে ধাতুগত দৌর্ব্বল্যের উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞান নানাবিষয়ের কারণ দর্শায়, সে ধাতুগত দৌর্ব্বল্য কোথা হইতে আইসে, তাহা যদি বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করা যায়, সে প্রশ্নের ভালরূপ উত্তর দিতে ইহা অক্ষম। কেন সেই ব্যক্তি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং কেন তিনিই বা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে বিজ্ঞান অসমর্থ। যথার্থ বলিতে কি, প্রত্যেক রোগের প্রকৃত কারণ এখনও নিরূপিত হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদই বল, আধুনিক উন্নতচিকিৎসাবিজ্ঞানই বল, সকলই এ বিষয়ে অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে প্রয়াসী হয় মাত্র।

শরীরের পর, পরিবারবর্গ আমাদের সুখদুঃখ অধিক পরিমাণে পরিচালিত করে। যেমন স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যসম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ও কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট কারণসমূহ শারীরিক প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতঃ আমাদিগকে সুখ দুঃখের ভাগী করে, সেইরূপ পরিজনবর্গ সম্বন্ধেও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ও কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট কারণপরম্পরা আমাদের সুখদুঃখ অনুশাসিত করে। তুমি আত্মগ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যেরূপ চিন্তিত, পরিবারস্থ স্বজনবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সেইরূপ চিন্তিত হও; তুমি নিজ শরীরের রোগের জন্য যেরূপ যন্ত্রণায় অস্থির, স্বজনবর্গের রোগের জন্য চিন্তায় ও মনকষ্টে সেইরূপ অস্থির হও। মানবসমাজের গঠনপদ্ধতি অনুসারে তোমার পুত্রকলত্রাদি তোমার শরীরের অঙ্গীভূত। আত্মশরীরের ন্যায় স্ত্রীপুত্রাদির স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের উপর তোমার মনের সুখদুঃখ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। অপত্যস্নেহ ও স্বপত্নীপ্রেম তোমার হৃদয়ে

বলবৎ বলিয়া তুমি স্ত্রীপুত্রশোকে এত কাতর ও এত বিক্লব হও এবং উহাদের রোগে এত ব্যাকুল হও। যেমন তোমার শরীরধারণ অনেকগুলি অনির্দ্দিষ্ট-কারণসাপেক্ষ, সেইরূপ তোমার পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণও অনেকগুলি অনির্দ্দিষ্ট কারণসাপেক্ষ এবং তোমার স্বাধীন ইচ্ছা যতই প্রবল হউক না কেন, ঐ সকল অনির্দ্দিষ্ট কারণপরম্পরার উপর উহার কিছুমাত্র অনুশাসন চলে না।

মনে কর, তোমার প্রাণসম পুত্র আজ রোগশয্যায় শায়িত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে। তুমিও তাহার যন্ত্রণাবলোকনে অস্থির ও ম্লানবদন হইয়া চিকিৎসকের বাটী ধাবমান হইলে এবং তাঁহাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বাটী আনয়ন করিলে তিনিও যথাসাধ্য রোগের উত্তমরূপ ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে পুত্রের মুখপদ্ম পরিশুষ্ক হইয়া গেল এবং তাহার চক্ষুর্দ্বয় চিরদিনের জন্য নিমীলিত হইয়া গেল। তুমিও তখন অসহ্য পুত্রশোকে কাতর হইয়া হাহাকার করিতে করিতে বক্ষঃস্থলে চপেটাঘাত করিতে করিতে নিজের অদৃষ্টকে সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলে! এ স্থলে তোমার স্বাধীন ইচ্ছা কি করে বল? ইহা পিপীলিকাবৎ দলিত হয় মাত্র। যাহা হউক, পরিবার সম্বন্ধে আমাদের সুখদুঃখ অধিক পরিমাণে অনির্দ্দিষ্টকারণ-সাপেক্ষ, তদ্বিষয়েও কোনরূপ সন্দেহ নাই।

শরীর ও পরিবারের পর সামাজিক বিবিধ সম্বন্ধও তোমার সুখদুঃখ বিধিমতে পরিচালিত করে। তুমি যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সে সমাজের গঠন-পদ্ধতি, রীতিনীতি, আচারব্যবহার ও শাসনতন্ত্র, সকলই তোমার সুখদুঃখ সদা নিয়ন্ত্রিত করে। তুমি যেমন স্বসমাজের সহিত অসংখ্যরূপে সম্বদ্ধ, তোমার সুখ দুঃখও সেইরূপ উহাদের দ্বারা অসংখ্যরূপে পরিচালিত। প্রাকৃতিক নিয়মাবলির ন্যায় সামাজিক নিয়মাবলি তোমার নিকট অখণ্ডনীয় ও বিধিবৎ পালনীয়। এই সকল অখণ্ড্যনিয়মবশতঃ তুমি কখন পরম সুখে সুখী, কখনও বা অশেষ দুঃখে দুঃখী হও। সভ্যজগতের নিয়মানুসারে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তুমি নিজ সুখসম্ভার বর্দ্ধন করিতে চেষ্টা পাও, উহার প্রাচুর্য্যে তুমি আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান কর এবং উহার অভাবে তুমি দারিদ্র্য-দুঃখে পতিত হইয়া সংসারে নানা ক্লেশ পাও। সেইরূপ সমাজবিপ্লব,

রাষ্ট্রবিপ্লব, সংগ্রাম প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক দুর্ঘটনা দ্বারা তোমার সুখদুঃখ অশেষরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের এই সকল অনিবার্য্য নিয়তির সম্মুখে তোমার নিজ মস্তক অবনত করিতে হয়।

আদিম অবস্থায় মানবসমাজ প্রাকৃত অবস্থায় অবস্থিত ছিল। তৎকালে বৈষয়িক তারতম্য বা অন্য কোন প্রকার ভেদাভেদ সমাজে উত্থিত হয় নাই। তৎকালে লোকের সুখদুঃখ সমভাবে বর্ত্তমান ছিল; তাহাদের সুখের ভাগ যেমন অল্প,দুঃখের ভাগও তেমনি অল্প। পরে জ্ঞানোন্নতির সহিত সভ্যতার সূত্রপাত হইলে, সমাজ অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকিতে আরম্ভ করে এবং সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হয়। এই প্রকারে যাবতীয় বৈষয়িক তারতম্য ও নানাবিধ ভেদাভেদ ক্রমশঃ সমাজে উত্থিত হইয়াছে। ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ মানবের সুখদুঃখ এখন অসমভাবে বিভক্ত। ধনবান, মধ্যস্থ ও দরিদ্র, যে তিনশ্রেণীতে সমাজ এখন বিভক্ত, মানব স্বয়ং স্বার্থ প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া উহাদিগকে নিজে প্রবর্ত্তন করেন। যথার্থতঃ দেখা যায় ঈশ্বর বা প্রকৃতিদেবী ইহার জন্য দায়ী নন। স্বোপার্জ্জিত ধন পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিবার জন্য মানব নিজের সুবিধার জন্য নিজে কালক্রমে সমাজের ঐরূপ বিভাগ করিয়া লন। সেইরূপ যে সকল সামাজিক রীতিনীতি ও আচারব্যবহার দ্বারা সকলের সুখদুঃখ অসংখ্যরূপে পরিচালিত,তাহাও মানব নিজের সুবিধার জন্য জ্ঞানোন্নতির সহিত কালক্রমে নিজে সমাজে প্রবর্ত্তন করেন। যথার্থ বলিতে কি, মানব নিজের সুখদুঃখের জন্য নিজে অধিক পরিমাণে দায়ী। তিনি নিজেই সমাজের সমস্ত সুখদুঃখ আনয়ন করেন। তদীয় প্রপিতামহগণ আপনাদের সুবিধার জন্য যে সকল রীতিনীতি প্রবর্ত্তন করেন, উহাদেরই গুণে তাঁহার সুখদুঃখ এখন এমন অসমভাবে বিভক্ত দেখা যায়। এখন কি না তিনি নিজের অদৃষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া নিজ মনকে প্রবোধ দেন বা সমস্ত একেশ্বরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। বিজ্ঞান এইরূপে লোকপ্রখ্যাত অদৃষ্টবাদ ও লৌকিক ঈশ্বরের উপর বিদ্রূপ করে।

শরীর ও সমাজের ন্যায় বাহ্যজগতের বিবিধ সম্বন্ধ দ্বারা মানবের সুখদুঃখ বিধিমতে পরিচালিত হয়। ভূমিকম্প, বন্যা, ঝটিকা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি,

দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা সকলের সুখদুঃখ সদা নিয়ন্ত্রিত করে। যে সকল কারণপরম্পরা হইতে ইহারা সমুত্থিত, উহাদের উপর কাহারও কিছুমাত্র অনুশাসন নাই। এই সকল সার্ব্বভৌম বিপদ-রাশির সম্মুখে, প্রকৃতিজগতের অনিবার্য্য নিয়তির সম্মুখে সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হয়। তুমি এ জগতে নগণ্য, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম দুর্ব্বল জীব। এ সকল দৈবঘটনায় তুমি পিপীলিকাবৎ দলিত হও।

এই প্রকারে আধুনিক উন্নতবিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে যে, শরীর, সমাজ ও বাহ্যজগতের বিবিধ সম্বন্ধবশতই মানবের সুখদুঃখ পদে পদে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন উহাদের সম্বন্ধ অসংখ্য, তাঁহার সুখদুঃখও উহাদের দ্বারা অসংখ্যরূপে পরিচালিত হয়। কখন উহাদের বিশেষ যোগাযোগবশতঃ তিনি সুখভোগ করেন, কখনও বা দুঃখভোগ করেন এবং যতদিন তিনি এ জগতে অবস্থিতি করেন, ততদিন তিনি উপরোক্ত বিবিধ সম্বন্ধবশতঃ বিবিধ সুখ দুঃখের ভাগী হন।

এখন যদি বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করা যায়, সুখদুঃখবিধানকারী ঐ সকল সম্বন্ধের বিবিধ যোগাযোগ কোথা হইতে সংঘটিত হয়? তাহাতে বিজ্ঞান একমাত্র উত্তর দেয় যে, অন্ধ দৈবই (blind chance) ঐ সকল বিবিধ যোগাযোগ আনয়ন পূর্ব্বক সকলের সুখদুঃখ বিধান করে। দেখ, প্রাকৃতিক নিয়মের আদৌ ব্যত্যয় নাই; কিন্তু সামাজিক নিয়মের কতকগুলি তোমার সুবিধামত পরিবর্ত্তিত হইলেও হইতে পারে এবং অপর কতকগুলি একেবারে অপরিবর্ত্তনশীল। প্রকৃতিজগত ও সমাজজগতের বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী উহাদের বিভিন্নরূপ যোগাযোগ একরূপ অপরিহার্য্য। উহাদের বিভিন্ন যোগাযোগ স্বাভাবিক কারণে, সামাজিক কারণে বা দৈববশাৎ সংঘটিত হউক, ঐ সকল বিভিন্ন যোগাযোগবশতই তুমি কখন আনন্দসাগরে ভাসমান হও, কখনও বা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হও।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, বিজ্ঞান উহাদের বিভিন্ন যোগাযোগের যেরূপ কারণ নির্দ্দেশ করে, বাস্তবিক তাহাই কি সত্য? মানবজীবন কি কেবল অন্ধদৈব-কর্তৃক (by mere chance) পরিচালিত হয়? তবে কেন জীবনের সময়-বিশেষে লোকবিশেষ কেবল সুখের পর সুখ ভোগ করেন এবং সময়বিশেষে

তিনি কেবল দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করেন? কেন জগতে "চক্রবৎ পরিভ্রমন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ?" যদি একমাত্র অন্ধদৈবকর্ত্তৃক আমাদের জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলি পরিচালিত হই, তবে আমাদের পাপপুণ্যজ্ঞান সকলই অলীক এবং পাপপুণ্যের সহিত আমাদের জীবনের সুখদুঃখেরও কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিত না। যথার্থ বলিতে কি, এ স্থলে বিজ্ঞান আমাদের সুখদুঃখের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ; কেবল ইহার বাহ্যস্তরটী নির্দ্দেশ করে মাত্র এবং ইহার অন্তঃপ্রবেশ করে না। যে বিজ্ঞান ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও বিবেক কিছুই মানে না, সে বিজ্ঞান যে সুখদুঃখের এরূপ অসম্পূর্ণ কারণ নির্দ্দেশ করিবে, তাহাতে ইহার কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। এখন এ বিষয়ে যথার্থ কারণতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্য, সেই সত্যসনাতন, নিত্যনিরঞ্জন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের শরণ লওয়া উচিত।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মতে জীবের কর্ম্মফলই ইহসংসারে যাবতীয় সুখ-দুঃখের মূলীভূত কারণ এবং সুখদুঃখরূপ বিভিন্ন মায়াজন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীবাত্মা প্রকৃতরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং অনন্ত উন্নতির পথে ধাবমান হয়। এই কর্ম্মফল বিধানের জন্যই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ইহ সংসারে ত্রিগুণের অনন্তলীলা প্রদর্শন করতঃ মানবসমাজে এত বৈষয়িক তারতম্য ও ভেদাভেদ আনয়ন করে এবং সেই সঙ্গে দেহনিবদ্ধ জীবাত্মাকে অনন্ত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করতঃ উহার মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যজগতের বিবিধ সম্বন্ধ তদনুরূপ স্থিরীকৃত করে। এই বিবিধ সম্বন্ধবশতঃ জীবাত্মার বিবিধ সুখ-দুঃখ বোধ এখন এ সংসারে হইয়াছে।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদা
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাংস্তিতিক্ষস্বভারত।

গীতা।

"এই মায়াময় জগতে শীতোষ্ণ ও যাবতীয় সুখদুঃখ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন হয়। ইহারা অনিত্য ও ক্ষণবিধ্বংসী বটে; কিন্তু তুমি ইহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে বাধ্য।"

মানব প্রাকৃত অবস্থায় থাকুন বা অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকুন, তিনি অসভ্যাবস্থায় থাকুন বা সভ্যাবস্থায় থাকুন, তাঁহার কোন অবস্থাটী প্রকৃতির

ত্রিগুণের বহির্ভূত নয়। সকল অবস্থাতেই তিনি প্রকৃতির ত্রিগুণবশতঃ ত্রিবিধ সুখদুঃখের ভাগী হন। তাঁহার ত্রিবিধ সুখদুঃখ এই প্রকার, যথা, (১) আধ্যাত্মিক (২) আধিদৈবিক (৩) আধিভৌতিক বা (১) সাত্বিক (২) রাজসিক (৩) তামসিক। তাঁহার ত্রিবিধ সুখ কি প্রকার ?

যত্তদগ্রে বিষমিব পারিণামেঽমৃতোপমং
তৎসুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং।
বিষয়েন্দ্রিয়যোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমং
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসংস্মৃতং।
যদগ্রে চানুবন্ধেচ সুখং মোহনমাত্মনঃ
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থংতত্তামসমুদাহৃতং।

গীতা।

"যাহা অগ্রে বিষতুল্য, পরিণামে অমৃতোপম, তাহাই সাত্বিক সুখ, যেমন শেষসুখ পরমসুখ,আর আত্মপ্রসাদজনিত ও বিশুদ্ধজ্ঞান-জনিত যে সুখ, তাহাও সাত্বিকসুখ! পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়োপভোগ বশতঃ যে পার্থিব সুখ প্রথমে অমৃতোপম, পরে বিষতুল্য, তাহা রাজসিক সুখ। 'যে সুখ দ্বারা আত্মা প্রথমেই মুগ্ধ হয় এবং যতক্ষণ ঐ সুখ ভোগ করা যায়, ততক্ষণও আত্মা উহা দ্বারা মুগ্ধ থাকে, তাহা তামসিক সুখ, যেমন স্ত্রীসম্ভোগ ও মদ্যপান। নিদ্রা, আলস্যও ভ্রমবশতঃ যে সুখভোগ করা যায়, তাহাও তামসিক সুখ।" সেইরূপ যে দুঃখভোগ দ্বারা জীবাত্মার সাত্বিকভাব স্ফুরিত হয়, তাহা সাত্বিক দুঃখ এবং যদ্দ্বারা ইহার রজোগুণ ও তমোগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা রাজসিক ও তামসিক দুঃখ।

সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখ আত্মার অশেষ মঙ্গলের জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে। দুঃখভোগ না করিলে, সুখ যে কি বস্তু, তাহা বুঝা যায় না এবং দুঃখভোগ না করিলেও জীবাত্মার যথার্থ শিক্ষা ও উন্নতিলাভ হয় না। দুঃখানলে দগ্ধ না হইলে কেহ নিজ শ্রেয় বুঝিতে পারেন না। যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, স্বর্ণ দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্য লাভ করে, সেইরূপ দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াই জীবাত্মা স্বীয় আধ্যাত্মিকতা বা সাত্বিকতা কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়। শোকের হাহাকার, রোদন ও দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে আত্মা যেরূপ শিক্ষা পায়, সুখের ক্রোড়দেশে চিরদিন

পালিত হইলে, সে শিক্ষার শতাংশের একাংশ হয় না। যিনি জীবনে যত দুঃখ পান, তাঁহার আত্মার তত অধিক শিক্ষালাভ ও উন্নতিলাভ হয়। সকলেই সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে অভিলাষী বটে, কিন্তু আমাদের পরম মঙ্গলের জন্যই করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে নানারূপ কষ্ট ও যন্ত্রণা দেন। বিপদে পতিত হইয়া বা রোগশোকে জর্জ্জরিত হইয়া, যখন আমরা, কোথায় মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনি! বলিয়া প্রাণভরে ডাকি, তখনই মা দুর্গার অপত্য-স্নেহ আমাদের জন্য উথলিয়া পড়ে এবং আমাদের আত্মাও সেই প্রেমপীযূষ পান করিতে করিতে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হয়। সংসারের এত জ্বালা ও যন্ত্রণা, এত রোগ ও শোক, এত বিপদ ও আপদ, কেবল আমাদের আত্মার অনন্ত মঙ্গলের জন্য বিহিত হইয়াছে। রাজাধিরাজ, রাজা ও পথের কাঙ্গাল, সকলের উপর সমান বিপদআপদ ও রোগশোক পতিত। রাজা বল, উজির বল, তোমার আমার কাছে তাঁহারা রাজা ও উজির; কিন্তু তাঁহারাও রোগ-শয্যায় শায়িত হইলে যন্ত্রণায় অস্থির হন এবং শত চিকিৎসকের মধ্যেও তাঁহারা যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করেন। যে স্থলে জনসাধারণ ধৈর্য্যগুণে রোগের যন্ত্রণা অম্লানবদনে সহ্য করে, সে স্থলে রাজা ও উজির নিজ যন্ত্রণা কিছু-মাত্র সহ্য না করায় তাঁহারা তত অধিক কষ্ট পান। যাহা হউক সংসারের জ্বালা ও যন্ত্রণা জীবাত্মার কর্ম্মফলভোগের জন্য বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহার অশেষ মঙ্গলের জন্যই বিহিত হইয়াছে।

এখন যে কর্ম্মফল দ্বারা অধ্যাত্মবিজ্ঞান মানবের যাবতীয় সুখদুঃখ বিচার করে, উহার প্রকৃত অর্থ কি? পাঠকগণ! এস্থলে নিজ নিজ কোমর বন্ধন কর এবং কর্ম্মফল শব্দের স্বর্গীয় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হও। অনেকে মনে করেন, ইহার অর্থ অতি সহজ; যিনি যেমন কর্ম্ম করেন, তিনি তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হন, ইহাই কর্ম্মফলের প্রকৃত অর্থ। সত্য বটে, আপাত-দর্শনে ইহার অর্থ এইরূপ, কিন্তু ইহার অর্থ অতীব গভীর ও গূঢ়। কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু করা যায় এবং মন দ্বারা যাহা কিছু ভাবা যায়, তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম-জগতে, প্রকৃতিজগতে ও সমাজজগতে কতকগুলি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এখন ঐ সকল পরিবর্ত্তন উপরোক্ত ক্রিয়ার অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়া বা পরিণাম-বশতঃ ক্রমশঃ বা কালক্রমে স্বতঃ প্রশমিত হয়। কোন ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির

যে অংশটুকু আন্দোলিত বা বিকৃত হয়, ক্রিয়ার অপরিহার্য্য পরিণামবশতঃ সেই অংশটুকু পুনরায় কালক্রমে সমঞ্জসীকৃত বা পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। এখন ক্রিয়ার অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়াবশতঃ প্রকৃতির যে সমঞ্জসীকরণ বা পূর্ব্বাবস্থা-প্রাপণ, তাহাই এ সংসারে প্রকৃত কর্ম্মফল। যেমন জলাশয়ে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইলে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ যুগপৎ উত্থিত হইয়া সমগ্র জলাশয়কে আন্দোলিত ও আলোড়িত করে, পরে তরঙ্গগুলি প্রাকৃতিক কারণে ক্রমশঃ প্রশমিত ও লীন হয়: সেইরূপ মানবকৃত প্রত্যেক কর্ম্মও তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থাপন করতঃ সমগ্রজগৎ আলোড়িত করে; ইহার এক একটী তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে কত জীবের মঙ্গলামঙ্গল সম্পাদিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং তরঙ্গগুলি কতদিনে প্রশমিত হয়, তাহারও ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ইহাদের প্রশমন বা কর্ম্মের পরিণতি অপরিহার্য্য।

এ সংসারে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবি। উত্তাপ অধিক হয়, শীতলতা স্বতঃ আইসে; আবার শীতলতা অধিক হয়, উত্তাপও স্বতঃ আইসে। উন্নতি হইলে পতন হয়; আবার পতন হইলেও উন্নতি হয়। পাপকর্ম্ম কর, দুঃখভোগ স্বতঃ হইবে; আবার পুণ্যকর্ম্ম কর, সুখভোগ স্বতঃ হইবে। পরিশ্রম কর, তদনুরূপ ফল হইবে; আবার আলস্যপর হও, তদনুরূপ ফলও হইবে। পাঁচ জনের মন্দ করিতে যাও, নিজের মন্দ অগ্রে হয়। পাঁচ জনের ভাল করিতে চাও, নিজের ভাল অগ্রে হয়। এইরূপে কর্ম্মফল দ্বারা জগৎ চিরদিন চালিত হইতেছে।

কর্ম্মফল যে কেবল এই দৃশ্যমান স্থূলজগতে নিবদ্ধ, তাহা নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম, দৃশ্য ও অদৃশ্য, যাবতীয় জগতে বা লোকে ইহার আজ্ঞা চিরদিন সমভাবে পালিত হয়। এক পরব্রহ্ম ব্যতীত, সকলেই ইহার আজ্ঞাধীন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ ও মানব, কেহ কস্মিনকালে ইহার আজ্ঞা বা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। মহামায়ার ন্যায় কর্ম্মফল সর্ব্বত্র সমভাবে দেদীপ্যমান আছে। বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের এই সার্ব্বজনিক নিয়মের সমক্ষে সকলেই নতশির হন। কর্ম্মফলের বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই; ইহা চিরদিন সমভাবে প্রচলিত আছে। লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে কর্ম্ম জগতে একবার সম্পাদিত হইয়াছিল। হয়ত তাহার ফল আজ অনুভূত হইতেছে এবং আজ যে কর্ম্ম

প্রথম সম্পাদিত হইল, তাহার ফলও লক্ষ বৎসর পরে জগতে অনুভূত হইবে। এই কর্ম্মফল দ্বারাই স্থূল ও সূক্ষ্ম যাবতীয় জগৎ একসূত্রে নিবদ্ধ আছে এবং সর্ব্বত্র সার্ব্বজনিক সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে।

কর্ম্মদেবী পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকলের কর্ম্মফল বা সুখদুঃখ বিতরণ করেন। তিনি স্বহস্তে তুলাদণ্ড লইয়া পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন। ইহলোক বল, পরলোক বল, দৃশ্যমান এই স্থূলজগৎ বল, অদৃশ্য সূক্ষ্মজগৎ বল, যে স্থলে যে কর্ম্মের যে ফল ঘটিলে, জগতের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, তিনি স্বহস্তে তাহাই সেইস্থলে বিধান করেন। তাঁহার দয়া নাই, মমতা নাই; তিনি সদা কঠোর ও ঘোর ন্যায়বান। কি পথের ভিখারী, কি রাজাধিরাজ, সকলের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি। কি কীটাণুকীট, কি দেবাদিদেব, সকলের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি। এমন না হইলে, কি এমন বিশ্বজনীন সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র সমভাবে স্থাপিত হইতে পারে?

যে সকল আধ্যাত্মিক, প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়ম দ্বারা সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম নিজ নিজ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। আবার কোন্ কর্ম্ম কোন্ সময়ে ফলোন্মুখ হয়, তাহাও বলা যায় না। তন্মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম ইহজন্মে, অপর কতকগুলি কর্ম্ম পরজন্মে ফলোৎপাদন করে। কতকগুলি কর্ম্ম তোমার জীবদ্দশায়, অপর কতকগুলি কর্ম্ম তোমার সন্ততিবর্গের সময় ফলোৎপাদন করে। তুমি যেমন ইহজীবনে প্রাক্তন জন্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ কর, তেমনি আবার সেই সঙ্গে তুমি ঐহিক কর্ম্মফলও কথঞ্চিৎ ভোগ কর এবং পরজন্মে ভোগ করিবার জন্য নানাবিধ কর্ম্মবীজ সংগ্রহ কর ও কালক্ষেত্রে বপন কর। যেমন কোন বৃক্ষের বীজ রোপিত ও সিঞ্চিত হইলে, প্রথমে অঙ্কুরিত ও কালক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইয়া বিবিধ ফল পুষ্পাদি ধারণ করে, সেইরূপ যে কর্ম্মবীজ আজ কালক্ষেত্রে রোপিত, তাহাও কালক্রমে সুবিশাল ও বহুবিস্তৃত শাখাবিশিষ্ট মহাবৃক্ষে পরিণত হয় এবং সুখদুঃখরূপ বিবিধ ফলফুলে শোভিত হয়। এখন কর্ম্মবৃক্ষ কোন্ সময়ে সুখদুঃখরূপ ইহার মহৎ ফল উৎপাদন করে, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু যিনি যে কোন কর্ম্ম করুন না কেন, কোন না কোন সময়ে বা কোন না কোন জন্মে ইহার ফল ভোগ করিতে হয়।

মা ভুক্ত্বা ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।

"কোটী কোটী কল্পেও ফলভোগ না হইলে কর্ম্ম কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। শুভাশুভ যাহা কিছু করা যায়, তাহার ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়।" তন্মধ্যে যাহা অত্যুৎকট পাপপুণ্য, তাহার ফল ইহজন্মেই প্রায় ভোগ করিতে হয়।

অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে
ত্রিভির্বর্ষৈ স্ত্রিভির্মাসৈ স্ত্রিভিঃপক্ষৈ স্ত্রিভির্দিনৈঃ।

(হিতোপদেশ।)

"অত্যুৎকট পাপপুণ্যের ফল ইহসংসারে তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে বা তিন দিনে ভোগ করিতে হয়।"

যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই, সেইরূপ কর্ম্মফলেরও ব্যত্যয় নাই। প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলি ইহজগতে, এই স্থূল-জগতে নিবদ্ধ আছে এবং কল্পে কল্পে ইহারা পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু কস্মিনকালে বা কোন কল্পে কর্ম্মফলের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন নাই। ইহা স্থূলজগতে যেরূপ নিবদ্ধ, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকজগতেও সেইরূপ নিবদ্ধ এবং কোটী কোটী জন্ম লইয়া ইহার অনুশাসন সমভাবে চালিত হয়।

কর্ম্মবিষয়ক নিয়মাবলি বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট অন্ধদৈব (Blind chance) কর্ত্তৃক চালিত হয় না। ইহারা সূক্ষ্মজগতস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলতার সহিত চিরদিন পরিচালিত হয়। যদি ইহারা অন্ধদৈব কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত, এমন সর্ব্বাঙ্গীন ও সার্ব্বজনিক সামঞ্জস্য কি কদাচ জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত? লোকের কর্ম্মফলানুসারে সূক্ষ্মজগতস্থ দেবগণ শরীর, সমাজ ও বাহ্যজগতের ঐহিক যাবতীয় সম্বন্ধকে পরিচালিত বা রূপান্তরিত করিয়া সকলের ভাগ্যলিপি চালান। যেমন জগতের ঐ সকল সম্বন্ধ অসংখ্য, দেবতারাও সেইরূপ উহাদের অসংখ্যরূপ সংযোগ ও বিয়োগ সম্পাদন করতঃ সমগ্র মানবজাতির সুখদুঃখ অসংখ্যরূপে বিধান করেন।

যেমন দেবতারা একদিকে শরীরস্থ ও বাহ্যজগতস্থ প্রাকৃতিক নিয়মাবলি পরিচালন পূর্ব্বক তোমায় বিবিধ সুখদুঃখের ভাগী করেন, সেইরূপ তাঁহারা

আবার তোমার হৃদয়স্থ গভীর চিন্তারাশি নিয়ন্ত্রিত করিয়া তোমায় বিভিন্ন কর্ম্মসম্পাদনে প্রেরণপূর্ব্বক তোমার প্রাক্তনকর্ম্মফলানুসারে তোমায় বিবিধ সুখদুঃখের ভাগী করেন। এস্থলে কেহ যেন এমন ভাবেন না, যে তাঁহার হৃদয়স্থ গভীর চিন্তারাশি একমাত্র তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। হৃদয়স্থ চিন্তারাশির উপর স্বাধীন ইচ্ছার অনুশাসন কতদূর ও দৈব অনুশাসন কতদূর, তাহা আদৌ নির্ণয় করা যায় না বটে, কিন্তু ইহার উপর উভয়প্রকার অনুশাসনই প্রবল। স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা ইহা পরিচালিত বলিয়া কালক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্ম্মবীজ রোপিত হয় এবং ইহার উপর দৈব অনুশাসনও অধিক পরিমাণে চালিত বলিয়া দেবগণ দ্বারা আমাদের প্রাক্তনকর্ম্মফল সুচারুরূপে বিতরিত হয়। যে পাপপুণ্যের জন্য আমরা সম্পূর্ণ দায়ী এবং যাহার ফল আমাদিগকে অনন্তজীবনে অনন্তকালে ভোগ করিতে হয়, সেই পাপপুণ্যের জন্য আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অনুশাসন হৃদয়স্থ চিন্তারাশির উপর বলবৎ। কিন্তু সংসারের কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য ও লোকবর্গের কোন প্রাক্তন কর্ম্মের বা ইহজন্মকৃত কর্ম্মের যথার্থ ফল বিতরণের জন্য দেবতারা আমাদের হৃদয়স্থ চিন্তারাশিকে সময়ে সময়ে একরূপভাবে চালান, যাহাতে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা কার্য্যগতিকে উল্লঙ্ঘিত হইয়া যায়। এক কর্ম্মফলে মানবের স্বাধীন ইচ্ছা ও দৈব ইচ্ছা উভয়ই মিশ্রিত আছে।

কর্ম্মফলের গতি অতীব সূক্ষ্ম ও গূঢ়, "গহনা কর্ম্মণোগতিঃ।" কোন কর্ম্ম দ্বারা কাহার ভাগ্য কিরূপ পরিবর্ত্তিত, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? আমরা এই মায়াময় সংসারে যেরূপ অসংখ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহাতে কোন্ সম্বন্ধের কিরূপ যোগাযোগ সংঘটিত হইয়া আমাদের ভাগ্যলিপি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বুঝা ভার। সংসারের চতুর্দ্দিকস্থ বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া আমরা এক এক সময়ে যেরূপ সুখার্ণবে ভাসমান হই এবং এক এক সময়ে যেরূপ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হই, তাহার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করা আমাদের অসাধ্য।

কথকদিগের প্রমুখাৎ শ্রবণ করা যায়, যখন অযোধ্যাপতি দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য উদ্যোগ করেন, তৎকালে সরস্বতী দেবী জগতের মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মন্থরার কণ্ঠদেশে অধিষ্ঠান হন। এখন দেখ, কত বড় মহৎকর্ম্মের জন্য দেবগণ কোন্

ব্যক্তিকে মনোনীত করেন! যদি পাপীয়সী মন্থরা কৈকেয়ীর কর্ণকুহরে কুমন্ত্রণা-রূপ মহা গরল উদ্গিরণ না করে, রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসে গিয়া সত্যের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করেন না, দশরথের প্রতি অন্ধ-মুনির অভিসম্পাত সফল হয় না এবং রাবণ সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া সবংশে নিধন হয় না। এ স্থলে ভাবা উচিত, এক সামান্য প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া কত শত শত পক্ষী যুগপৎ নিহত হইল! সেইরূপ সংসারের প্রত্যেক কর্ম্মে দেবগণ কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া লোকবিশেষের বা জাতিবিশেষের ভাগ্যলিপি কিরূপ পরিবর্ত্তন করেন, অথবা জগতের কোন্ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? আমরা হস্তপদাদি দ্বারা জগতের সকল কর্ম্ম সম্পাদন করি বটে, কিন্তু এ স্থলে আমরা প্রকৃত দারুযন্ত্রস্থ পুত্তলিকা মাত্র। সূক্ষ্ম জগতস্থ দেবগণ তারযোগে আমাদিগকে যেরূপভাবে নর্ত্তন করান আমরা ইহসংসারে সেইভাবে নৃত্য করি। কর্ম্মফল চিরদিন এইরূপ গূঢ়-ভাবে চালিত হয়।

The Great Karmic Laws of Nature act in that inscrutable way.- *Secret Doctrine.*

দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ম্ম ফলটী বুঝান আবশ্যক। মনে কর, অন্ধকারে যাইতে যাইতে সর্পদষ্ট হইয়া এক ব্যক্তির প্রাণবিয়োগ হয়। এস্থলে এ ব্যক্তির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ বলেন, অনবধানতাই উহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ; কেন সে ব্যক্তি আলোক না লইয়া অন্ধকারে আইসে? কেহ বলেন, দুরদৃষ্টই উহার অপঘাতমৃত্যুর প্রকৃত কারণ, কারণ দুরদৃষ্টবশতই সে ব্যক্তি আলোক না লইয়া অন্ধকারে যায় এবং সর্পের উপর পা দিয়া ফেলে। আবার কেহ বলেন, সর্প-দংশনই উহার অকাল-মৃত্যুর কারণ। যাহা হউক, এ ঘটনার পূর্ব্বাপর ভাবিয়া দেখিলে, স্পষ্ট বোধ হয়, অনবধানতার জন্য সে ব্যক্তি অপরাধী বটে, কিন্তু ইহা তাহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ হইতে পারে না, কারণ সে ব্যক্তি আজীবন আলোক না লইয়া অন্ধকারে ঐরূপ বেড়ায়। আবার সর্পের উপর পা দিলেও কখন কখন লোকে উহার দ্বারা দষ্ট হয় না এবং কখন কখন দষ্ট হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। অতএব এ স্থলে সর্প তাহার মৃত্যুর নিমিত্তকারণ বটে;

কিন্তু তাহার প্রাক্তন কর্ম্মফলই তদীয় মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। যে অবস্থার যোগাযোগে সে ব্যক্তি সর্পদষ্ট হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার স্বীয় কর্ম্মফলই সেই সকল অবস্থার পূর্ণ যোগাযোগ ঘটাইয়া দেয় এবং তাহার বিনাশাভিপ্রায়ে সর্পকে নিয়োজিত করে।

মনে কর, এক ব্যক্তি জন্মান্ধ হইয়া সংসারে অশেষ কষ্টরাশি ভোগ করে। এ স্থলে এ ব্যক্তির জন্মান্ধ হইবার প্রকৃত কারণ কি? শারীরবিধান-শাস্ত্র বলে, ভ্রূণাবস্থায় যে সকল পরিবর্ত্তনপরম্পরা দ্বারা নেত্রদ্বয় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, উহাদের কোন না কোন বিষয়ে ত্রুটি বা বিপর্য্যয় উপস্থিত হওয়ায় নেত্রদ্বয় পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নাই, তজ্জন্য সে ব্যক্তি জন্মান্ধ। এখন জিজ্ঞাসা, এ ব্যক্তির নেত্রস্ফুরণে কেন তাদৃশ ব্যতিক্রম ঘটিল? তুমি বলিতে পার, হয়ত তদীয় জরায়ুজীবনে মাতার কোনরূপ মানসিক বিকার উপস্থিত হওয়ায় তাহার অক্ষিদ্বয় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। বিজ্ঞান আরও বলিয়া দেয়, কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তনের ব্যতিক্রম ঘটাতে তাহার নেত্র অসম্পূর্ণ হয়। অন্ধ দৈববশাৎ হউক, প্রকৃতির প্রমাদবশতঃ হউক, কেন তাদৃশ ব্যতিক্রম ঘটিল? এ স্থলেও কি বোধ হয় না, যে সকল অবস্থার যোগাযোগে তাহার নেত্রদ্বয় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তদীয় প্রাক্তন কর্ম্মফলই সেই সকল অবস্থার পূর্ণ যোগাযোগ ঘটাইয়া তাহার নেত্রদ্বয়কে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে দেয় নাই? এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, পূর্ব্ব জন্মে কোন্ মহাপাপ করায় সে ব্যক্তি ইহজন্মে জন্মান্ধ হইল? এ বিষয়ে অসম্পূর্ণ মানব কি বলিতে পারেন? তিনি এই পর্য্যন্ত জানেন, কর্ম্মফলই তাঁহার যাবতীয় সুখদুঃখের মূলীভূত কারণ। কিন্তু কোন্ পাপে কোন্ দুঃখ ভোগ বা কোন্ পুণ্যে কোন্ সুখলাভ হয়, তাহা তিনি আদৌ জানেন না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মহাত্মা বুদ্ধদেবই প্রাচ্যজগতে কর্ম্মফলের নিয়ম প্রথম আবিষ্কার ও প্রচার করেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের একটী মহৎ ভ্রম। বুদ্ধদেব এই শ্রেষ্ঠমতটী কদাচ আবিষ্কার করেন নাই। ইহা সেই প্রাচীন কালের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মত এবং চিরদিন যোগেশ্বরদিগের ভিতর প্রচলিত আছে। বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্বে মহর্ষিগণ আর্য্যসমাজে এই শ্রেষ্ঠ মত প্রচার করেন; কিন্তু বুদ্ধদেব এই মতটী জনসাধারণের নিকট প্রথম প্রচার করেন। তাহাতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভাবেন, তিনিই এই মত প্রথম আবিষ্কার করেন।

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কর্ম্মফল স্বীকার করে বটে; কিন্তু এ ধর্ম্ম পূর্ব্বজন্ম অস্বীকার করিয়া মানবের কেবল ঐহিক কর্ম্মফল মানিয়া লয় এবং তাঁহার অনন্ত-কালের সুখদুঃখ ইহার উপর নির্ভর করায়। যে ভ্রান্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম তাঁহার পাপপুণ্যের বিকৃত অর্থ করায় এ সংসারের সুখদুঃখের যথার্থ কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ এবং যে ধর্ম্ম নিজের বুদ্ধি ভ্রংশবশতঃ একটা সামান্য মানবকে জগতের পরিত্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সে ভ্রান্তধর্ম্ম স্বসেবেকদিগের সন্তো-ষের জন্য উপদেশ দেয়, জন্মান্ধের ন্যায় যে ব্যক্তি ইহসংসারে বিনা অপরাধ ও অকারণ অশেষ কষ্টরাশি বহন করে, সেই হতভাগ্য ব্যক্তি স্বর্গলোকে ক্লেশের তারতম্যানুসারে ঈশ্বর কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হয়। এখন পূর্ব্বজন্ম স্বীকার না করিলে কি প্রকারে চলে বল? প্রত্যহ পৃথিবীতে লক্ষাধিক লোক জন্মগ্রহণ করে। সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত যত মানব সৃষ্ট হইয়াছে, সকলেই যে নূতন নূতন জীবাত্মা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এ কথা কি কদাচ বিশ্বসনীয় হইতে পারে? সনাতন অধ্যাত্মবিজ্ঞান উপদেশ দেয়, নির্দ্দিষ্টসংখ্যক আত্মা বা জীব কর্ম্মফলানুসারে ইহসংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। ইহারই কথা শিরো-ধার্য্য করা আমাদের কর্ত্তব্য।

এখন জিজ্ঞাস্য, জীবাত্মা প্রাক্তন কর্ম্মফল দ্বারা কিরূপে পরিচালিত হয়? এ সংসার জীবাত্মার একটী কর্ম্মক্ষেত্র। এরূপ ইহার সহস্র সহস্র কর্ম্মক্ষেত্র বর্ত্ত-মান আছে। এখানে জীবাত্মা মন, ইন্দ্রিয় ও স্থূলদেহ দ্বারা বাহ্যজগতের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া বিবিধ বিষয় উপভোগকরতঃ বিবিধ সুখদুঃখের ভাগী হয়। সেই-রূপ জীবাত্মা অন্যান্য লোকে বা যোনিতে বিভিন্নরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া বা বিভিন্নরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া বিভিন্ন প্রকার সুখদুঃখের ভাগী হয়। কিন্তু সকল লোকেই জীবাত্মা নিজকৃত কর্ম্মানুসারে কর্ম্মদেহ লাভ করতঃ কর্ম্মফল ভোগ করে। এই যে বরবপু অনন্ত সুখের আশায় সদা বিচেষ্টমান, ইহা জীবাত্মার কর্ম্মদেহমাত্র; কেবলমাত্র প্রাক্তনকর্ম্মফলভোগের জন্য ইহা জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া বাহ্যজগতস্থ বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছে। এখন বাহ্যজগতস্থ বিবিধ সম্বন্ধ জীবাত্মার কর্ম্মফলানুসারে নির্দ্ধারিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে।

যে মন ও শরীর লইয়া জীবাত্মা ইহসংসারে প্রবেশ করে, তাহাও ইহার কর্ম্মানুসারে স্থিরীকৃত হয় এবং ইহার সেই জন্মদেহ বাহ্য জগতের সহিত যেরূপ

সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ও জড়িত, তাহাও ইহার কর্ম্মানুসারে স্থিরীকৃত হয়। এখন পুরুষ-নিষিক্তবীর্য্যের সহিত স্ত্রীশোণিতের (স্ত্র্যণুর) মিলন হইলে একটী জীব এ জগতে ব্যক্ত হয় এবং সেই জীব এ জগতের নিয়মানুসারে পিতা-মাতার গুণাগুণ উত্তরাধিকার করিয়া মন ও শরীর প্রাপ্ত হয়। যে জীবাত্মা এখন জীবরূপে সংসারে ব্যক্ত, সে জীবাত্মা জন্মপরিগ্রহের জন্ত নিজ কর্ম্মানুসারে উপযুক্ত পিতামাতার যোগাযোগ প্রাপ্ত হয়। এজন্য এ সংসারে কেহ রাজপুত্র, কেহ বা চর্ম্মকারপুত্র হন। অন্ধ দৈবকর্ত্তৃক চালিত হইয়া কেহ রাজকুলে বা ভিক্ষুককুলে জন্মগ্রহণ করেন না।

জরায়ুগর্ভে বর্দ্ধিত হইয়া জরায়ুজীবন অবসান হইবার সময় জীব আত্মার কর্ম্মফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয়। আধুনিক উন্নত ধাত্রীবিদ্যা এত সমুজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত আবিষ্কারের মধ্যে কোন্ মুহূর্ত্তে মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এখন জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে সেই শিশুর জন্মলগ্নানুসারে তাহার জীবনের যাবতীয় সুখদুঃখ নবগ্রহ কর্ত্তৃক যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। জন্মলগ্নে নবগ্রহ ও নক্ষত্রাদি রাশিচক্রের যে গৃহে যেরূপ-ভাবে অবস্থিত হয়, উহারা আজীবন তাহাকে তদনুরূপ ফলাফল প্রদান করে এবং লগ্নানুসারে যখন গ্রহাদির যেরূপ সঞ্চার দেখা যায়, উহারা তখন তাহাকে তদনুরূপ অবস্থোচিত সুখদুঃখের ভাগী করে।

নব্যসম্প্রদায়ের ভিতর অনেকে মনে করেন, ফলিত-জ্যোতিষ পুরাকালীন কুসংস্কারের ভগ্নাবশেষ মাত্র। সভ্য-পাশ্চাত্য-জগতে উহার কিছুমাত্র সমাদর নাই দেখিয়া তাঁহারা ঐরূপ অপরূপ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, যেমন সংস্কৃত দেবভাষা, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, ষড়দর্শন ও আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান আমাদের পূর্ব্ব জাতীয় গৌরবের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, সেইরূপ ফলিত-জ্যোতিষও আর্য্যজাতির অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির সম্যক পরিচয় দেয়। বল দেখি, যে শাস্ত্র গণনা দ্বারা মানবের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি ভালরূপ নির্দ্দেশ করে এবং যাহার গণনা প্রায় অনেক সময়ে হুবহু সত্য ঘটনায় পরিণত হয়, সে শাস্ত্র কি কদাচ অলীক ও কাল্পনিক হইতে পারে? যে মানবজীবন কেবল আকস্মিক ও দৈবঘটনায় পরিপূর্ণ, যাহার ঘটনাপরম্পরা অনুক্ষণ এমন আচম্বিতেও দৈবাৎ পতিত হয়, সেই রহস্যময় জীবনের যাবতীয় ঘটনা যে শাস্ত্র অঙ্কশাস্ত্রের,

গণনানুসারে পূর্ব্বাহ্নে স্থির সিদ্ধান্ত করে, একবার ভাব দেখি, সে শাস্ত্র মানব-বুদ্ধির কি অপরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ! সত্য বটে, আজকাল হিন্দুসমাজে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষণের অভাবে এ শাস্ত্রের বিস্তর অনাদর ও অবনতি দেখা যায়, তথাচ যখন এ শাস্ত্র এতকাল সমাজে প্রচলিত আছে, তখন ইহাকে কদাচ অলীক ও কাল্পনিক বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

ফলিত-জ্যোতিষ্ পাশ্চাত্যজগতে এখন অনাদৃত হইয়া থাকে। তথায় স্বাধীন ইচ্ছা ও পুরুষকারবলে লোকবর্গকে আধিভৌতিক উন্নতিসাধনে প্রোৎসাহিত করিবার জন্যই ইহার এত অনাদর দেখা যায়। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ এ শাস্ত্রের বিপক্ষে যতই কেন বলুন না, আমরা মুক্তকণ্ঠে সহস্রবার স্বীকার করিব, এ শাস্ত্র পুরাকালীন মানববুদ্ধির একটী সুমহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ। অগাধ ও অপরিসীম পর্য্য-বেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন বলে ইহা রচিত অথবা যোগবলে প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি যোগ-বলে ইহার প্রাপ্তি অস্বীকার কর, তথাচ ইহা যে অগাধ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মানববিশেষ যে লগ্নে ভূমিষ্ঠ হইল, তৎকালীন গ্রহাদির স্থিতি দেখিয়া ও তাঁহার জীবনী অনুসন্ধান করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাই আবার অন্য লোকের জীবনী দ্বারা সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত করা হয়। এই প্রকারে জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের নিয়মাবলি প্রতিষ্ঠিত ও মীমাংসিত হই-য়াছে। তবে কেন লোকে এখন ইহাকে অলীক ও কাল্পনিক বলিয়া উড়ায়? এ শাস্ত্র যে অতি প্রাচীন, তদ্বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকের বিশ্বাস, রোমকপুরনিবাসী যে অসুরময় দেব সূর্য্যদেবের নিকট এ শাস্ত্র শিক্ষা করেন, তিনি আধুনিক পৃথিবীর মানব নন। যৎকালে ইহাতে অসুরগণ বিচরণ করে, তিনিও সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হন।

এ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে একটা মহৎ কথা সময়ে সময়ে উত্থিত হয় যদি ইষ্টকালের গ্রহাদির স্থিতি ও সঞ্চারদর্শনে সমগ্রজীবনের ফলাফল বা সুখদুঃখ স্থিরী-কৃত করা যায় তবে কেন একই মুহূর্ত্তে বা লগ্নে ভূমিষ্ঠ এক রাজকুমার ও এক দরিদ্র সন্তানের সুখদুঃখ সম্বন্ধে এত পার্থক্য নয়নগোচর হয়? প্রথমতঃ যদ্যপি উভয়েই একই মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে, তথাচ নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা ও ক্ষণ লইয়া উহাদের ইষ্টকালের কিঞ্চিৎ পার্থক্য হয়, তজ্জন্য উহাদের জীবনের সুখদুঃখও বিভিন্ন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ এ সংসারে সকলেই স্ব-অবস্থানু-

যায়ী সুখদুঃখ ভোগ করে। এক রাজকুমার দেশবিশেষ জয় করিয়া যেরূপ সুখী হন, এক দীনদরিদ্র-বালক একখণ্ড বস্ত্র পাইয়া সেইরূপ সুখী হয়। বাহ্য-দর্শনে উহাদের সুখের বিস্তর প্রভেদ হয় বটে; কিন্তু উভয়ের আন্তরিক সুখ সমান। একজন শ্বেতাঙ্গ মাসে সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া যেরূপ সুখী হয়, একজন কৃষ্ণাঙ্গ মাসে শত মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া সেইরূপ সুখী হয়; আবার একজন শ্রমজীবী মাসে দশ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াও সেইরূপ সুখী। এক-জন শ্বেতাঙ্গ জ্বরাক্রান্ত হইয়া রোগ যন্ত্রণায় যেরূপ অস্থির, একজন কৃষ্ণাঙ্গ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণায় সেইরূপ অস্থির হয়; আবার এক জন দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণায় সেইরূপ অস্থির হয়। এই-রূপে সংসারে সকলের সুখঃদুখ চিরকাল অবস্থোচিত।

এ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটা কথা সময়ে সময়ে উত্থিত হয়। যে গ্রহগণ অচেতন জড়পিণ্ডমাত্র, তাহাদের দ্বারা মানবের নিয়তি কি প্রকারে পরিচালিত হইতে পারে? জড়বিজ্ঞান না হয় সপ্রমাণ করে, চন্দ্রের আকর্ষণবশতঃ সমুদ্রের জোয়ার ভাটা সংঘটিত হয়। তাহাতেই বা আমরা কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করি যে, অচেতন গ্রহগণ আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার নূতন যোগাযোগ আনয়ন পূর্ব্বক আমাদের সুখদুঃখ বিধান করে? আরও দেখ, গ্রহগুলি পৃথিবী হইতে কত দূরদেশে অবস্থিত আছে। এত দূরদেশ হইতে কি উহারা আমাদের ভাগ্যলিপি চালায়? এ অসম্ভব কথায় কে বিশ্বাস করে? গ্রহগণ যত দূর-দেশে থাকুক না কেন, যে অনন্ত ব্যোমাকাশ সকলের নিকট বিরাট শূন্যময়, যে আকাশের গুণাগুণ পরম যোগী ব্যতীত অপর কেহ অবগত নন, সেই সূক্ষ্ম আকাশের মধ্য দিয়াই গ্রহগণের অধিষ্ঠাতৃ-লোকপালগণ নিজ নিজ লোকের সঞ্চারানুসারে আমাদের ভাগ্যলিপি চালান। তাঁহারা আমাদের ন্যায় ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট হন না। যেমন জড়জগতে দেবাধিষ্ঠিত ভৌতিক-শক্তিগুলি অপরিবর্ত্তনশীল নিয়মাবলী দ্বারা চিরদিন সমভাবে চালিত হয়, সেইরূপ গ্রহাধিষ্ঠাতৃ লোকপালগণ গ্রহাদির সঞ্চারবশতঃ কতকগুলি অপরি-বর্ত্তনশীল নিয়মাবলি দ্বারা সকলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেন।

প্রকৃতি জগতের ন্যায় প্রত্যেক মানবের জীবন কতকগুলি অপরিবর্ত্তন-শীল নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; তন্মধ্যে ইহা একটী সর্ব্বপ্রধান নিয়ম যে,

গ্রহাদির বিভিন্ন সঞ্চারবশতঃ তাঁহার জীবনের সুখদুঃখ অধিক পরিমাণে পরিচালিত হয়। শুভগ্রহের শুভযোগবশতঃ তিনি অনন্ত সুখে সুখী হন এবং কুগ্রহের কুযোগবশতঃ তিনি অশেষরূপে যন্ত্রণাগ্রস্ত ও নানাবিপদে পতিত হন। একাদশ বৃহস্পতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি সুখের পর সুখ ভোগ করেন এবং ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করেন ; আবার শনির দশায় পতিত হইয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণান্ত হন। যেমন পৃথিবীর বার্ষিক গতিবশতঃ বিভিন্ন ঋতুর সমাগম হওয়ায় উহা কোন সময়ে নানাবিধ ফলফুলে সুশোভিত হইয়া মনোহর দৃশ্য ধারণ করে অথবা কোন সময়ে উহা ভীষণমূর্ত্তি প্রকাশ করে; সেইরূপ গ্রহাদির সঞ্চারবশতঃ প্রত্যেক মানবের জীবন কোন সময়ে অনন্ত সুখে পূর্ণ হয়, কোন সময়ে বা ইহা অনন্ত দুঃখে সমাকীর্ণ হয়। অতএব জ্যোতিষশাস্ত্র কদাচ মিথ্যা হইবার নয়। আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় ইহাকেও আমাদের মস্তকের শিরোমণি করিয়া রাখা উচিত।

রাশিচক্রের সম্বন্ধানুসারে গ্রহগণ আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্যের উপরও বিশেষ অনুশাসন চালায় ; এমন কি, বোধ হয়, দেহস্থ যন্ত্রবিশেষের উপরও গ্রহবিশেষের সম্পূর্ণ অনুশাসন বর্ত্তমান আছে। এ কারণে গ্রহ বিশেষের সঞ্চারবশতঃ শরীরের যন্ত্রবিশেষ বিকৃত হইয়া রোগবিশেষ আনয়ন করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান কেন সমস্ত পীড়ার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হয় ? এক হিম লাগিলে, কাহার সামান্যরূপ সর্দ্দিকাশ, কাহারও ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ, কাহারও বা বাতজ্বর হয়। এরূপ হইবার প্রকৃত কারণ কি ? যন্ত্রগুলির ধাতুগত দৌর্ব্বল্যবশতঃই কি ঐরূপ ঘটে ? শরীরস্থ যন্ত্রগুলির উপর গ্রহাদির অনুশাসনবশতঃ সকলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পীড়ায় অভিভূত হইয়া নানা যন্ত্রণা পায়।

আরও দেখা যায়, রাশিচক্রের গণনানুসারে গ্রহবিশেষ মানববিশেষের মৃত্যুপতি বা মারকেশ হন। যখন সেই মারকেশ আগত হন এবং অন্যান্য কুগ্রহের যোগাযোগও তদনুরূপ হয়, তখন তুমি সহস্র কেন উপায় অবলম্বন কর না, সহস্র কেন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন কর না, সহস্র সহস্র রজতমুদ্রা কেন চিকিৎসকদিগের পাদপদ্মে প্রক্ষেপ কর না, তুমি কোনপ্রকারে নিয়তির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাও না। কেন চিকিৎসাবিজ্ঞান চিরদিন অসম্পূর্ণ ও

অন্ধকারাবৃত? কেন কবিরাজী, হাকিমী, এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, ইলেক্ট্রোপ্যাথী, ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথী প্রভৃতি নানাবিধ চিকিৎসোপায় এ সংসারে প্রচলিত হইয়াছে? মানব নিজ দুঃখ বিমোচনার্থ সাধ্যমত নানাবিধ চেষ্টা করেন; কিন্তু প্রকৃতিদেবী তাঁহার এ সকল অনর্থক চেষ্টার উপর উপহাস বা বিদ্রূপ করেন। তাঁহার সকল চেষ্টাই অখণ্ড্য নিয়তির সমক্ষে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বক্তব্য, সংসারে বৈষয়িক তারতম্যবশতঃ মানবজীবনের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে যে ভেদাভেদ দেখা যায়, তাহা আপাতদর্শনে অধিক বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা অত্যল্প। সকলেই স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করেন এবং যিনি যে অবস্থায় পতিত হউন না কেন, অভ্যাসবশতঃ তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং গ্রহাদির সঞ্চারবশতঃ তাহাতেই তিনি সুখ-দুঃখের পথ দেখিতে পান। সুন্দর যানারোহণ করিলে বা পলান্ন ভোজন করিলেই যে লোকে পরম সুখী হয়, আর পদব্রজে গমন করিলে বা শাকান্ন ভোজন করিলে যে কেহ সুখী হয় না, এ মিথ্যা ধারণা কেন সকলের মনে বদ্ধমূল হয়? আবার যেমন কি শীতপ্রধান, কি গ্রীষ্মপ্রধান, কি নাতিশীতোষ্ণ, সকল দেশেই লোকে সুখবিশেষ ও দুঃখবিশেষ ভোগ করে, সেইরূপ কি ধনবান, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র, সমাজের সকল অবস্থায় লোকে সুখবিশেষ ও দুঃখবিশেষ ভোগ করে। দেখ, যে ব্যক্তি নিতান্ত দীনদরিদ্র, সে ব্যক্তি সমস্ত দিবস কঠোর কায়িক পরিশ্রম করিয়া শাকান্নে উদর পূরণ করতঃ যে নিদ্রাসুখ ভোগ করে, তাহা এক জন রাজাধিরাজের ভাগ্যে ঘটে না। আর যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের অধীশ্বর, তিনি বাহ্যাড়ম্বরে ও ভোগবিলাসে আপনাকে বেষ্টিত করিয়া তপ্তকাঞ্চনবৎ নিজ শরীর অতি যত্নের সহিত পালন করতঃ সংসারে বিবিধ সুখভোগ করেন বটে, কিন্তু জ্বরাক্রান্ত হইলে, সেই গাত্রদাহ, সেই শিরঃপীড়া, সেই পিপাসা, সেই শরীর বেদনা প্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্রণায় তিনিও অস্থির হন। চিরদিন সুখাভ্যস্ত বলিয়া সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে, তাহা তিনি আদৌ শিক্ষা করেন না; এ জন্য পীড়ার সময় তাঁহার ততোধিক যন্ত্রণা হয়। কিন্তু যিনি আজীবন কষ্টে লালিত ও অভ্যস্ত, তাঁহার সহিষ্ণুতা ততোধিক; তিনি সামান্য রোগে ভ্রূক্ষেপ করেন না এবং যে ব্যাধি ধনবানের নিকট অশেষ যন্ত্রণাদায়ক, তাহাতে তিনি তাদৃশ ক্লেশ অনু-

ভব করেন না। যিনি শিবিকারোহণে বা যানারোহণে চিরাভ্যস্ত, যে দিন তাঁহাকে পদব্রজে হাঁটিতে হয়, সে দিন তিনি সমূহ বিপদে পতিত হন। আর যিনি চিরদিন পদব্রজে হাঁটেন, বিশক্রোশ হাঁটিতে হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না। একবার ভাব দেখি, যখন শিবিকাবাহকেরা স্বপ্রভুকে চারিক্রোশ আনয়ন করিবার পর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নিজের ক্লান্তিরদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তালবৃন্ত দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকে, তৎকালে উহাদের মনের অবস্থা কিরূপ? যিনি প্রভু, তিনি লজ্জায় অধোবদন, আর বাহকেরা তাঁহার কষ্ট দেখিয়াই দয়ার্দ্রচিত্ত। সেইরূপ যিনি কারাগারে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে থাকেন, তিনি তথায় নিজের সুখের পথ দেখিতে পান; আর যিনি রাজপ্রাসাদে থাকেন, তিনি অনন্ত সুখের মধ্যেও দুঃখের করাল ছায়াদর্শনে ভীত ও চকিত হয়।

সংসারে কেহ সর্ব্বসুখে সুখী হন না। আমরা যাঁহাকে যত সুখী মনে করি, বস্তুতঃ তিনি তত সুখী নন। তাঁহার যে সুখটুকুর অভাব আছে, তাহাই তাঁহাকে চিরদিন যন্ত্রণা দেয়।

প্রায়েণ সামগ্রবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ।

(কুমারসম্ভব)

বিধাতা কাহাকেও সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা বা সর্ব্বসুখে সুখী করেন না। কি রাজাধিরাজ, কি পথের কাঙ্গাল, সকলেই ইহসংসারে প্রাক্তনকর্ম্মফল ভোগ করিয়া সুখদুঃখের ভাগী হয়। সংসারের অতুল ঐশ্বর্য্য ও অতুল বিভব যাদুঘরের কেবল যাদুমাত্র; ইহাতে প্রকৃত সুখও নাই, শান্তিও নাই, কেবল জ্বালা ও যন্ত্রণা। লিডিয়াধিপতি ক্রেসাসকে মহাত্মা সোলন কিরূপ সদুপদেশ দেন? কিন্তু ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া লিডিয়াধিপতি সেই মহাত্মার কতদূর অপমান করেন? পরে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া জীবন্তদাহনার্থ চিতায় স্থাপিত হন, তখনই সেই মহাত্মার মহৎ বাক্য তদীয় হৃদয়াকাশে উদিত হয় এবং তিনিও প্রাণভয়ে কোথায় সোলন! কোথায় সোলন! বলিয়া ক্রন্দন করেন। তাহাতেই তিনি প্রাণে অব্যাহতি পাইয়া পুনরায় সিংহাসনে স্থাপিত হন।

জগতের ইতিহাস সোলনের মহৎবাক্য অনন্ত অক্ষরে ঘোষণা করতঃ সাংসারিক ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের অসারত্ব সকলের নিকট চিরদিন প্রচার করে”।

সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখ মায়াজন্য ও দ্বন্দ্বজ; উহারা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ, সুখে উৎফুল্ল হইও না এবং দুঃখেও কাতর হইও না; সকল অবস্থায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহ। যাঁহারা সুখদুঃখে যথার্থ নির্ব্বিকার, তাঁহারাই এ সংসারে প্রকৃত পরমহংস, তাঁহারাই এ সংসারে প্রকৃত দেবতা। সংসারের যাবতীয় দুঃখরাশি ও বিপদরাশি আত্মার পরীক্ষার জন্য, উহার অনন্ত উন্নতির জন্য বিহিত হইয়াছে। সকল অবস্থায় উহার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হও। যখন করুণাময় পরমেশ্বর তোমায় ক্রন্দনের পালা দেন, তখন তুমি তাঁহার নাম লইয়া প্রাণভরে ক্রন্দন কর। এই ক্রন্দনেই তোমায় জীবাত্মার উন্নতি ও তোমায় মনের উন্নতি হইবে। যখন এ সংসারে হাসিবার পালা আইসে, তখন সকলে প্রাণভরে হাস্য করে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহারা লঘুচেতা হইয়া যায়। অতএব সে অবস্থায় তুমি নির্ব্বিকার থাকিতে চেষ্টা কর। সুখের অবস্থায় পতিত হও বা দুঃখের অবস্থায় পতিত হও, চিরদিন স্মরণ রাখিও, এসা দিন নাহি রহে গা।”